বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও সংসদীয় গণতন্ত্র ঃ একটি বিশ্লেষণ

গবেষক

মোঃ এখলাছুর রহমান

Dhaka University Library

465001

465001

এম.ফিল অভিসন্দর্ভ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০

জুন ২০১০

বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও সংসদীয় গণতন্ত্র ঃ একটি বিশ্লেষণ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে এম. ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত গবেষণা অভিসন্দর্ভ
জুন ২০১০

গবেষক

মোঃ এখলাছুর রহমান

রেজিস্ট্রেশন নং ঃ ১১৮

শিক্ষাবর্ষ ঃ ২০০২-২০০৩

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা-১০০০।

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

465001

তত্ত্বাবধায়ক

এম. সাইফুল্লাহ ভূঁইয়া

প্রাক্তন অধ্যাপক

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা-১০০০।

Dhaka University Institutional Repository

উৎসর্গ

আমার পরম শ্রদ্ধেয় বাবা
ও মা'কে

465001

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও সংসদীয় গণতন্ত্র ঃ একটি বিশ্লেষণ

এম.ফিল ডিগ্রী লাভের প্রয়োজনীয় চাহিদার আংশিক পরিপূরক হিসেবে গবেষণা অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদভূক্ত রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে উপস্থাপন করা হলো।

(মোঃ এখলাছুর রহমান)
শিক্ষাবর্ষ : ২০০২-২০০৩
রেজিস্ট্রেশন নং : ১১৮
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০।
জুন ২০১০

Dhaka University Institutional Repository

অনুমোদন পত্র

জনাব মোঃ এখলাছুর রহমান কর্তৃক লেখকৃত "বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও সংসদীয় গণতন্ত্র ঃ একটি বিশ্লেষণ" শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে সন্তোষজনকভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। আমার জানামতে গবেষণা অভিসন্দর্ভটি অন্য কোথাও কোন ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থাপিত হয়নি। গবেষণা অভিসন্দর্ভটি এম.ফিল ডিগ্রী লাভের প্রয়োজনীয় চাহিদার আংশিক পরিপূরক হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদভূক্ত রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে উপস্থাপনের জন্য অনুমোদন করা হলো।

এম. সাইফুল্লাহ ভূঁইয়া
২৩/৮/২০২০

এম. সাইফুল্লাহ ভূঁইয়া
প্রাক্তন অধ্যাপক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সংসদীয় গণতন্ত্র ও উন্নত রাজনৈতিক সংস্কৃতি বাংলাদেশের মানুষের কাছে পরম আকাঙ্ক্ষিত ও প্রত্যাশিত বিষয়। সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে সার্বভৌম বাংলাদেশের রক্তাক্ত অভ্যুদয়ের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল স্বৈরতন্ত্রী ও একদেশদর্শী পাকিস্তানী নেতৃত্বকে পরাজিত করে দেশীয় নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সুষ্ঠু ও শক্তিশালী একটি রাজনৈতিক গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক কাঠামো বিনির্মাণ করা। এ লক্ষ্যে আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের শুরুটা ছিল অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। কিন্তু কয়েক বছর যেতে না যেতেই রাজনৈতিক অস্থিরতা, যথাযথ রাজনৈতিক নের্তৃত্বের অভাব, জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলোর মধ্যে অভ্যন্তরীণ কোন্দল, পারস্পরিক সন্দেহ ও অবিশ্বাস, রাজনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক বিকৃতি ও অবক্ষয়, রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ণসহ নানারূপ অস্বচ্ছ রাজনৈতিক প্রক্রিয়া বংলাদেশের জাতীয়তাবাদী শক্তির শক্ত ভীতকে এমনভাবে আঘাত করেছিল যে তাতে এদেশের রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক কাঠামোয় আমূল পরিবর্তন ও ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়েছে। ১৯৭৫ এর পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের সংসদীয় রাজনীতি সামরিক ও স্বৈরাচারী সরকারের কবলে পড়ে চরমভাবে পর্যুদস্ত হয়। দীর্ঘদিনের সামরিক শাসনের দুঃসহ অবস্থা থেকে উত্তোরণের পর ১৯৯১ সালে বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক ও সাংবিধানিকভাবে সংসদীয় গণতন্ত্রের পুনঃযাত্রা শুরু হয়। সেই থেকে হিসেব করলে বাংলাদেশের সংসদীয় সংস্কৃতির অভিজ্ঞতা প্রায় ২০ বছরের । কিন্তু দু:খজনক হলেও সত্যি এ সময়ের মধ্যে বাংলাদেশে উন্নত ও সুষ্ঠু রাজনৈতিক সংস্কৃতিক চর্চার মজবুত কোন ভিত রচিত হয়নি। অথচ এই গণতন্ত্রের জন্য কত আত্মত্যাগ, কত সংগ্রাম, কত আন্দোলন করতে হয়েছে বংলাদেশের মানুষকে! পৃথিবীর অন্য কোন দেশে গণতন্ত্রের জন্য জনগণকে এমনভাবে আত্মত্যাগ দিতে হয়েছে কিনা আমার জানা নাই।

অনেক আবেগ, অনেক উচ্ছাস ও প্রত্যাশা নিয়ে এম.ফিল গবেষণা কর্মটি শুরু করেছিলাম। কিন্তু কয়েকদিন যেতে না যেতে মনে হয়েছে গবেষণার পরিধি আসলে অনেক ব্যাপক, অনেক বেশি কঠিন। তাছাড়া গবেষণার যোগ্যতায় আমি বলতে গেলে নিতান্তই অনভিজ্ঞ। বিভিন্ন লাইব্রেরী, সেমিনার থেকে শুরু করে তথ্য প্রাপ্তির সুদীর্ঘ দৌরাত্ম্য, গবেষণার পরিধি নির্ধারণের জটিলতায় বার বার মনে হয়েছে "আর বুঝি সামনে এগোনো সম্ভব নয়"। তবে এই সম্ভব অসম্ভবের দোলাচলের মাঝ থেকে আমার শ্রদ্ধেয় তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক এম. সাইফুল্লাহ ভূঁইয়া স্যারের অকুণ্ঠ সাহায্য, উৎসাহ, উদ্দীপনা ও প্রেরণামূলক দিক নির্দেশনাতে অনেক আশান্বিত হয়েছি। শুরু থেকেই শেষ পর্যন্ত এ দীর্ঘ সময় তার বহুমুখী দায়িত্ব ও ব্যস্থতার মাঝেও আন্তরিকতার সাথে তত্ত্বাবধান, উপদেশ, নির্দেশ, উৎসাহ, অনুপ্রেরণা, শাসন ও প্রয়োজনীয় তথ্যের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণসহ সার্বিকভাবে পান্ডুলিপি পড়ে মূল্যবান পরামর্শ প্রদান করে সহায়তা করার জন্য প্রথমেই শ্রদ্ধেয় তত্ত্বাবধায়ক স্যারের প্রতি আমি আমার বিনম্র শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। প্রিয় এ শিক্ষকের কাছে আমার এ ঋণ অতুলনীয় ও অপরিশোধ্য। তারই সাথে স্মরণ করছি স্যারের সুযোগ্য কন্যা আইরিনের আন্তরিকতা ও আতিথেয়তার কথা ।

Dhaka University Institutional Repository

এম ফিল প্রোগ্রামে ভর্তি হওয়া থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মন্ডলীর মূল্যবান পরামর্শ, সাহায্য ও সহযোগীতা "বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও সংসদীয় গণতন্ত্র : একটি বিশ্লেষণ" এর মত একটি জটিল, কঠিন, ও স্পর্শকাতর বিষয়ে ভাববার ও গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় চিন্তার খোরাক যুগিয়েছে। এ জন্য বিভাগীয় শিক্ষক বড়ভাই তুল্য সহকারী অধ্যাপক মো: সোহরাব হোসেন ও সহকারী অধ্যাপক স.ম. আলী রেজা সহ সকল শিক্ষকদের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ।

গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করতে অসংখ্য দেশী-বিদেশী বই-পুস্তক, পত্র-পত্রিকা ও ম্যাগাজিন-জার্নালের সাহায্য নিয়েছি। সেজন্য আমি এসব বই পুস্তকের লেখক ও প্রবন্ধকারদের কাছে বিশেষভাবে ঋণী। গ্রন্থাগার ব্যবহারের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, জাতীয় গ্রন্থাগার, উইমেন ফর উইমেন গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষকে এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সেমিনার লাইব্রেরীর আব্দুল হাকিম ভাই ও এম.ফিল শাখার আব্দুল মান্নান ভাইকে সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। গবেষণা কর্মের অধ্যায় বিন্যাসে শুরুতেই আমাকে সাহায্য করেছেন বড়ভাই তুল্য বিশিষ্ট সমাজ গবেষক ড. আমিনুর রহমান এবং অন্যান্য বিষয়ে সাহায্য সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণা পেয়েছি ড. আমিরুল ইসলাম, ড. আহসান হাবিব ও সাহেদ হারুন ভাইয়ের, কৃতজ্ঞতা রইল তাদের প্রতি। পাশাপাশি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার পিতৃতুল্য অধ্যাপক মো: শরীফ উদ্দিন খান স্যারকে। তাঁর মূল্যবান পরামর্শ, চিন্তা ও সহযোগিতা আমাকে গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করতে যথেষ্ট সাহস যুগিয়েছে। সহযোগিতা পেয়েছি বন্ধুবর শরীফ আহম্মেদ চৌধুরী, আবু সালেহ, নিষাত সুলতানা, তাজিয়া সুলতানা, আসিফ শাহরিয়া মিজান, মনিরুল ইসলাম ও মিলনের। গবেষণার প্রতিটি স্তরে মূল্যবান পরামর্শ, আলোচনা ও তথ্য দিয়ে আমাকে কাজটি করতে উৎসাহ প্রদানের জন্য এম.ফিল প্রোগামের সহপাঠি বন্ধুবর রফিক ভাই, হিরু, রুমা ও মন্টুকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

তবে সার্বক্ষণিক খোজ খবর নিয়ে এম.ফিল প্রোগ্রামের গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করতে যারা আমাকে সবচেয়ে বেশী উৎসাহ ও তাগিদ দিয়েছেন এবং আমার গবেষণা কর্মের মূল অনুপ্রেরণা, তারা হলেন আমার পরম শ্রদ্ধেয় বাবা ও মা। সাথে ছিল ছোট ভাই মিটুল, জাস্টিস, ফেরদৌস, সজীব ও আমার সহধর্মিনী ইসমত আরা ঝুনী'র অগাধ ভালবাসা, আন্তরিক সমর্থন ও সার্বক্ষনিক সহযোগিতা।

আমার প্রায় চার বছরের ছোট্ট ছেলেটি আরিফ আবরার সামীন'র প্রতি রইল অনেক আদর ও স্নেহ। তার অবাধ চঞ্চলতা, শিশুসুলভ দুরন্তপনা ও দুষ্টুমী আমার গবেষণা কর্মে একটুও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেনি বরং গবেষণা কর্মের একঘেয়েমীতা ও অলসতার মাঝে যথেষ্ট আনন্দ ও উৎসাহ যুগিয়েছে।

পরিশেষে কম্পিউটার কম্পোজসহ অন্যান্য সহযোগিতা করার জন্য বিশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি টিপু,তানভীর, নুরুজ্জামান ও কালাম ভাইকে।

মো: এখলাছুর রহমান

৩০ জুন ২০১০

Dhaka University Institutional Repository

সার সংক্ষেপ

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল দেশ। অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেরও একটি নিজস্ব রাজনৈতিক সংস্কৃতি আছে। যা এখানকার জনগণের রাজনৈতিক আদর্শ, আচার-ব্যবহার, ধর্মীয় বিশ্বাস ও রাজনৈতিক চর্চা ইত্যাদির দ্বারা প্রবর্তিত ও সজ্জিত। বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি সম্পর্কে আরো স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে হলে এর শাসন ব্যবস্থা এবং বাংলাদেশ অভ্যুদয়ের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে একটু ধারণা নিতে হবে। প্রায় দুইশত বৎসরের বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ থেকে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানি কাঠামোর মাধ্যমে স্বাধীন হয়ে তৎকালীন পূর্ববাংলা তথা বর্তমানের বাংলাদেশ ১৯৪৮ সালেই তার অসাম্প্রদায়িক অস্তিত্বকে ঘোষণা করেছে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার দাবী উত্থাপনের মধ্য দিয়ে। এ প্রক্রিয়া দ্রুত ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনে রূপ পেয়ে এক নতুন জাতীয় আত্মপরিচয়ের প্রতীক আবিষ্কারের অকাঙ্ক্ষায় মেতে উঠেছিল। পরবর্তীতে এই ভাষা প্রতীককে সামনে রেখেই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিল এ অঞ্চলের কৃষক, শ্রমিক, শিক্ষক, রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবীসহ আপামর জনগণ। স্বপ্নের বাস্তবায়নও হয়েছে কিন্তু এর জন্য ত্যাগ করতে হয়েছে অনেক কিছু। সুদীর্ঘ ২২ বছরের শাসনতান্ত্রিক আন্দোলন ও সশস্ত্র সংগ্রামের বিনিময়ে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরে অর্জিত হয় আমাদের কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। এবার শুরু হলো নিজেদের মত করে দেশটাকে গঠনের পালা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭২ সালে নতুন সংবিধান প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় দীর্ঘদিনের কাঙ্খিত সংসদীয় শাসন ব্যবস্থার যাত্রা। অল্প সময়ের মধ্যেই বাংলাদেশ বিশ্বের মানচিত্রে অন্যতম একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে ব্যাপক পরিচিতি পায়। কিন্তু তিন বছর যেতে না যেতেই দেশে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যহরণের পরিবেশ তৈরী হয়ে যায়; সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে এদেশের আপামর জনগণের দীর্ঘ দিনের আশা ও কাঙ্ক্ষিত সংসদীয় গণতন্ত্রকে বিসর্জন দিয়ে সে স্থলে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থার সূচনার মধ্য দিয়ে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে মর্মান্তিকভাবে হত্যা করা হলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অবস্থা এক কঠিন সমস্যা ও সংকটে নিমজ্জিত হয়। সামরিক ও বেসামরিক নেতৃত্বের মধ্যে শুরু হয় ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। অতপর ১৯৭৫ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত চলতে থাকে বিভিন্ন সময়ে ক্ষমতায় আসা বিভিন্ন রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে পরিচালিত হওয়া রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা। তবে '৯০ দশকের প্রায় পুরো সময়টা জুড়ে চলতে থাকে হরতাল, অবরোধ, আন্দোলন, সংগ্রামসহ ব্যাপক রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা । এ আন্দোলন ছিল স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে ও সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পরিচালিত এক গণআন্দোলন যা ১৯৯০ সালে প্রচন্ড রূপ ধারণ করে। ৯০' এর গণআন্দোলনের মাধ্যমে স্বৈরাচারী সরকারের পতন ঘটিয়ে ১৯৯১ সালে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ভিত্তিতে পঞ্চম

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় সংসদে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশে পুনরায় সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়।

এরপর কেটে গেছে ১৯ টি বছর। কিন্তু দূর্ভাগ্যজনক হলেও এটাই বাস্তবতা যে, এই ১৯ বছরের সংসদীয় পদযাত্রায় আমাদের সংসদীয় সংস্কৃতির কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন সংঘটিত হয়নি। লাগাতার সংসদ বর্জন, ওয়াক আউট সংস্কৃতি লালিত হয়েছে খুব পাকাপোক্তভাবে। এদেশের শাসন ব্যবস্থায় বিদ্যমান সীমাহীন দলীয় কোন্দল, দলের অভ্যন্তরে অগণতান্ত্রিক চর্চার, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, অসহনশীলতা, সংসদের পরিবর্তে রাজপথ কেন্দ্রীক আন্দোলন, ক্ষমতার অপব্যবহারসহ যাবতীয় অগণতান্ত্রিক রাজনৈতিক কর্মকান্ড বাংলাদেশের সুষ্ঠু রাজনৈতিক সংস্কৃতির পথে বাঁধা সৃষ্টি করেছে। ১৯৯১, ১৯৯৬, ২০০১ ও ২০০৮ সালে নির্দলীয়, নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদের সফল ও দেশে বিদেশ সার্বজনীন গ্রহণযোগ্য নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে ঠিকই কিন্তু প্রতিষ্ঠিত হয়নি ক্ষমতা হস্তান্তরের গণতান্ত্রিক, সুষ্ঠু ও সর্বদলসম্মত কোন সুনির্দিষ্ট পদ্ধতির, উন্নয়ন ঘটেনি নির্বাচনোত্তর দেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির। তাত্ত্বিকভাবে সংবিধান স্বীকৃত সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলেও এখনও তৈরী হয়নি গনতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের প্রয়োজনীয় মানসিকতা। বিনির্মাণ করা সম্ভব হয়নি একটি সুষ্ঠু ও শক্তিশালী রাজনৈতিক সংস্কৃতি। অথচ এটাই ছিল এ জনপদের আজন্ম আকাঙ্ক্ষা ও স্বাধীনতার প্রত্যাশা।

বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক পটভূমিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে এই গবেষণায় বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, বিগত ১৯ বছরে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলো কি ধরণের রাজনৈতিক কার্যাবলী সম্পাদন করেছে এবং এ সকল কার্যাবলী সুষ্ঠু রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক কাঠামো বিনির্মাণে কি ভূমিকা রেখেছে। গবেষণায় দেখা যায়, সংবিধানের মাধ্যমে বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার যাবতীয় সাংবিধানিক আইন, ও আইনের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ও বহু দলীয় ব্যবস্থার প্রচলন থাকা সত্ত্বেও সুষ্ঠু ও কার্যকরী পদক্ষেপ ও মানসিকতার অভাবে বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এর জন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক দলের মধ্যে ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে সত্যিকার অর্থে গণতান্ত্রিক চর্চার উন্নয়ন ঘটানো এবং তা অব্যাহত রাখা।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
প্রথম অধ্যায়	
১.১ ভূমিকা	১
১.২ গবেষণার সমস্যা চিহ্নিতকরণ	২
১.৩ **গবেষণায় গৃহীত অনুকল্পসমূহ**	৪
১.৪ গবেষণার উদ্দেশ্য	৪
১.৫ গবেষণার যৌক্তিকতা	৫
১.৬ গবেষণার পদ্ধতি	৫
১.৭ গবেষণার সীমাবদ্ধতা	৬
১.৮ অধ্যায় বিন্যাস	৬
দ্বিতীয় অধ্যায়	
২.১ রাজনৈতিক সংস্কৃতি : একটি তাত্ত্বিক আলোচনা	৭
২.২ রাজনৈতিক সংস্কৃতির শ্রেণী বিভাগ	৯
২.৩ রজেনব্যামের রাজনৈতিক সংস্কৃতির শ্রেণী বিভাগ	১০
২.৪ এ্যালমন্ড ও ভারবা'র রাজনৈতিক সংস্কৃতির শ্রেণী বিভাগ	১০
২.৫ তৃতীয় বিশ্বের রাজনৈতিক সংস্কৃতির স্বরূপ	১৪
২.৬ সংসদীয় গণতন্ত্র : একটি তাত্ত্বিক আলোচনা	১৫
২.৭ গণতন্ত্র	১৭
২.৮ সংসদীয় গণতন্ত্র	২১
তৃতীয় অধ্যায়	
৩.১ বাংলাদেশের স্বাধীনতাপূর্ব রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক পটভূমি	২৩
৩.২ ১৯৭০ সালের নির্বাচন ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম	৩০

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

৪.১ বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন ও সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রবর্তন ৩৬
৪.২ সংসদীয় গণতন্ত্রের বিলুপ্তি ও তৎপরবর্তী রাজনৈতিক অবস্থা ৩৮
৪.৩ ১৯৯০ সালের গণঅভ্যুত্থান ও সংসদীয় গণতন্ত্রের পুন:প্রতিষ্ঠা ৪১
৪.৪ ১৯৭২ সালের সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পূর্বে পরিচালিত গণআন্দোলনসমূহ ৪৩
৪.৫ ১৯৯১ সালের সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পূর্বে পরিচালিত গণআন্দোলনসমূহ ৪৫

পঞ্চম অধ্যায়

৫.১ বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও সংসদীয় গণতন্ত্রের স্বরূপ ৪৮
৫.২ বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন সমূহের গতিপ্রকৃতি ৫১
৫.৩ বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা ৬৪
৫.৪ জোটের রাজনীতি ও বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি ৬৯
৫.৫ ছাত্র রাজনীতি, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি ও বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি ৭৪
৫.৬ বাংলাদেশের রাজনীতিতে ব্যবসায়ী, সামরিক ও বেসামরিক আমলাদের প্রভাব ৭৮
৫.৭ গণমাধ্যমের স্বাধীনতা এবং বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি ৮৪
৫.৮ পারস্পরিক দোষারোপ, প্রতিহিংসা ও প্রতিশ্রুতিভংগের রাজনৈতিক সংস্কৃতি ৮৯
৫.৯ হরতাল, ধর্মঘট, অবরোধ, সহিংসতা ও বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি ৯৩
৫.১০ বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্র ও সংসদ বর্জন সংস্কৃতি ৯৭
৫.১১ নামকরণ, নাম কর্তন ও ছবির রাজনীতি ১০২
৫.১২ বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও রাজনীতিকদের দলবদলের রাজনীতি ১০৬
৫.১৩ রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন ও বাংলাদেশের রাজনীতি ১১০
৫.১৪ বাংলাদেশের রাজনীতিতে ধর্মের প্রভাব ১১৩
৫.১৫ বাংলাদেশের রাজনীতিতে দলীয় কোন্দল ১১৮

ষষ্ঠ অধ্যায়

৬.১ রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও সংসদীয় গণতান্ত্রিক উন্নয়নে সিভিল সোসাইটির ভাবনা ১২০

সপ্তম অধ্যায়

৭.১ উপসংহার ১২৭
৭.২ গ্রন্থপঞ্জী ১৩৪

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ও চিত্র সমূহের তালিকা

সারণীর নং ও নাম

		পৃষ্ঠা নং
সারণী : ১	১৯৭০ সালের পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে দলীয় ও অঞ্চলগত প্রার্থী মনোনয়ন	৩০
সারণী : ২	১৯৭০ সালের পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের ফলাফল	৩১
সারণী : ৩	১৯৭০ সালের পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক আইন পরিষদের নির্বাচনের ফলাফল	৩২
সারণী : ৪	১ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল, ১৯৭৩	৫২
সারণী : ৫	২য় জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল, ১৯৭৯	৫৩
সারণী : ৬	৩য় জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল, ১৯৮৬	৫৪
সারণী : ৭	৪র্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল, ১৯৮৮	৫৫
সারণী : ৮	৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল, ১৯৯১	৫৬
সারণী : ৯	৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল, ১৯৯৬	৫৭
সারণী : ১০	৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল, ২০০১	৫৮
সারণী : ১১	৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল, ২০০৮	৬০
সারণী : ১২	পঞ্চম, সপ্তম, অষ্টম ও নবম জাতীয় সংসদে সদস্যদের পেশাগত অবস্থান	৭৯
সারণী : ১৩	সংসদে বিরোধী দলের ওয়াকআউট	৯৯

চিত্রের নং ও নাম

চিত্র : ১	৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চারদলীয় জোটের প্রাপ্ত আসন	৬১
চিত্র : ২	৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মহাজোটের প্রাপ্ত আসন	৬১
চিত্র : ৩	পঞ্চম, সপ্তম, অষ্টম ও নবম জাতীয় সংসদে সদস্যদের পেশাগত অবস্থান	৭৯
চিত্র : ৪	সংসদে বিরোধী দলের ওয়াকআউট	৯৯
চিত্র : ৫	দুর্নীতি দমন কমিশন সম্পর্কে সরকারের নেয়া পদক্ষেপগুলি বিষয়ে জনমত জরিপ	১১২

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

১.১ ভূমিকা

কোন দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে রাজনৈতিক উন্নয়ন। রাজনৈতিক উন্নয়ন ছাড়া আর্থ সামাজিক উন্নয়ন অসম্ভব। বাংলাদেশ নব্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত একটি উন্নয়নকামী দেশ। একটি দেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন সে দেশের গৃহীত মতাদর্শ, রাজনৈতিক ধ্যান ধারণা, বিশ্বাস তথা রাজনৈতিক সংস্কৃতির উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। পাশাপাশি প্রয়োজন একটি শক্তিশালী গণতান্ত্রিক কাঠামোর। বর্তমান বিশ্ব রাজনীতিতে এ কথা যেমন বহুল প্রচলিত তেমনি সর্বাংশে সত্য বলে প্রমানিত হয়েছে। আর তাই এই আধুনিক ও পরিবর্তনশীল বিশ্ব রাজনীতিতে অধিকাংশ রাষ্ট্রই গণতান্ত্রিক লক্ষ্য অর্জনে কল্যাণমূলক কার্যাবলী সম্পাদনে অধিক তৎপর হয়ে উঠেছে। কেননা কল্যাণমূলক কার্য সম্পাদনের উপর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব ও অস্তিত্ব নির্ভরশীল। অধিকাংশ রাষ্ট্রই তার পুলিশী ভূমিকার সনাতনি আচরণের পরিবর্তে জনকল্যাণ সাধন, শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জনসহ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অঙ্গিকারাবদ্ধ হয়েছে। বর্তমান বিশ্বের উন্নত রাষ্ট্রসমূহ প্রচলিত শাসন ব্যবস্থার মধ্যে অধিকতর গ্রহণযোগ্য শাসন ব্যবস্থা হিসেবে গণতন্ত্রকে বেছে নিয়েছে। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা সংসদীয় ও রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার এ দু'ভাবে বিভক্ত, যা মূলত আইন ও শাসন বিভাগের সম্পর্কের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়ে থাকে। তবে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার দুই পদ্ধতির মধ্যে সংসদীয় সরকার পদ্ধতি সর্বোত্তম হিসাবে গৃহীত ও প্রতীয়মান হয়েছে। ভারত উপমহাদেশের অবহেলিত অথচ ঐতিহ্যে ভরা এ জনপদ যা বর্তমানে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ নামে পরিচিত যুগে যুগে তা শাসন করেছে বিভিন্ন জাতি, সম্প্রদায় বা ব্যবসায়ী গোষ্ঠী। বৃটিশ শাসনামল থেকেই এ দেশের জনগণ এমন একটি শাসন ব্যবস্থার আকাঙ্ক্ষা করে আসছে, যে শাসন ব্যবস্থা জনগণের কল্যাণের কথা বলবে, আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটাবে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের রক্তস্নাত পথ পেরিয়ে ১৯৭১ সালে দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকেই আমাদের লক্ষ্য ছিল একটি সুষ্ঠু ও শক্তিশালী গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক কাঠামো বিনির্মাণ করা। এ জন্যই সত্যিকার অর্থে গণতান্ত্রিক শাসন কায়েমের জন্য শাসন পদ্ধতি হিসেবে ১৯৭২ সালের সংবিধানে জবাবদিহিমূলক সংসদীয় সরকার পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। কিন্তু ১৯৭৫ সালে সংবিধানের ৪র্থ সংশোধনীর মাধ্যম একদলীয় রাষ্ট্রপতি শাসিত সরবকার পদ্ধতি প্রবর্তন এবং তৎপরবর্তী সামরিক ও বেসামরিক শাসন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার পদ্ধতি গ্রহণের মধ্য দিয়ে জনগণের দীর্ঘদিনের কাঙ্ক্ষিত সংসদীয় সরকার ব্যবস্থাকে প্রত্যাহার করা হয়। শুরু হয় সামরিক শাসন। একের পর এক অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার জন্ম হতে থাকে বাংলাদেশের রাজনীতিতে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে নেমে আসে ঘোর অমানিশা, চলে স্বৈরাচারী শাসন। জীবন, জীবিকা, অর্থনীতি, রাজনীতি হয় পর্যুদস্ত। শুরু হয় গণআন্দোলন। স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে এবং সংসদীয় সরকারের পুনরুদ্ধারের জন্য এ গণআন্দোলন ব্যাপক আগ্রহ ও স্পৃহা নিয়ে পরিচালিত হতে থাকে। জনগণের গণতান্ত্রিক

Dhaka University Institutional Repository

স্পৃহার নিকট ১৯৯১ সালে সামরিক শাসনের অবসান ঘটলে দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র পুণ:প্রতিষ্ঠিত হয়।

১.২ গবেষণার সমস্যা চিহ্নিতকরণ

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা যেমন কঠিন কাজ, তার চেয়ে কঠিন কাজ হলো গণতন্ত্রকে স্থিতিশীল রাখা। কেননা গণতন্ত্র কেবলমাত্র একটি শাসন ব্যবস্থাই নয় এটা একটি রাজনৈতিক সংস্কৃতিও বটে। যেটাকে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলা যেতে পারে। সংস্কৃতি যেমন অপসংস্কৃতির আগ্রাসনের স্বীকার হয়, গণতন্ত্রও তেমনি অগণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জার্মানীতে অগণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল ন্যাৎসী পার্টির নেতৃত্বে গণতন্ত্র ধ্বংস হয়েছিল ১৯৩৩ সালে। গৃহযুদ্ধের জন্য গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা হুমকির সম্মুখীন লেবাননে, শ্রীলঙ্কায়, ইসরাইল এবং ইরাকসহ পৃথিবীর বহু দেশ। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ পৃথিবীর বিচ্ছিন্ন কোন দেশ নয়। ১৭৫৭ সালে পলাশীর আম্রকাননে বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর দীর্ঘ ১৯০ বছরের বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসন এর তিক্ত অভিজ্ঞতা, ১৯৪৭ সালের পর হতে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর শোষণ, বঞ্চনা ও অধিকার বিবর্জিত নীতি এ দেশের জনগণকে জাতীয়তাবাদী চেতনায় ঐক্যবদ্ধ করে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের ৬ দফা কর্মসূচী, ১৯৬৯ এর গণ অভ্যুত্থান এবং সর্বোপরি ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা তারই বহি:প্রকাশ। ১৯৭২ সালের সংবিধানে জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা হিসেবে সংসদীয় সরকার কাঠামো প্রবর্তন করা হয়। কিন্তু ১৯৭৫ সালের সংবিধানের ৪র্থ সংশোধনীর মাধ্যমে এ ব্যবস্থা রহিত করে সে স্থলে একদলীয় রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার পদ্ধতির প্রবর্তন করা হয়। এরপর দীর্ঘ ১৬বছর পর ১৯৯১ সনে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত ৫ম সংসদে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর ঐক্যমতের ভিত্তিতে তিন জোটের রূপরেখার আলোকে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে দেশে পুনরায় সংসদীয় সরকার প্রবর্তিত হয়। বিগত পঞ্চম, সপ্তম ও অষ্টম সংসদ এই তিনটি মেয়াদে পনের বছর নিরবিচ্ছিন্নভাবে এই ব্যবস্থায় দেশ পরিচালিত হয়েছে। অষ্টম সংসদের মেয়াদ উত্তীর্ণের পর দেশে পুনরায় রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দেয়। সংসদীয় সরকার হয়ে পড়ে হুমকির সম্মুখীন। রাজনৈতিক সংস্কৃতি হয় ক্ষতিগ্রস্ত। সামরিক কর্তৃপক্ষ দুই বছরের অধিক সময় ধরে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখে। পরবর্তীতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ক্ষমতার নিয়মতান্ত্রিক পরিবর্তন সাধিত হলেও জনগণের প্রত্যাশানুযায়ী রাজনৈতিক সংস্কৃতির গুণগত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে কিনা সেটাই আজ বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঔপনিবেশিক আমল থেকে আমাদের প্রত্যাশাই ছিল সংসদীয় গণতন্ত্র। ১৯৭২ সালের সংবিধানের মাধ্যমে অর্জিত সংসদীয় গণতন্ত্র মাত্র তিন বছরের ব্যবধানে ১৯৭৫ সালে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে হারিয়েছি। বহু ত্যাগ তিতিক্ষা, আন্দোলন, সংগ্রামের পর ১৯৯১ সালের দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে পুনরায় জনগণের প্রত্যাশিত সংসদীয় গণতন্ত্রকে ফিরে পেয়েছি। আশা ছিল রাজনৈতিক দলগুলো ঐকমত্যের ভিত্তিতে সংসদীয় ব্যাবস্থাকে গতিশীল করবে, রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডে প্রতিফলিত হবে জনগণের ইচ্ছা ও মতামত, রাজনৈতিক সংস্কৃতি হবে উন্নত। কিন্তু ৫ম সংসদ হতে বর্তমান নবম সংসদ পর্যন্ত বিরোধীদলের সংসদীয়

Dhaka University Institutional Repository

কার্যক্রমে অনুপস্থিতি ও অসহযোগিতা, সংসদীয় কমিটি গুলোতে অনুপস্থিতি, কমিটি গঠনে দীর্ঘসূত্রিতা সংসদীয় গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিকে পুনরায় ব্যর্থতার জালে আবদ্ধ করছে।

২০০৯ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের দলের নেতৃত্বে মহাজোট ৫৫.৮৫% ভোট পেয়ে ২৬২টি আসন লাভ করে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের নেতৃত্বে চারদলীয় ঐক্যজোট ৩৮.৪৩% ভোট পেয়ে ৩৩টি আসন লাভ করে প্রধান বিরোধী দলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। সংসদীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থার নিয়মানুযায়ী সরকারি দলকে বিরোধীদলীয় রাজনৈতিক কর্মকান্ডকে জাতীয় সংসদের মধ্যে ধারণ করতে হয়, কিন্তু সরকারি দল তা অর্জন করতে যেমন ব্যর্থ হচ্ছে ঠিক তেমনি বিরোধী দল সংসদে গিয়ে নিয়মতান্ত্রিকভাবে সরকারকে সহযোগিতা না করে বরং একের পর এক সংসদ বয়কট ও বর্জন করে যে নিম্ন রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে লালন করে চলেছে তাতে সংসদীয় ব্যবস্থা পুনরায় প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে। এ ধরনের সংসদীয় সংস্কৃতি সত্যিকার অর্থে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের পথে বাঁধা সৃষ্টি করছে। এখানে উল্লেখ্য যে, ১৯৯১ সালে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর হতে আজ পর্যন্ত সকল বাজেট বিরোধী দলের অনুপস্থিতিতে জাতীয় সংসদে পাশ হয়েছে। এতে বিরোধী দলের সুচিন্তিত সমালোচনা ও পরামর্শ হতে জাতি বঞ্চিত হয়েছে। সম্প্রতি জাতীয় সংসদে ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের গুরুত্বপূর্ণ বাজেট অধিবেশনে বিরোধী দল অনুপস্থিত থেকেছে। বিগত সরকারগুলির বিভিন্ন আমলে বিরোধী দল এভাবে বাজেট অধিবেশন বর্জন করেছে বহুবার। ১৯৯১ সাল থেকে এ পর্যন্ত ২০টি বাজেট হয়েছে। এর মধ্যে জাতীয় সংসদে ১৮টি বাজেট পেশ করেছে নির্বাচিত সরকার (২০০৭ ও ২০০৮ সালের বাজেট দিয়েছে তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংবাদ সম্মেলন করে)। এর মধ্যে দুই মেয়াদে বিএনপি দিয়েছে ১০টি। চলতি বছরসহ আওয়ামী লীগ দিয়েছে ৭টি। খালেদা জিয়ার প্রথম সরকারের প্রথম বাজেট পেশকালে বিরোধীদল উপস্থিত ছিল দ্বিতীয়টিতে অর্থাৎ ১৯৯২ সালে ছিল না। ১৯৯৩ সালে ছিল কিন্তু পরবর্তী দুটিতে সংসদ পদত্যাগ করে রাজপথে আন্দোলনরত ছিল। ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে আওয়ামী লীগ মোট পাঁচটি বাজেট পেশ করে। এর মধ্যে বিএনপি ১৯৯৮, ২০০০ ও ২০০১ সালে অনুপস্থিত ছিল। ২০০২-২০০৬ মেয়াদে বিএনপি'র নেতৃত্বে জোট সরকার পাঁচটি বাজেট পেশ করে। এর মধ্যে আওয়ামী লীগ উপস্থিত ছিল মাত্র একবার, ২০০৬ সালে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন এসে যায় এটাই কি সংসদীয় সংস্কৃতি? এটাই কি আমাদের প্রত্যাশিত গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতি? উল্লেখ্য যে, সংসদীয় গণতন্ত্রের বিকাশের অন্যতম প্রধান শর্ত অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন পদ্ধতি প্রতিষ্ঠার জন্য তৎকালীন বিরোধীদলের দাবিরপরিপ্রেক্ষিতে ৬ষ্ঠ সংসদে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় এবং এ পদ্ধতির মাধ্যমে সপ্তম ও অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৯৬ , ২০০১ ও ২০০৮ সালের সাধারণ নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠিত হলেও নির্বাচনত্তোর বিশৃঙ্খল পরিবেশ ও নানা প্রতিবন্ধকতার দরুন সংসদীয় গণতন্ত্র সত্যিকার অর্থে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়নি। আর এ প্রেক্ষাপটে আমি মনে করি বাংলাদেশর রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও সংসদীয় গণতন্ত্র সম্পর্কিত আলোচনা, পর্যালোচনা ও গবেষণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী।

Dhaka University Institutional Repository

১.৩ গবেষণায় গৃহীত অনুকল্পসমূহ

(ক) বাংলাদেশে জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী সকল রাজনৈতিক দলগুলোর সংসদ অধিবেশন সমূহে স্বত:স্ফূর্ত অংশগ্রহণ না করা ও দলগুলোর মধ্যে পারস্পারিক সহযোগিতা ও সহনশীল আচরণ না থাকা সংসদীয় শাসন ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের অন্যতম প্রতিবন্ধক।

(খ) হরতাল, অবরোধের মত সহিংস কর্মসূচী সুষ্ঠু রাজনৈতিক সংস্কৃতির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃস্টি করে।

(গ) পেশাদার রাজনীতিবিদদের অভাব এবং ব্যবসায়ী, সরকারি-বেসরকারি আমলাদের রাজনীতিতে অতিমাত্রায় অংশগ্রহণ বংলাদেশের সংসদীয় শাসন ব্যবস্থাকে ব্যহত করছে।

(ঘ) সীমাহীন দলীয় কোন্দল, প্রতিহিংসা পরায়ণতা, রাজনৈতিক স্বার্থে ধর্মকে ব্যবহারের মত যাবতীয় নেতিবাচক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতি বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্র ও সামগ্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে একটি শক্তিশালী কাঠামোয় রূপ দিতে বাঁধাগ্রস্ত করছে।

১.৪ গবেষণার উদ্দেশ্য

১৯৭২ সালের পর হতে বিভিন্ন বাঁধা বিপত্তি, সামরিক ও বেসামরিক শাসন, নব্বইর গণআন্দোলন অতিক্রম করে ১৯৯১ সালে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা পূনরায় প্রবর্তিত হয়। বিগত চারটি মেয়াদে (১৯ বছর) সংসদীয় সরকার পদ্ধতিতে বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হয়েছে। কিন্তু এ সময় ধরে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিদ্যমান অস্থিতিশীলতা, হরতাল, অবরোধ, নাগরিক নিরাপত্তাহীনতা, সংসদ বর্জন, সংসদীয় কমিটি গঠনে দীর্ঘসূত্রিতা, কমিটির সিদ্ধান্তের প্রতি অবজ্ঞা, জাতীয় নির্বাচন বয়কট, নির্বাচন কেন্দ্রিক জনগণের মধ্যে উৎকণ্ঠা, রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিহিংসামূলক ক্রিয়াকলাপ, রাজনৈতিক মতাদর্শগত বিভেদ, দলীয় কোন্দল, বংশানুক্রমিক ও ব্যক্তিকেন্দ্রীক রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং পুনরায় জরুরি অবস্থা জারি ও নিয়মতান্ত্রিক নির্বাচন বিলম্বিত হওয়ায় রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে বিরূপ প্রভাব ফেলেছে। কিন্তু, বাংলাদেশের জনগণের কাঙ্ক্ষিত সংসদীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার পরও কেন এ রকম হচ্ছে? আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতি কেন আজ প্রশ্নবিদ্ধ ? আমাদের এ ব্যর্থতার কারণ কি? এ সকল প্রশ্ন বিবেচনায় গবেষণা কর্মটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, বাংলাদেশের সংসদীয় ব্যবস্থায়-

(ক) বিদ্যমান রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও সংসদীয় গণতন্ত্রের ধরণ ও বৈশিষ্ট্য কেমন?

(খ) বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থার কোন কোন বৈশিষ্ট্যগুলি সুষ্ঠু রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও সংসদীয় গণতন্ত্রের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃস্টি করছে? এবং

(গ) এ প্রেক্ষিতে সুষ্ঠু রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও সংসদীয় গণতন্ত্রের সফলতার জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে? ইত্যাদি বিষয়ে অনুসন্ধান করা।

Dhaka University Institutional Repository

১.৫ গবেষণার যৌক্তিকতা

বাংলাদেশের ইতিহাস, রাজনীতি, রাজনৈতিক সংস্কৃতি, গণতন্ত্র অথবা সংসদীয় গণতন্ত্র সংশ্লিষ্ট যাবতীয় গবেষণা সমূহকে স্বাধীনতা পূর্ববর্তী ও স্বাধীনতাত্তোর অবস্থার ভিত্তিতে আলোচনা করা যথেষ্ট গ্রহণযোগ্য ও সমীচীন হবে। প্রথম ভাগের গবেষণা সমূহ মূলত বাংলাদেশের স্বাধীনতা পূর্বাবস্থায় পশ্চিম পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর নিকট হতে প্রাপ্ত বঞ্চনা ও বৈষম্যের স্বরূপ চিহ্নিতকরণ এবং স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দ্বারা পরিচালিত হতে পারে। স্বাধীনতাত্তোর গবেষণা কর্মগুলোকে '৯০ এর গণ আন্দোলন পূর্ববর্তী (১৯৭১-১৯৯০) এবং '৯০ এর গণ আন্দোলন পরবর্তী (১৯৯১-চলমান) অবস্থার ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করা যায়। এক্ষেত্রে প্রথম ভাগের গবেষণা কর্মসমূহকে একটি দেশের আংশিক স্বাধীনতাকামী জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক জীবন, তাদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আকাঙ্খা এবং এ লক্ষ্যে পরিচালিত বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলন, তৎকালীন সামগ্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিদ্যমান বিভিন্ন সমস্যা ও সংকটসমূহ এবং তা থেকে উত্তরণের উপায় সমূহ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের জন্য পরিচালনা করা যেতে পারে। পরবর্তী ভাগে নব্বই এর গণ আন্দোলন পরবর্তী গবেষণা সমূহ অধিকতর প্রয়োগিক ও বাস্তবতা নির্ভর। এ সময়ে ক্ষমতার নিয়মাতান্ত্রিক পরিবর্তন, দেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতি এবং শাসন ব্যবস্থায় গুনগত কোন ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে কিনা, সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা জনগণের আশা আকাঙ্খার বাস্তবায়নে কি ভূমিকা রেখেছে? বর্তমান গবেষণা কর্মটি এ সকল বিষয় সমূহের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। এছাড়াও বর্তমান শতাব্দীর এ সূচনা লগ্নে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক সংসদীয় শাসন প্রতিষ্ঠা এবং একটি সুষ্ঠু রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক পরিবেশের আকাঙ্খায় সুশীল সমাজ, বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ তথা দেশের আপামর সচেতন নাগরিকগণ উদগ্রীব হয়ে আছে। এমতাবস্থায় দেশের সংসদীয় গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতির উন্নয়নে "বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও সংসদীয় গণতন্ত্র : একটি বিশ্লেষণ" শীর্ষক গবেষণাকর্মটি একটি যৌক্তিক তাৎপর্যপূর্ণ ও সময়োপযোগী গবেষণা বলে বিবেচিত হবে বলে আমার বিশ্বাস।

১.৬ গবেষণার পদ্ধতি

সাধারণ অর্থে গবেষণা হলো সত্য ও জ্ঞানের প্রণালীবদ্ধ অনুসন্ধান। সামাজিক ও রাজনৈতিক গবেষণার ক্ষেত্রে যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ তা হলো সামাজিক ও রাজনৈতিক কার্যাবলীতে অংশগ্রহণকারী সদস্যদের আচরণ, সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনাবলী এবং সংশ্লিষ্ট নানাবিধ সমস্যা সমূহ পরিপূর্ণভাবে ব্যখ্যা ও বিশ্লেষণের জন্য কিছু সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যুক্তিভিত্তিক বিচার বিশ্লেষণ করা। গবেষণা কর্মে গবেষণা পদ্ধতি হিসেবে "ঐতিহাসিক পদ্ধতি" অনুসরণ করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে মাধ্যমিক উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণার বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট বইপত্র, জার্নাল, গবেষণা প্রতিবেদন, পত্রিকান্তে প্রকাশিত রিপোর্ট, সম্পাদকীয়, সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামে প্রকাশিত ও উত্থাপিত প্রবন্ধ প্রভৃতি মাধ্যমিক তথ্যের উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

১.৭ গবেষণার সীমাবদ্ধতা

অত্র গবেষণা কর্মটি অনেকখানি বিশ্লেষণাত্মক ও ঐতিহাসিক রাজনৈতিক শাসনতান্ত্রিক প্রেক্ষাপটের আলোকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে মাধ্যমিক তথ্যের ভিত্তিতে গবেষণার সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর চেষ্টা করা হয়েছে। সময়ের সল্পতা, গবেষণার বিষয়বস্তুর ব্যাপ্তি, সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনাবলী বিশ্লেষণের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ও এ বিষয়ে বিজ্ঞজনদের সাথে যোগাযোগ ও একাডেমিক আলোচনার ব্যাপারে পর্যাপ্ত সময় প্রদান ও তাদের আগ্রহের অভাবের কারণে গবেষণা কর্মের প্রাথমিক তথ্য বা সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তবে বিভিন্ন বিষয়ে বিজ্ঞজনের মতামতের জন্য এতদ্ববিষয়ে সংশ্লিষ্ট পত্রিকা, ম্যাগাজিন, সেমিনার, বিভিন্ন ইলেকট্রনিক্স ও প্রিন্ট মিডিয়াতে উপস্থাপিত তাঁদের মতামত গবেষণা কর্মে প্রয়োজনানুসারে সংযুক্ত করা হয়েছে। রাজনৈতিক সংস্কৃতির মত ব্যাপক একটি বিষয় সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট বা জাতীয়ভাবে সাধারণীকরণ সম্ভব নয়। কেননা এ বিষয়ে সাধারণীকরণের জন্য সুদীর্ঘ সময়ব্যাপ্তি গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু একাডেমিক গবেষণা হিসেবে সময়ের সল্পতা, পর্যাপ্ত আর্থিক সহায়তার অভাব এ গবেষণার সীমাবদ্ধতা হিসেবে কাজ করেছে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির উন্নয়ন ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সুসংহতকরণের জন্য এতদ্ববিষয়ে আরো ব্যাপক ভিত্তিক মৌলিক গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে।

১.৮ অধ্যায় বিন্যাস

গবেষণা কর্মটি মোট সাতটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করে সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে গবেষণা প্রস্তাবনা, রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও সংসদীয় গণতন্ত্রের তাত্ত্বিক আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও সংসদীয় গণতন্ত্র : একটি তাত্ত্বিক আলোচনা শিরোনামে রাজনৈতিক সংস্কৃতির সংজ্ঞা, রাজনৈতিক সংস্কৃতির শ্রেণী বিভাগ, গণতন্ত্র ও সংসদীয় গণতন্ত্র সম্পর্কে আলোচনার মাধ্যমে উক্ত গবেষণার তাত্ত্বিক কাঠামো বিনির্মানের চেষ্টা করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে- বাংলাদেশের স্বাধীনতাপূর্ব রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক পটভূমি এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে- বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও সংসদীয় গণতন্ত্র, বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রবর্তন ও বিলুপ্তি এবং তৎপরবর্তী বাংলাদেশের রাজনৈতিক অবস্থা বর্ণণা করে ১৯৯০ সালের গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে সংসদীয় গণতন্ত্রের পুন:প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে ১৯৭২ ও ১৯৯১ সালে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পূর্ববর্তী সময়ে সংঘটিত গণআন্দোলনসমূহের তুলনামূলক একটি ধারণা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে- বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের বিভিন্ন নির্বাচন, বাংলাদেশের সরকারি ও বিরোধী দল সমূহের নেতিবাচক, ইতিবাচক রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য ও কার্যাবলী , বাংলাদেশের ধর্মীয় রাজনীতি, জোটের রাজনীতি, ছাত্র রাজনীতি, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, দুর্নীতি ইত্যাদি সম্পর্কে বিভিন্ন আলোচনা করে সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির স্বরুপ অন্বেষণের চেষ্টা করা হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে- বাংলাদেশের বিশিষ্ট নাগরিকেরা এদেশের গণতন্ত্র, সংসদীয় গণতন্ত্র, নির্বাচন ব্যবস্থা, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ইত্যাদিসহ বাংলাদেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি সম্বন্ধে কি ধারণা পোষণ করেন এবং এ প্রেক্ষিতে ভবিষ্যত দিকনির্দেশনা সম্পর্কে তাঁদের কিছু মতামত উপস্থাপন করা হয়েছে। সপ্তম অধ্যায়ে- গবেষণার ফলাফল ও উপসংহার লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

২.১ রাজনৈতিক সংস্কৃতি : একটি তাত্ত্বিক আলোচনা

বর্তমানে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বহুল প্রচলিত ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচিত বিষয়গুলির মধ্যে অন্যতম একটি প্রত্যয় হল রাজনৈতিক সংস্কৃতি। নৃবিজ্ঞানের ব্যাপকভাবে আলোচিত সংস্কৃতি শব্দটিকে রাজনীতির সাথে সমন্বয় ঘটিয়ে রাজনৈতিক সংস্কৃতি প্রত্যয়টিকে জনপ্রিয়তার শীর্ষে নেওয়ার ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম অবদান রেখেছেন Gabriel Almond. [১] তাঁর মতে, রাজনৈতিক সংস্কৃতি হলো কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থার সদস্যদের রাজনীতি সম্পর্কে মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিকৃতি (The pattern of individual attitudes and orientations toward politics shared by members of a political system)[২] রাজনৈতিক সংস্কৃতি সম্পর্কিত এলমন্ডের এ ধারনা থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, রাজনৈতিক ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত সদস্যদের কার্যকলাপের সাথে সংস্কৃতির নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। আর এ কারণেই বিভিন্ন লেখকগণ ও বিশ্লেষকের ভিন্ন ভিন্ন মন্তব্যের প্রেক্ষিতে বর্তমানে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, নৃবিজ্ঞানের ব্যাপক ব্যবহৃত সংস্কৃতি শব্দটি রাজনীতি বিজ্ঞানের সাথে ওতোপ্রোতভাবে মিশে গেছে, ফলশ্রুতিতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এর স্বার্থক প্রয়োগও ঘটেছে।

অধ্যাপক এম. সাইফুল্লাহ ভূঁইয়ার ভাষায় " Political culture like political socialization and political communication is one of the concepts which in recent years is being widely used in political science literature. It has since been employed in the comparative analysis, not simply of the developing countries, but of the developed nations as well".[৩] বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও লেখক রাজনৈতিক সংস্কৃতি সম্পর্কে বিভিন্ন ধরণের মতবাদ প্রদান করেছেন।

এলান আর বল (Allan R Ball) এর মতে "রাজনৈতিক সংস্কৃতি হচ্ছে সমাজের সেসব মনোভাব, বিশ্বাস, আবেগ ও মূল্যবোধের সমষ্টি যেগুলো রাজনৈতিক ব্যবস্থার ও রাজনৈতিক প্রশ্নাদির সাথে সম্পর্কযুক্ত। (A political culture is composed of the attitudes, beliefs, emotions and values of society that relate the political system and to political issues) [৪]

লুসিয়ান পাই (Lucian Pye) এর মতে, রাজনৈতিক সংস্কৃতি হলো ধ্যান ধারনা বিশ্বাস এবং অনুভূতির এক সমষ্টি যা রাজনৈতিক কার্যকলাপকে অর্থপূর্ণ করে তোলা ও রাজনৈতিক কার্যকলাপের সুশৃঙ্খল এক ভাবের সৃস্টি করে, রাজনৈতিক কার্যকলাপের মনস্তাত্ত্বিক ও অভ্যন্তরীণ দিকের সঠিক প্রকাশ ঘটে রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে।[৫]

---

[১] Almond, Gabriel, 1956 "Comparative Political Systems", Journal of politics, pp. 391-409.

[২] Almond, Gabriel and Powell, G Bingham, 1966, Jr. Comparative politics: A Developmental Approach (Boston: Little, Brown & Co.) pp. 32-33.

[৩] Bhuyan, M. Sayefullah, 1991,"Political Culture in Bangladesh", Dhaka University Journal, p.67, (First extended attempt to apply the concept of political Culture to political system in the developed world.)

[৪] MacIver, R.M. The Modern state, ch.x. P. 290.

[৫] Verba, Sidney, 1665, "Comparative political culture," in Lucian Pye and Sidney verba, eds, Political Culture and Political Development, Princeton: Princeton University press p. 513

Dhaka University Institutional Repository

অ্যালমন্ড ও ভারবা তাদের বিখ্যাত গ্রন্থ *The Civic Culture* এ রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে, "রাজনৈতিক সংস্কৃতি কথাটি দ্বারা সুনির্দিষ্টভাবে কতিপয় রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে বুঝায়, রাজনৈতিক ব্যবস্থায় এবং এর বিভিন্ন অংশ সম্পর্কে মনোভাব এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ব্যক্তির ভূমিকা সম্পর্কে মনোভাব"(The term political culture thus refers to the specially political orientations, attitudes towards the political system and its various parts and attitudes toward the role of the self in the system)।[৬]

স্যামুয়েল এইচ বিয়ার (Samuel H Beer) বলেন, রাজনৈতিক সংস্কৃতি হলো ক্ষমতা, স্বার্থ এবং নীতিমালার সাথে সম্পর্কযুক্ত পরিবর্তশীল একটি ধারনা, এটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্বার্থ ও উদ্দেশ্যকে গঠন ও নিয়ন্ত্রন করে; রাজনৈতিক ব্যবস্থার ধরন ও প্রকৃতিতে কোন রূপ পরিবর্তন আনয়নের জন্য দায়ী এবং সর্বোপরি রাজনৈতিক সংস্কৃতি অপরিকল্পিত ও অনভিপ্রেত আচরণ, মূল্যবোধ ও বিশ্বাস দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে।[৭]

অধ্যাপক কে বি সাঈদ বলেন, "রাজনৈতিক সংস্কৃতি হলো জাতীয় বা সাধারণ সংস্কৃতির সেই অংশ যা সামগ্রিক রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে মূল্যবোধ, বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে গঠিত।(That sector of the national or general culture which consists of values, beliefs and attitudes pertaining to political as a whole)[৮]

ডেভিড পল (David paul) তার মতে, রাজনৈতিক সংস্কৃতি হলো মূল্যবোধ, প্রতীক দৃষ্টিভঙ্গি এবং আচরণের পর্যবেক্ষনযোগ্য এক বহিরাকৃতি স্বরূপ যাকে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোন থেকে অবলোকন করলে মনোভাবনাতে উপাত্ত অপেক্ষা অধিক পরিমানে সমাজের রাজনৈতিক সংস্কৃতির উপর আলোকরশ্মি বিতরণ করতে সক্ষম।"[৯]

সিডনী ভারবা বলেন, "পরীক্ষালব্ধ বিশ্বাস, প্রকাশযোগ্য প্রতীক ও মূল্যবোধের সমষ্টি রাজনৈতিক সংস্কৃতি, রাজনৈতিক সংস্কৃতিই রাজনৈতিক কার্যকলাপের প্রকৃতি ও পরিধি ব্যাখ্যা করে।"(The political culture consists of empirical beliefs, expressive symbols and values which define the situation in which political action take place. It provides the subjective orientation of politics.)[১০]

রাজনৈতিক সংস্কৃতির উপরোল্লিখিত সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করলে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, রাজনৈতিক সংস্কৃতি হলো কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অংশগ্রহনকারী সদস্যদের রাজনীতি সম্পর্কে ধ্যান ধারণা, শ্রদ্ধাবোধ, নিয়মাতান্ত্রিক আইনের প্রতি আনুগত্য, গণতন্ত্রের প্রতি সহযোগিতা, রাজনৈতিক চর্চা ও ক্রমবিকাশ ইত্যাদির প্রতিচ্ছবি ও মূল্যবোধের সমষ্টি। এ প্রসঙ্গে লুসিয়ান ডব্লিউ পাই এর বক্তব্যটি উপস্থাপন করা যেতে পারে। এটা হচ্ছে এমন সব মন-মানসিকতা, বিশ্বাস এবং আবেগ যার মাধ্যমে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া অর্থবহ হয়ে ওঠে

---

[৬] Almond and Verba, 1972,The Civic culture, Princeton University press, p. 13.
[৭] Civic culture (Princeton University press 1963) p. 15.
[৮] Sayeed, K.B. The political system of pakistan, p. 159.
[৯] Civil culture (Princeton University press 1963) P.15.
[১০] Pye, Lucian W and Verba, S, 1965,Political Culture and Political Development, Princeton University press, p.218.

Dhaka University Institutional Repository

এবং এরই মাধ্যমে রাজনৈতিক আদর্শসমূহ গতিশীলতা লাভ করে। এ ধরনের আচরণ, বিশ্বাস এবং আবেগের মাধ্যমেই রাজনীতির গতি প্রকৃতি নির্ধারিত হয়।

রাজনৈতিক সংস্কৃতি হচ্ছে মূলত রাজনীতির মনস্তাত্ত্বিক এবং বৈবয়িক দিক সমূহের বহি:প্রকাশ। বলা যায় রাজনৈতিক সংস্কৃতি হলো রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারী সদস্যদের সমষ্টিগত ইতিহাসের ফল যার সাথে সদস্যদের ব্যক্তিগত জীবনের ইতিহাসের ও সম্পর্ক রয়েছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, রাজনৈতিক সংস্কৃতি যেমন সরকারী ঘটনাবলীর সাথে জড়িত ঠিক তেমনি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সাথে সম্পর্কিত। সংক্ষেপে বলা যায়, সামাজিক ব্যবস্থায় সংস্কৃতির যেমন গুরুত্ব রয়েছে ঠিক তেমনি রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক সংস্কৃতির গুরুত্ব অত্যধিক।[১১]

যেকোন সমাজ ব্যবস্থার একেবারে গভীরে প্রবেশ করলে সেখানে অবশ্যম্ভাবীভাবে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক কার্যাবলী, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, সামাজিক কার্যাবলী, শিক্ষা-দীক্ষা, প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ সম্পর্ক ইত্যাদি সব কিছুরই অস্তিত্ব খুব সহজেই উপলব্ধিযোগ্য। এবং পাশাপাশি এটাও পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, সকল রাজনৈতিক ও সামাজিক কার্যাবলী এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের সাথে ব্যক্তির আচার-আচরণ, সম্পর্ক সব কিছুই একটি সিষ্টেমের মাধ্যমেই নিয়ন্ত্রিত হয়। এই সিস্টেমই ঐ সমাজ ব্যবস্থার সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যকেই ধারন করে। অর্থাৎ সমাজে বসবাসকারী মানুষের সামগ্রিক জীবন প্রনালীই হলো সংস্কৃতি। গোপাল হালদারের মতে, "মানুষের জীবন সংগ্রামের মোট প্রচেষ্টাই সংস্কৃতি।[১২] আর রাজনৈতিক সংস্কৃতি হলো এই সাধারণ সংস্কৃতির সেই অংশ যা রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে জনগনের বিশ্বাস, অনুভূতি ও মূল্যায়নের সাথে সম্পর্কযুক্ত। সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রত্যেকেই তার রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে কোন না কোন ধারণা পোষণ করে, প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে মুল্যায়ণ করে। রাজনৈতিক সংস্কৃতি সম্পর্কে তালুকদার মনিরুজ্জামান বলেন, "রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে যে কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ব্যক্তির প্রতিবেশ পরিচিতি সে সকল দিকের সমষ্টিকে বোঝায়, যা ব্যক্তির রাজনৈতিক ব্যবহারকে প্রভাবিত করে এবং রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ ও নিয়োগ পদ্ধতি হচ্ছে সেই কার্যপ্রক্রিয়া যার মধ্য দিয়ে ব্যক্তি এই প্রতিবেশ পরিচিতিকরণ লাভ করে।[১৩]

২.২ রাজনৈতিক সংস্কৃতির শ্রেণী বিভাগ

পৃথিবীর সকল দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির ধরন এক নয়। এমন কি একই সমাজে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর মধ্যেও বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক সংস্কৃতি বিদ্যমান। তাত্ত্বিকেরা বিভিন্ন দিক থেকে রাজনৈতিক সংস্কৃতির শ্রেণী বিন্যাস করেছেন। এ ক্ষেত্রে এ্যলমন্ড, ভারবা, কোলম্যান, লুসিয়ানপাই, রজেনব্যাম প্রমুখের নাম উল্লেখ যোগ্য।

---

[১১] Lucian W.pye and S. Verba's Political Culture and Political Development translated in Bengali by Ahasun Habib, "রাজনৈতিক সমাজবিজ্ঞান" গ্রন্থকুঠির, ২০০৮।

[১২] হালদার গোপাল, ১৯৭৪, সংস্কৃতির রূপান্তর, মুক্তধারা, ঢাকা, পৃ. ৩।

[১৩] Moniruzzaman, Talukder, 1971, "The politics of development the case of Pakistan, 1947-1958, Green book House Limited, Dhaka, p. 5.

Dhaka University Institutional Repository

২.৩ রজেনব্যামের রাজনৈতিক সংস্কৃতির শ্রেণী বিভাগ

ওয়াল্টার এ রজেনব্যাম তার *Political Culture* নামক গ্রন্থে কতিপয় বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন:

ভঙ্গুর রাজনৈতিক সংস্কৃতি (Fragmented Political Culture)

অধ্যাপক রজেনব্যমের মতে, A fragmented political culture is one whose population lacks broad agreement upon the way in which political life should be conducted ভঙ্গুর রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে জনসমাজ বিভিন্নভাবে বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত এবং রাজনৈতিক জীবনের প্রতি তাদের পরস্পর বিরোধী এবং অসঙ্গতিপূর্ণ বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন।

সমন্বিত রাজনৈতিক সংস্কৃতি (Integrated Political Culture)

ভঙ্গুর রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিপরীত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন সংস্কৃতিকেই সমন্বিত রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলে। রাজনৈতিক জীবন পরিচালনার রীতিনীতি, রাজনৈতিক ব্যবস্থা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অনুসৃতব্য লক্ষ্য সমূহ বিরোধ নিষ্পত্তির সিভিল নিয়মাচার, প্রতিষ্ঠান, প্রতীক ইত্যাদি মৌলিক বিষয়ে যেখানে জনগোষ্ঠীর মধ্যে বৃহত্তর ঐক্য ও সমঝোতা বিদ্যমান, সাধারণতঃ তাকেই অখন্ড বা সমন্বিত রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলে।

২.৪ এ্যালমন্ড ও ভারবা'র রাজনৈতিক সংস্কৃতির শ্রেণী বিভাগ

রাজনৈতিক সংস্কৃতি মূলত: সার্বিকভাবে রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গি। Almond ও Verba তাদের শ্রেণী বিন্যাসে Talcott Parsons এবং Edward Shils কে অনুসরন করে ব্যক্তির রাজনৈতিক দৃষ্টি ভঙ্গিকে জ্ঞান সংক্রান্ত (cognitive), অনুভূতি সংক্রান্ত (affective) এবং মূল্যায়ন সংক্রান্ত (evaluative) এই তিনভাগে ভাগ করেছেন।

রাজনৈতিক সদস্যগণ সাধারনত রাজনৈতিক ব্যবস্থার নিম্নলিখিত তিনটি বিষয়ের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রদর্শন করে:

প্রথমত: আইন প্রনয়নকারী সংস্থা, প্রশাসন ব্যবস্থা বা আমলা ব্যবস্থার মত বিশিষ্ট কাঠামো ও তাদের ভূমিকা সম্পর্কে।

দ্বিতীয়ত: ঐ সব ভূমিকা পালনকারী ব্যক্তি বর্গ সম্পর্কে। যেমন-রাজা, আইন প্রণেতা, প্রশাসক ইত্যাদি।

তৃতীয়ত: উল্লেখযোগ্য রাষ্ট্রনীতি, সিদ্ধান্ত ও তাদের বাস্তবায়ন সম্পর্কে।

Almond and Verba রাজনৈতিক লক্ষ্য বস্তুর প্রতি ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গি, সচেতনতা ও কর্মকান্ডের উপর ভিত্তি করে রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন:

সংকীর্ণ রাজনৈতিক সংস্কৃতি (Parochial political culture)

সংকীর্ণ রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে সেই সমাজের রাজনৈতিক সংস্কৃতির কথা বলা হয়েছে, যেখানে এর সদস্যগণ জাতীয় রাজনীতি, রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং এর বিভিন্ন কাঠামো ও কার্যাবলী সম্বন্ধে কোন ধারণা বা জ্ঞান রাখে না। রাজনৈতিক ব্যবস্থার উপকরণ ও উপপাদ কার্যাবলী সম্বন্ধে তারা একেবারেই অজ্ঞ। ব্যক্তি

Dhaka University Institutional Repository

নিজেকে রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে না এবং ব্যক্তির ভূমিকা পালনের কোনো সুযোগও নেই। জনগণের সাথে সরকারের ব্যাপক দূরত্ব বজায় থাকে এবং রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের প্রতি জন সমর্থন খুবই কম থাকে। জনগণ রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোনো পরিবর্তন বা অন্যকিছু আশা করে না। রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ইনপুট ও আউটপুট সম্পর্কে জনগণের ধারণা খুবই কম এবং এ ব্যাপারে তাদের তেমন কোনো আগ্রহও থাকে না। রাজনৈতিক কর্তৃত্ব কর আদায় ও সামরিক বাহিনী পোষণের মধ্যে সীমিত থাকে। জনগণ স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ নিয়ে ব্যস্ত থাকে এবং জাতীয় পর্যায়ে খোঁজ রাখে না। জনগণ গোত্র, বর্ণ, গ্রুপ, ভাষা, অঞ্চল ইত্যাদিতে বিভক্ত থাকে এবং এগুলোর প্রতিই আনুগত্য প্রকাশ করে, বৃহত্তর জাতির কাছে নয়। জনগণের মধ্যে প্রচলিত দল ও মতের প্রতি আস্থা নেই এবং শাসন ক্ষমতা পরিবর্তনের প্রক্রিয়া সম্পর্কে কোনো সর্বসম্মত ও গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি নেই। এরূপ রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে বিশেষীকৃত কোনো ভূমিকা নেই। একই ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের হাতে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক ও ধর্মীয় ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকে। একই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান আইন, শাসন ও বিচার সংক্রান্ত কার্য সম্পাদন করে। এরূপ রাজনৈতিক সংস্কৃতির সাথে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও প্রক্রিয়া সংগতিপূর্ণ নয় বরং কর্তৃত্ববাদী শাসন ব্যবস্থাই সর্বাধিক উপযোগীবরে বিবেচিত হয়।

অধীন রাজনৈতিক সংস্কৃতি (Subject Political Culture)

অধীন রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও এর উপপাদ সম্পর্কে জনগণের মধ্যে যথেষ্ট চিন্তা ভাবনা ও ধারণা বিদ্যমান এবং জনগণ এর মুল্যবোধের বন্টন আশা করে। কিন্তু রাজনৈতিক ব্যবস্থার উপকরণ ও কার্যাবলী সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণভাবে নীরব ও নিস্পৃহ থাকে। রাজনৈতিক ব্যবস্থায় জনগণের ভূমিকা নেই এবং তারা ভূমিকা পালন করতে আগ্রহীও নয়। জনগণ নিজেদেরকে প্রজা হিসেবে মনে করে, সক্রিয় সদস্য হিসেবে নয়। রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এলিটরা এবং এতে জনগণের ভূমিকা থাকে না। জনগণ নিজেদেরকে একটি কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের সদস্য বলে মনে করে। অন্যান্য গ্রুপ বা কর্তৃপক্ষের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করলেও রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের প্রতি আনুগত্যই প্রধান। সংকীর্ণ রাজনৈতিক সংস্কৃতির চেয়ে এতে জনগণের মধ্যে অন্য দল ও মতের প্রতি আস্থার মনোভাব বেশী। ক্ষমতা পরিবর্তনের প্রক্রিয়া সম্পর্কেও জনগণের মধ্যে ঐকমত্য বিদ্যমান। তবে এরূপ সংস্কৃতিতেও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার চেয়ে কর্তৃত্ববাদী শাসন ব্যবস্থাই অধিকতর উপযোগী।

অংশগ্রাহক রাজনৈতিক সংস্কৃতি (Participant political culture)

অংশগ্রাহক রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে জনগণ রাজনৈতিক ব্যবস্থা, এর বিভিন্ন কাঠামো ও এর কার্যাবলী, দাবি দাওয়া ও উপপাদ প্রভৃতি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা পোষণ করে। সেগুলো ব্যক্ত করে জনগণ রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহন করে এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে মূল্যায়ন করে। ক্ষমতা পরিবর্তনের পদ্ধতি সম্পর্কে জনগণের মধ্যে ঐকমত্য বিদ্যমান অর্থাৎ নির্বাচনকে তারা ক্ষমতা পরিবর্তনের একমাত্র বৈধ পদ্ধতি বলে মনে করে। এরূপ রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাই সবাধিক উপযোগী এবং অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থা টিকতে পারে না। প্রতিটি সমাজের রাজনৈতিক সংস্কৃতিই মূলতঃ মিশ্র প্রকৃতির।

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যেক সমাজেই উক্ত তিন ধরনের সংস্কৃতির উপাদান কমবেশী বিদ্যমান এবং প্রত্যেক সমাজের সংস্কৃতিই গতানুগতিকতা থেকে আধুনিকতার দিকে পরিবর্তিত হয়।

রাজনৈতিক সংস্কৃতির উপরিউক্ত শ্রেণীগুলো ছাড়াও পৌর সংস্কৃতি (Civic Culture), এলিট সংস্কৃতি (Elite Culture), গণ সংস্কৃতি (Mass Culture), উপ সংস্কৃতি (Sub Culture), ভূমিকা সংস্কৃতি (Role Culture), নিষ্ঠাবান সংস্কৃতি (Allegiant Culture) ও মিশ্র সংস্কৃতি (Mixed culture) সমূহ রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে।

পৌর সংস্কৃতি (Civic culture)

রাজনৈতিক সংস্কৃতি অধ্যয়নে পৌর সংস্কৃতির ধারণা এক বিশেষ স্থান দখল করে আছে। এটা এক ধরণের মিশ্র সংস্কৃতি যার মধ্যে সংকীর্ণ, প্রজাসূলভ ও অংশগ্রহণমূলক সংস্কৃতির ভারসাম্যপূর্ণ সমন্বয় সাধিত হয়েছে। এতে অংশগ্রহণমূলক সংস্কৃতির উপাদান বিদ্যমান যার ফলে নাগরিকগণ রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী হয়। কিন্তু অধিকতর অংশগ্রহণের দাবী বা চাপে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বিনষ্ট হয় এবং এলিটদের কার্য সম্পাদন ব্যাহত হয়। এ জন্য প্রয়োজন জনগণের মধ্যে রাজনীতি বিমুখী প্রবণতা। আর পৌর সংস্কৃতিতে সংকীর্ণ ও প্রজাসুলভ সংস্কৃতির উপাদান থাকায় অধিকহারে অংশগ্রহণকে সীমিত করে রাজনীতিতে স্থিতিশীলতা আনে। পৌর সংস্কৃতিসম্পন্ন নাগরিকগণ রাজনীতিতে যৌক্তিক আচরণ করে এবং আবেগের পরিবর্তে যুক্তি দ্বারা পরিচালিত হয়। এ জন্য এটাকে যৌক্তিকতা-সক্রিয় অংশগ্রাহক মডেল বলেও অভিহিত করা হয়। জনগণ রাজনীতি সম্পর্কে জ্ঞাত এবং নিজেদের স্বার্থ ও নীতি অনুসারে সচেতনভাবে সিদ্ধান্ত নেয়। কাজেই এটা এমন এক ধরণের সংস্কৃতি যাতে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ, সক্রিয়তা ও যৌক্তিকতার সাথে উদাসীনতা, গতানুগতিকতা ও সংকীর্ণ মূল্যবোধের প্রতি আকর্ষণের এক ধরণের ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। অ্যালমন্ড ও ভারবা বলেছেন যে, এটা আধুনিক সংস্কৃতি নয় বরং একটি মিশ্র আধুনিকতামুখী গতানুগতিক সংস্কৃতি। এতে বৈজ্ঞানিক ও মানবতাবাদী-গতানুগতিক সংস্কৃতির উপাদান বিদ্যমান। একটি স্থিতিশীল গণতন্ত্রের জন্য এরূপ সংস্কৃতি খুবই সহায়ক।

এলিট সংস্কৃতি (Elite Culture)

প্রতিটি সমাজের এলিটরাই অধিকতর শিক্ষিত ও রাজনীতি সচেতন। তারা জনগণের চেয়ে উন্নত ধরণের রাজনৈতিক সংস্কৃতির অধিকারী। এলিটদের এরূপ সংস্কৃতিকে এলিট সংস্কৃতি বলা হয়। বিশেষকরে, উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এলিটরা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এবং সাধারণ জনগণ অধিকাংশই অশিক্ষিত। এক্ষেত্রে এলিটরা সুস্পষ্টভাবেই জনগণ থেকে পার্থক্যসূচক উন্নত রাজনৈতিক সংস্কৃতি ধারণ করে। এলিটরাই যেহেতু সমাজে নেতৃত্ব দানকারী গোষ্ঠী, কাজেই তাদের সংস্কৃতি অধ্যয়ন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

Dhaka University Institutional Repository

গণ সংস্কৃতি (Mass Culture)

গণ সংস্কৃতির বিষয়টি এলিট সংস্কৃতির সাপেক্ষে বিবেচ্য। সমাজের অধিকাংশ মানুষই সক্রিয়ভাবে রাজনীতির সাথে জড়িত নয় এবং রাজনীতি সম্পর্কে সচেতন নয়। এই সংখ্যাধিক্য জনগণ বিশেষ ধরণের রাজনৈতিক সংস্কৃতি ধারণ করে যা এলিটদের সংস্কৃতি থেকে পৃথক। এ ধরণের সংস্কৃতিকেই গণ সংস্কৃতি বলা হয়। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে অধিকাংশ জনগণই অশিক্ষিত এবং তারা রাজনীতি সচেতন নয়। এই জনগোষ্ঠী নিম্নমানের রাজনৈতিক সংস্কৃতি ধারণ করে যা এলিটদের সংস্কৃতি থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক। গণ সংস্কৃতি অধ্যয়ন করা এজন্যই গুরুত্বপূর্ণ যে এটা সংখ্যাধিক্য জনগণের সংস্কৃতি। আর সংখ্যাধিক্য জনগণের সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করেই একটি সমাজের রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে এবং টিকে থাকে।

উপ-সংস্কৃতি (Sub Culture)

প্রতিটি রাজনৈতিক সংস্কৃতিই মিশ্র প্রকৃতির। একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সংস্কৃতির সাধারণ বৈশিষ্ট্যের চেয়ে অনেক সময় ভিন্নতর বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন সংস্কৃতি পরিলক্ষিত হয়। যখন কোনো বিশেষ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী রাজনৈতিক ব্যবস্থার অন্যান্য সংস্কৃতি থেকে পৃথক প্রকৃতির হয় তখন তাকে উপ-সংস্কৃতি বলা হয়।[১২] যেমন, কোনো সমাজে ক্ষুদ্র উপজাতির সংস্কৃতি সাধারণত উপ-সংস্কৃতির পর্যায়ভুক্ত। অধিক সংখ্যক উপ-সংস্কৃতির উপস্থিতির অর্থই হচ্ছে সাংস্কৃতিক সমরূপতার (cultural homogeneity) অভাব যা একটি স্থিতিশীল ব্যবস্থা গড়ে তোলার অন্তরায় হিসেবে কাজ করে।

ভূমিকা সংস্কৃতি (Role culture)

জটিল রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিশেষীকৃত কাঠামোসমূহ, যেমন: আমলা, সামরিক বাহিনী, প্রশাসক, রাজনৈতিক নেতা ইত্যাদি বিশেষ ভূমিকা পালন করে হয়। এদের দ্বারাও রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে উপ-সংস্কৃতির সৃস্টি হয়। এটা হয় সাধারণত দুভাবে[১৩] (১) যারা এরূপ ভূমিকা পালন করে তাদেরকে বিশেষ উপ-সংস্কৃতি থেকে নিয়োগ করা হয়; (২) এরূপ ভূমিকা পালনের জন্য বিশেষ ধরনের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এদের মধ্যে পৃথক ধরনের রাজনৈতিক সংস্কৃতির জন্ম দেয়। সমাজে বিশেষ ভূমিকা পালনকারী এসব ব্যক্তিবর্গের রাজনৈতিক সংস্কৃতিকেই ভূমিকা সংস্কৃতি বলা হয়।

নিষ্ঠাবান সংস্কৃতি (Allegiant culture)

যে রাজনৈতিক সংস্কৃতি রাজনৈতিক কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তাকে নিষ্ঠাবান সংস্কৃতি বলা হয়। বিশেষ ধরনের রাজনৈতিক সংস্কৃতির সাথে বিশেষ ধরনের রাজনৈতিক কাঠামো অধিকতর উপযোগী ও সংগতিপূর্ণ হয়। যেমন: সংকীর্ণ সংস্কৃতির সাথে কর্তৃত্ববাদী কাঠামো এবং অংশগ্রহণমূলক সংস্কৃতির সাথে গণতান্ত্রিক

Dhaka University Institutional Repository

কাঠামো সামঞ্জস্যপূর্ণ। রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও কাঠামো এরূপ সামঞ্জস্যপূর্ণ হলে তাকে নিষ্ঠাবান সংস্কৃতি বলা হয়।

মিশ্র সংস্কৃতি (Mixed culture)

প্রত্যেক রাজনৈতিক ব্যবস্থাতেই এক ধরনের সংস্কৃতি বিদ্যমান নয় বরং এতে বিভিন্ন ধরনের সংস্কৃতি মিশ্রিত অবস্থায় থাকে। কারণ সব ব্যবস্থাতেই সংকীর্ণ, অধীন ও অংশগ্রহণমূলক সংস্কৃতির উপাদান বিদ্যমান। সংস্কৃতির এরূপ বিভিন্ন ধরনের মিশ্রিত রূপকেই মিশ্র সংস্কৃতি বলে।

২.৫ তৃতীয় বিশ্বের রাজনৈতিক সংস্কৃতির স্বরূপ

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত একটি দেশ। তাই বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি আলোচনার পূর্বে তৃতীয় বিশ্বের রাজনৈতিক সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যের প্রতি একটু দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলো আয়তনে যেমনই হোক না কেন এর লোকসংখ্যা বহু এবং এ সকল দেশসমূহ নানা সমস্যায় জর্জরিত। আর এ সকল সমস্যা সেসব দেশের রাজনীতিতে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। ফলে দেখা যায় যে, তৃতীয় বিশ্বের রাজনৈতিক সংস্কৃতি উন্নত বিশ্বের রাজনৈতিক সংস্কৃতির মত সুসংহত নয়, যার কারণে তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি বা কৃষ্টি অসমভাবে গড়ে উঠেছে। তৃতীয় বিশ্বের রাজনৈতিক সংস্কৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানে রাজনৈতিক কার্যকলাপ, সামাজিক ও ব্যক্তিগত কার্যকলাপ হতে পৃথক নয়। এর অর্থ হলো, এখানে রাজনৈতিক কার্যকলাপ সামাজিক ও ব্যক্তিগত সম্পর্কের বেড়াজালকে ছিন্ন করে বিশুদ্ধ রাজনৈতিক পটভূমিতে গড়ে উঠতে পারেনি। তৃতীয় বিশ্বের রাজনৈতিক সংস্কৃতির আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল এখানকার রাজনৈতিক দল, সংঘ ও সদস্যগণের মধ্যে অতি মাত্রায় অভ্যন্তরীণ কোন্দল বিদ্যমান। তাছাড়া অধিকাংশ রাজনৈতিক দলগুলো অধিকাংশ সময়ই আন্তর্জাতিক ও সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে। ফলে উভয় ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বা আদর্শগত রাজনৈতিক কোন্দল এ সকল দেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে বাঁধা হয়ে দাড়ায়। এ সকল রাজনৈতিক ব্যবস্থায় দলীয় ও ব্যক্তিগত কোন্দলই যাবতীয় রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের মূল চাবিকাঠি হিসেবে বিবেচিত হয়।

এই সংস্কৃতিতে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের প্রতি জনগণের অত্যধিক আনুগত্য পরিলক্ষিত হয়। এখানে দেখা যায় যে, জনগণ একটি রাজনৈতিক আদর্শ বা নীতির প্রতি যতখানি অনুগত বা শ্রদ্ধাশীল তদাপেক্ষা অধিক অনুগত কোন কোন রাজনৈতিক দল বা এর নেতার প্রতি। জনগণ ঐ দলের নীতি বা আদর্শ অপেক্ষা এর নেতৃবৃন্দের প্রতি নিজেদের একাত্মতা প্রকাশ করেই অধিক স্বস্তিবোধ করে।

এ সকল রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিরোধী দল ও ক্ষমতাসীন এলিট গোষ্ঠী বৈপ্লবিক ভূমিকা পালন করে থাকে। ক্ষমতাসীন শাসক গোষ্ঠী রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনয়নের চেষ্টা করে। রাজনৈতিক ব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তন আনয়নই যেন তাদের মূল লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়। বিরোধী দল ও এলিট গোষ্ঠী সরকার কর্তৃক লব্ধ যে কোন পরিবর্তন বা উন্নয়নকে অনর্থক সমালোচনা করে বাধা প্রদান করতে চায়, যার ফলে এই জাতীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থায় দায়িত্বশীল সরকার ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে না।

Dhaka University Institutional Repository

এ জাতীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সুসংহত ও যথাযথ যোগাযোগের অভাবে রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশ গ্রহণ কারী সদস্যগণের মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোন রূপ একাত্মতা পরিলক্ষিত হয় না। এখানে সর্বজন স্বীকৃত কোন রাজনৈতিক প্রণালী নেই। গ্রামীন রাজনীতিবিদরা শহুরে রাজনীতির প্রতি একেবারেই উদাসীন ও সম্পর্কহীন। ফলে গ্রামীন ও শহুরে রাজনীতির ধারাও ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রবাহিত হয়।

তৃতীয় বিশ্বের রাজনৈতিক কর্মকান্ডের বৈধ উদ্দেশ্য ও উপায় সম্পর্কে জনগণের মধ্যে ঐকমত্যের অভাব দেখা যায়। এই সংস্কৃতিতে কিছু লোক পাশ্চাত্য সভ্যতা ও চেতনায় উদ্বুদ্ধ থাকে যা মূলত শহরাঞ্চলে পরিলক্ষিত হয়। অন্যদিকে গ্রামীন জনগণ পাশ্চাত্য চেতনা ও সভ্যতার প্রতি একেবারেই উদাসীন থাকে। তারা তাদের নিজস্ব চেতনা ও ভাবাদর্শে পরিপুষ্ট হয়। এছাড়াও অনেক সময় তৃতীয় বিশ্বের রাজনীতি ও রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে ক্যারিজমেটিক নেতৃত্বের প্রতি সমর্থন, রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপ, অধিক মাত্রায় দলীয় কোন্দল, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা এবং আসংবিধানিক উপায়ে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের প্রবণতা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যসমূহও বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।

২.৬ সংসদীয় গণতন্ত্র : একটি তাত্ত্বিক আলোচনা

সংসদীয় গণতন্ত্র প্রত্যয়টিকে তাত্ত্বিক বিশ্লেষনের জন্য প্রথমেই সংসদ ও গণতন্ত্র শব্দ দুটির আলাদা আলাদা ব্যাখ্যার প্রয়োজন রয়েছে। সংসদ এর ইংরেজী প্রতিশব্দ পার্লামেন্ট (Parliament) বুৎপত্তিগতভাবে ফরাসী শব্দ "পার্লার" (parler) এবং ল্যাটিন শব্দ parliamentum থেকে উদ্ভূত। কালের বিবর্তনে শব্দটি বিভিন্ন জনের মাধ্যমে বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হতে থাকে। মধ্যযুগে পার্লামেন্ট বলতে রাজার পরিষদ বর্গের সম্মেলনকে বোঝানো হতো যেখানে একদল বিচারক জনগনের বিভিন্ন প্রকার আবেদন, নিবেদন, দাবি-দাওয়া বা বাছাইয়ের পর সেগুলির ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য রাজার সমীপে পেশ করতেন।[১৪] কারো মতে, parliament বলতে মূলত আলোচনা, বিতর্ক ও সম্মিলনকে বুঝানো হতো।[১৫] পার্লামেন্ট শব্দটি আবার Colloquium কিংবা ধর্ম যাজকদের সমাবেশকেও বোঝাতো।[১৬] যাই হোক পারিভাষিকভাবে শব্দটি যে রাজনৈতিক ধারনা ব্যক্ত করার জন্যে ব্যবহৃত হতো তাতে পার্লামেন্ট বলতেই বোঝাতো কিছু ব্যক্তিবর্গের সমাবেশ যারা কোন কিছু নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনার উদ্দেশ্যেই সমবেত হতেন।[১৭]

সংসদীয় শাসন ব্যবস্থার ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রথম দিকে পার্লামেন্ট রাজার পরামর্শক হিসাবে কাজ করতো। পরবর্তীতে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পার্লামেন্ট ধীরে ধীরে নানা স্তর ও পর্যায় অতিক্রম করে বর্তমান রূপ লাভ করেছে। পঞ্চম শতকে এ্যংলো স্যাক্সন যুগে 'উইটেনা গিমট' (Witanagemot) বা উইটেন (Wintan)কে বৃটিশ পার্লামেন্টের পূর্ববর্তী প্রতিষ্ঠান বলে গণ্য করা হতো।

---

[১৪] Norman Wilding and Philip Laundy, 1968, An Encyclopaedia of Parliament, London: Cassel, P. 509.

[১৫] চৌধুরী শরীফ আহমদ, বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র (১৯৯১-২০০৬): জাতীয় সংসদের কার্যকারিতা (অপ্রকাশিত এম ফিল অভিসন্দর্ভ) সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, এপ্রিল ২০০৭, পৃ. ৯।

[১৬] Encyclopaedia Britannica, Vol.-17, pp : 376 -377.

[১৭] রহমান, মাহবুবুর, ১৯৯২, "বাংলাদেশে সংসদীয় গনতন্ত্রের পুন:প্রচলন : প্রাসঙ্গিক কিছু বিষয়" বাংলাদেশ সরকার ও রাজনীতি, (সম্পাদনায় গোলাম হোসেন) একডেমিক পাবলিশার্স, ঢাকা, পৃ. ২৭৪.

Dhaka University Institutional Repository

উইটেন গঠিত হতো জ্ঞানী, প্রভাবশালী এবং বিশপদের নিয়ে। এটি ছিল ছোট ধরনের একটি পরিষদ যার মাধ্যমে ইংল্যান্ডের প্রাচীন রাজারা নির্বাচিত হতেন। আইন প্রণয়ন, সরকার পরিচালনা এবং বিচার সংক্রান্ত কাজে উইটেন ভূমিকা রাখতো। তবে রাজা প্রভাবশালী ও ক্ষমতাধর হলে, উইটেন তাঁর ইচ্ছামতো গঠিত ও পরিচালিত হতো।[১৮] একাদশ শতকে নর্মান বিজয়ের পর ম্যাগনাম কনসিলিয়াম (Magnum Concillium) বা মহাপরিষদ এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংস্থা 'কুরিয়া রেজিস' (Curia Regis) বা রজার কোট নামে উইটেন দুটি পৃথক সংস্থায় পরিণত হয়। বৃটিশ নোবেলদের চাপে রাজা ১২১৫ সালে ম্যাগনাকার্টা (Magnacarta) চুক্তিতে সম্মতি দানে বাধ্য হন। এ চুক্তি অনুযায়ী রাজা ম্যাগনাম কনসিলিয়ামের সম্মতি ছাড়া কতকগুলো বিশেষ কর আদায় না করার প্রতিশ্রুতি দেন।

পার্লামেন্টের ইতিহাস থেকে যতদুর জানা যায় তাতে দেখা যায় যে, আধুনিক পার্লামেন্টের সূচনা হয় ১২১৩ খ্রিস্টাব্দে। তবে তখন রাজা 'জন' প্রত্যেক কাউন্টি থেকে চারজন করে নাইট আহবান করে পরামর্শ গ্রহণ করতেন। পরবর্তীতে সাইমন ডি মন্টফোর্ট ১২৬৫ সালে নাইটদের নিয়ে এক পার্লামেন্ট আহ্বান করেন যার মাধ্যমে পার্লামেন্ট বর্তমান রূপ লাভ করে। সাইমন ডি এর নীতি অনুসরণ করে ১২৯৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজা এডওয়ার্ড আদর্শ পার্লামেন্ট (Model Parliament) স্থাপন করেন। চতুর্দশ শতকের শেষভাগে পার্লামেন্ট দুটি পরিষদে বিভক্ত হয়। লর্ডরা একটি কক্ষে এবং নাইট ও বার্জেসরা অপর একটি কক্ষে বিতর্কে লিপ্ত হতেন। এভাবে হাউস অব কমন্স (House of Commons) বা কমন্স সভার উদ্ভব ঘটে এবং এ সময় থেকে পার্লামেন্ট আইন প্রণয়নের ক্ষমতা লাভ করে।[১৯]

১৬২৮ সালে পার্লামেন্টে অধিকারের আবেদন (Petition of Rights) রচিত হয়। কর প্রদানের ব্যাপারে শহর ও গ্রামাঞ্চলগুলিকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করানোর এবং অভাব-অভিযোগ পেশ করার ক্ষমতা এদের প্রতিনিধিগণকে প্রদান করার ফলে হাউস অব কমন্স হাউস অব লর্ডসের উপর আর্থিক বিষয়ে প্রাধান্য অর্জন করতে শুরু করে। ষোড়শ শতাব্দীতে হাউস অব কমন্সকে (House of Commons) হাউস অব লর্ডস (House of Lords) থেকে সরকারিভাবে পৃথক করা হয়।[২০]

১৬৪০ এর দশকে পিউরিটান বিপ্লবের মধ্যদিয়ে ইংল্যান্ডের রাজতন্ত্র ও হাউস অব লর্ডসের বিলুপ্তি ঘটে এবং ১৬৪৯ সালে একটি "প্রজাতান্ত্রিক কমনওয়েলথ" প্রতিষ্ঠিত হয়। এটা ১৬৫৩-৬০ সাল পর্যন্ত 'ইনষ্ট্রুমেন্ট অব গভর্নমেন্ট' নামে অভিহিত একটি লিখিত সংবিধান অনুসারে শাসিত হয়। ওলিভার ক্রমওয়েল (Oliver Crom Well) 'রক্ষক' (Protector) হিসেবে নতুন সরকারের নেতৃত্ব দেন। এক কক্ষ বিশিষ্ট পার্লামেন্ট ভিত্তিক এর সরকার সত্যিকার অর্থে গণতান্ত্রিক ছিল না রবং অত্যন্ত রক্ষণশীল ছিল যা বড় বড় ভূ-স্বামী কর্তৃক নির্বাচিত হত। কিন্তু ১৬৫৮ সালে ক্রমওয়েলের মৃত্যুর পর ইংল্যান্ডে পুনরায় রাজতন্ত্র ও দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট পার্লামেন্টের উদ্ভব ঘটে।[২১] পরবর্তীতে ১৬৮৮ সালে গৌরবময় বিপ্লবের (Glorious Revolution) পর

---

[১৮] Parliament, 1991, Hmso Books, London , সংগৃহীত ফিরোজ, জালাল, পার্লামেন্টারী শব্দকোষ, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ২১৬।

[১৯] চৌধুরী শরীফ আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০।

[২০] নাথ, বিপুল রঞ্জন, বৈদেশিক শাসন-ব্যবস্থা, বুক সোসাইটি, বাংলাবাজার, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ: সেপ্টেম্বর ১৯৮৯, পৃ. ৩।

[২১] প্রাগুক্ত, পৃ : ৩।

Dhaka University Institutional Repository

পার্লামেন্ট সত্যিকার অর্থে ক্ষমতার অধিকারী হয়ে উঠে। এবং পার্লামেন্ট ১৬৮৯ সালে "বিল অব রাইটস" বিধিবদ্ধ করে সেখানে সীমিত ও নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রবর্তন করে যা অদ্যাবধি বিদ্যমান। ১৭০১ সালে রাজা পার্লামেন্টের শক্তিকে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হন।[২২]

পার্লামেন্টারী বা সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা সম্পর্কিত উপরিউক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনা হতে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে বর্তমানের সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক বিবর্তন ও অভিজ্ঞতার ফল। এখানে দেখা যে পার্লামেন্ট এক সময় রাজার অনুগত পরামর্শক কাউন্সিল হিসেবে কাজ করেছে সেই পার্লামেন্ট পরবর্তীতে নিজেকে পুরো কর্তৃত্বশীল একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে। অর্থাৎ মধ্যযুগে পার্লামেন্ট রাজাকে যেখানে পরামর্শদান ও বিশেষত অর্থনৈতিক বিষয়ে সহযোগিতা প্রদানের দায়িত্ব পালন করতো। পরবর্তীকালে এটি ভূ-স্বামীদের বানিজ্যিক পুঁজিপতি শ্রেণীর এবং সর্বশেষে জনগণের প্রতিনিধিবর্গের সরকারী যন্ত্রের উপর কর্তৃত্ব প্রয়োগের প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং সুদীর্ঘ তিন-চার শতাব্দী ব্যাপী এ বিবর্তন ও বিকাশের ধারা অব্যাহত থাকে।[২৩]

গণতন্ত্র

রাষ্টচিন্তার ইতিহাস বিশ্লেষণের মাধ্যমে জানা যায় যে, গ্রীক রাষ্ট্রচিন্তার মাধ্যমেই গণতন্ত্রের উন্মেষ ঘটেছে। গ্রীক চিন্তাবিদরাই সর্ব প্রথম গণতন্ত্র শব্দটিকে ব্যবহার এবং সমৃদ্ধ করেছেন। ইংরেজী Democracy শব্দের বাংলা পরিভাষা হলো গণতন্ত্র যা আধুনিক সরকার ব্যবস্থার বিভিন্ন রূপের অন্যতম একটি রূপ। রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে 'গণতন্ত্র' শব্দটি একটি যুগান্তকারী আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। মানব সমাজের বিকাশ যত দ্রুততার সাথে ঘটেছে গণতান্ত্রিক আদর্শের বিকাশেও তত অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ইংরেজী Democracy শব্দটি গ্রীক শব্দ (*ডিমস্*) এবং *Kratos (ক্রেটোস)* শব্দ দুটির সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে। *Demos* শব্দের অর্থ জনগণ এবং *Kratos* শব্দের অর্থ হল শাসন বা কর্তৃত্ব। সুতরাং Democracy বা গণতন্ত্র বলতে জনগণের শাসন বা জনগণের কর্তৃত্বকে বোঝায়। প্রাচীন গ্রীসই হল গণতান্ত্রিক চিন্তাধারার সুতিকাগার। গণতন্ত্র শব্দটি সর্ব প্রথম ব্যবহার করেন প্রাচীন গ্রীসের ঐতিহাসিক থুসিডাইডিস তাঁর বিখ্যাত 'পেলোপোনেসীয় যুদ্ধের ইতিহাস গ্রন্থে।[২৪] তাঁর মতে পেরিক্লিস গণতন্ত্রের নামে এমন এক শাসন ব্যবস্থার কল্পনা করেছিলেন যেখানে আইনের ক্ষেত্রে সকলেই সম মর্যাদা ভোগ করবে। প্রাচীন গ্রীসের রাজনৈতিক চিন্তাবিদ এবং মনীষীগণ কিন্তু পেরিক্লিসের গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি ঐকান্তিক সমর্থন জ্ঞাপন করেননি। প্লেটো গণতন্ত্র সম্বন্ধে অত্যন্ত বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। রাষ্ট্র বিজ্ঞানের জনক এ্যারিস্টটল গণতন্ত্রকে বিকৃত শাসন রূপে গণ্য করেছেন।[২৫] প্রাচীন গ্রীসের ন্যায় প্রাচীন ভারত বর্ষেও গণতন্ত্রের ধারণার অস্তিত্ব দেখা যায়। বৈদিক যুগে এবং পৌরানিক যুগে সভা, সমিতি ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক সংস্থা বিদ্যমান ছিল। এমনকি প্রাচীন ভারতে গ্রামীন সমাজে পঞ্চায়েত

---

[২২] শহিদুল্লাহ মোহাম্মদ, ২০০১,"বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ : কাঠামো ও কর্মকান্ড" (এম.ফিল অভিসন্দর্ভ)সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়, মার্চ, পৃঃ ২।

[২৩] David.L.Sills, 1968, ed. International Encyclopedia of Social science. Vol.11 & 12, London, Macmillan company and the free press p : 820.

[২৪] ঘোষ, নিমলকান্তি আধুনিক রাষ্ট্রতত্ত্ব।

[২৫] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবস্থার প্রচলন দেখা যায়।[২৬] প্রাচীন গ্রীসের নগর রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে এথেন্সই ছিল গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান এবং চিন্তার প্রধান কেন্দ্র। এথেন্সের রাজনীতিবিদ সোলোন গণতান্ত্রিক নীতির বিকাশে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি রাষ্ট্রপরিচালনায় আইনের গুরুত্ব, জনগণের স্বাধীনতা, মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার উপর গুরুত্ব দেন। স্টোইক দার্শনিকগণ রোমে গণতান্ত্রিক চিন্তাধারার প্রসার ঘটান। তারা মানুষের দায়িত্ববোধ, স্বাধীনতার চেতনা এবং আইনের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের প্রবণতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ইউরোপে মধ্যযুগে অধিকার রক্ষার আন্দোলনের মধ্যদিয়ে গণতন্ত্রের বিকাশ ঘটেছে। মহাসনদ, গৌরবময় বিপ্লব, অধিকার সংক্রান্ত বিল এবং রাজতন্ত্রের ক্ষমতার হ্রাস ইত্যাদির মাধ্যমে গণতন্ত্রের পথ প্রশস্ত হয়েছে। এই আন্দোলনে জন লকের চিন্তাধারার প্রভাব ছিল অত্যন্ত সুস্পষ্ট। গণতন্ত্রের বিকাশে অষ্টাদশ শতাব্দির শেষভাগ ছিল এক তাৎপর্যপূর্ণ কাল।

ফরাসী বিপ্লবের মাধ্যমে সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে নবোদ্ভুত বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রাধান্য বিস্তারের সুযোগ লাভ হয়। এবং এরই মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা, সাম্য এবং ভ্রাতৃত্ব এর আদর্শ ধ্বনিত হয়। এ সময় সামন্ততন্ত্রের পরাজয় এবং পুঁজিবাদের প্রতিষ্ঠা গণতন্ত্রের বিকাশের ক্ষেত্রে অনাগত পরিবর্তন সাধন করেছে। টমাস জেফারসন, ম্যাডিসন, আব্রাহাম লিংকন, বেন্থাম, জেম্‌স মিল, জনস্টুয়ার্ট মিল, হারবার্ট স্পেনসার, জন স্মিথ, টি এইচ গ্রীন, আর্নেস্ট বার্কার, হ্যারল্ড লাস্কি প্রমুখদের চিন্তা এবং ধ্যান ধারনার সম্পদে গনতন্ত্রের একটি নতুন রূপ বিকশিত হলো। যাকে উদার নৈতিক গণতন্ত্র (Liberal Democracy) বলা হয়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে গণতন্ত্রের এই ধারা বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত অপ্রতিহত প্রাধান্য বিস্তার করেছিল।[২৭] আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম, The Bill of Rights (১৭৭৬) এবং ফরাসি বিপ্লব The rights of man (১৭৮৯) আধুনিক গণতান্ত্রিক ধারনার বিকাশে সাহায্য করেছে।[২৮]

Prof Gettell এর মতে "গণতন্ত্র এমন এক সরকার ব্যবস্থা যেখানে সকল জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে অংশীদারিত্ব রয়েছে।"[২৯] (Democracy is that form of government in which the mass of the population possesses the right to share in the exercise of sovereign power). অধ্যাপক শেলীর মতে, "গণতন্ত্র হচ্ছে এমন ধরনের সরকার যেখানে সকলের অংশ গ্রহণের সুযোগ রয়েছে।"[৩০] (Democracy is a government in which everyone has a share)। Loard Bryce'র মতে "গণতন্ত্র হচ্ছে এরূপ সরকার যেখানে যোগ্য নাগরিকের সংখ্যাগরিষ্টের ইচ্ছানুসারে শাসন পরিচালিত হয়।"[৩১] (a government in which the will of the majority of qualified citizens rules). Prof. R.M. MacIver এর মতে,"গণতন্ত্র সংখ্যাগরিষ্ট বা অন্য কারো শাসন পরিচালনার পদ্ধতিকে বোঝায় না বরং কে বা কারা শাসন করবে এবং মোটামুটিভাবে কোন উদ্দেশ্যে শাসন করবে তা নির্ধারণ করার

---

[২৬] মহাপাত্র, অনাদি কুমার, ১৯৯৬,আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান, কলিকাতা, রয়্যাল হাফটন, পৃ. ৫২১।

[২৭] ঘোষ, নির্মল কান্তি, প্রাগুক্ত পৃ. ৯১৩।

[২৮] চৌধুরী, শরিফ আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬।

[২৯] Gettell, Raymond Garfield, 1967, Political Science, University Book Depot, Dacca, P: 199.

[৩০] আহমদ, এমাজ উদ্দিন, ১৯৯৮,রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ঢাকা বুক সোসাইটি, পৃ. ১৩২।

[৩১] Bryce, Lord, Modern Democracy, Vol. 1, P. 22.

Dhaka University Institutional Repository

উপায় স্বরূপ।"[৩২] আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন এর মতে "Democracy is a government of the people,by the people and for the people"[৩৩] (গণতন্ত্র হলো জনগণের, জনগণের দ্বারা এবং জনগণের জন্য সরকার)। A Appadorai এর মতে, "Democracy may be described as a system of government under which the people exercise the government power either directly or through representatives periodically elected by themselves".[৩৪] (গণতন্ত্র হলো সেই ধরণের সরকার ব্যবস্থা যার মাধ্যমে জনগণ সরাসরি কিংবা তাদের দ্বারা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে সরকারি কাজে অংশ গ্রহণ করতে পারে)

জাতিসংঘের Millennium Declaration on democracy (2000) তে বলা হয়েছে, গণতন্ত্র হচ্ছে সার্বজনীন আদর্শ যা অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক বিভিন্নতার উর্দ্ধে সাধারণ মানুষের বিশ্বাস ও মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। আদর্শগতভাবে ইহা ব্যক্তির মৌলিক অধিকার ও মর্যাদা অর্জনে সহায়তা করে, সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করে এবং আর্থ-সামাজিক অগ্রগতিতে ভূমিকা রাখে। এটা এমন এক রাজনৈতিক ব্যবস্থা যেখানে জনসাধারণ একটি কার্যকর, আন্তরিক, সৎ, স্বচ্ছ ও জবাবদিহি মুলক সরকার গঠনে অবাধ ভূমিকা রাখে। এক্ষেত্রে জাতিসংঘ উল্লেখ করেছে যে, দুটি মৌলিক নীতির উপর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত, অংশ গ্রহণ ও জবাবদিহিতা। প্রত্যেক ব্যক্তিরই অধিকার আছে সরকারী কার্যক্রম ব্যবস্থাপনায় অংশ গ্রহণ করার। একইভাবে প্রত্যেকেরই সরকারী কার্যক্রম সম্বন্ধে জানার অধিকার আছে, অধিকার আছে অন্যায় প্রশাসনিক ও আইনগত ব্যবস্থার প্রতিবিধান চাওয়ার।[৩৫]

আমাদের গণতন্ত্র হলো এমন এক সরকার ব্যবস্থা যেখানে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নারী, পুরুষ, ধনী, গরীব, নির্বিশেষে সকল নাগরিকের রাজনৈতিক কার্যাবলী সম্পাদনে ও যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সম সুযোগ লাভের অধিকার রয়েছে। গণতন্ত্র এমন শাসন পদ্ধতি যেখানে ব্যক্তিগত শাসন কায়েমের কোন সুযোগ নেই। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার ভিত্তি মূলত মৌলিকভাবে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার উপর গড়ে উঠেছে। এই আইনের শাসন হতে হবে অবশ্যই সর্বজন স্বীকৃত। ১৬৬৫ সালে জেমস হ্যারিংটন তাঁর লেখা ওসিয়ানা (Oceana) গ্রন্থে গণতন্ত্র সম্পর্কে বলেছেন, মানুষের শাসন করার অধিকার অন্য কোন মানুষের উপর ন্যস্ত হতে পারে না। সৃস্টিকর্তা এ ক্ষমতা কোন মানুষের উপর অর্পণ করেননি। শাসন ব্যবস্থা পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে আইনের উপর। এ আইনের ভিত্তি একদিকে যেমন প্রাকৃতিক আইন, অন্যদিকে তেমন ঐকমত্যের ভিত্তিতে জনগণকর্তৃক সর্বজন স্বীকৃত বিধি বিধান।[৩৬]

জনগণের অংশ গ্রহণের ভিত্তিতে গণতন্ত্রকে ২ ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে, প্রথমত: প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র (Direct Democracy) ও দ্বিতীয়ত: পরোক্ষ গণতন্ত্র (Indirect Democracy)। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ নীতির

---

[৩২] MocIver, R.M, 1965,The web of government, new York, the free press P.10

[৩৩] Agarwal, R.C, 1976, Political Theory, S. Chand & Company LTD, New Delhi, p : 264.

[৩৪] Appadorai.A, 1975,The substance of Politics, Oxford University press, P. 137

[৩৫] চৌধুরী শরীফ আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ : ৭।

[৩৬] আহমদ, এমাজউদ্দিন, ২০০৯, 'গণতন্ত্রের স্বপ্ন' বাংলাদেশ রাজনীতির চার দশক, (তারেক শামসুর রহমান কর্তৃক সম্পাদিত) প্রথম খন্ড, শোভা প্রকাশ, ঢাকা, পৃ: ৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

ভিত্তিতে পরোক্ষ গণতন্ত্র আবার ২ পদ্ধতির হয়ে থাকে এক.এককেন্দ্রীক সরকার ও দুই. যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার। Sir John A.R. Marrist, Dr. Stephen Leacock, Bluntschli প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী আইন ও শাসন বিভাগের সম্পর্কের ভিত্তিতে এককেন্দ্রীক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার পদ্ধতিকে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত ও রাষ্ট্রপতি শাসিত এ দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন।[৩৭]

আধুনিক তাত্ত্বিক Alan R. Ball রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে তিনভাগে বিভক্ত করেছেন। উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা (Liberal Democratic System), সর্বাত্মক ব্যবস্থা (Totalitarian system) এবং স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা (Autocratic System)। Ball এর মতানুসারে উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এক কেন্দ্রীক কিংবা যুক্তরাষ্ট্রীয় হতে পারে এবং এই ব্যবস্থা মন্ত্রীপরিষদ শাসিত বা রাষ্ট্রপতি শাসিত হতে পারে। তবে সরকার ব্যবস্থা মন্ত্রীপরিষদ কিংবা রাষ্ট্রপতি শাসিত কিনা তা নির্ভর করবে আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের মধ্যকার সম্পর্কের উপর। যে শাসন ব্যবস্থা আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের মধ্যে পারস্পারিক সমঝোতা ও সুসম্পর্কের ভিত্তিতে পরিচালিত হয় তাকে মন্ত্রী পরিষদ শাসন বিভাগের মধ্যে পারস্পারিক সমঝোতা নয় বরং আইন বিভাগের উপর শাসন বিভাগের কর্তৃত্ব স্থাপনের মাধ্যমে পরিচালিত হয় তাকে রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন ব্যবস্থা বলা হয়।

শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের মধ্যে এক প্রকার ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির প্রয়োগের ভিত্তিতে সৃষ্টি হয় রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের। অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার বলতে এমন একটি সরকার ব্যবস্থাকে বোঝায় যেখানে শাসন বিভাগ আইন বিভাগের প্রভামুক্ত থেকে স্বাধীনভাবে সংবিধান অনুসারে কার্য পরিচালনা করতে পারে। সংসদীয় শাসন ব্যবস্থার মত এখানে শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের মধ্যে কোন ঘনিষ্ট যোগাযোগ অনুপস্থিত। এ শাসন ব্যবস্থায় শাসন বিভাগের শীর্ষে থাকেন একজন রাষ্ট্রপতি। প্রশাসনিক চরম কর্তৃত্ব রাষ্ট্রপতির হাতেই ন্যস্ত থাকে। তিনি হলেন একাধারে রাষ্ট্র প্রধান এবং শাসন বিভাগের প্রধান। রাষ্ট্রপতির পদ নির্বাচনমূলক। জনগণ কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তিনি নির্বাচিত হন। তিনি আইন সভার সদস্য নন। আইন সভার আস্থা-অনাস্থার উপর তার কার্যকাল নির্ভরশীল নয়। রাষ্ট্রপতি কার্যত জনগণের নিকটই দায়িত্বশীল। নির্দিষ্ট কার্যকাল অতিক্রান্ত হওয়ার আগে সংবিধানভঙ্গ দেশোদ্রোহিতা, দূর্নীতি প্রভৃতি অভিযোগ ছাড়া তাঁকে সহজে পদচ্যুত করা যায় না। J.N. Garner বলেন..... Presidential Government ..... is the system in which the executive (including both head of the state and his ministers) is constitutionally independent of the legislature in respect to the duration of his or their tenure and irresponsible to it for his or their political policies.[৩৮]

---

[৩৭] Leon, D Epstein, 1968, 'Parliamentary Government' in David L sills, ed. International Encyclopedia of Social science, London Macmillan and free press P. 419.

[৩৮] মহাপাত্র, অনাদিকুমার প্রাগুক্ত, পৃ: ৫৭৬।

Dhaka University Institutional Repository

২.৭ সংসদীয় গণতন্ত্র

সংসদীয় পদ্ধতি বলতে সরকারের একটি বিশেষ রূপ বা পদ্ধতিকে বোঝায় যেখানে শাসন কর্তৃপক্ষ বা নির্বাহী বিভাগ জনগণের নির্বাচিত আইন সভার ভেতর থেকে গঠিত হয় এবং নিজেদের কাজ কর্মের জন্য আইন সভার কাছেই দায়ি থাকে। এ কারণে সংসদীয় সরকারকে আবার দায়িত্বশীল সরকার নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। সংসদীয় সরকার আইনসভার কাছে আইনগত ও রাজনৈতিক দিক থেকে দায়িত্বশীল থাকে। প্রখ্যাত লেখক ডব্লিউ উইলোবী সংসদীয় সরকার পদ্ধতি সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন "..... The ultimate seat of government power is in the legislature or parliament and that the executive, instead of having power coordinate with that of the legislative branch, has a status, subordinate to the letter and is at all times responsible to it, both for his existence and the manner in which he discharges his functions"[৩৯] মন্ত্রীপরিষদ শাসিত বা সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় সরকারের সকল ক্ষমতা তত্ত্বগতভাবে একজন রাজা বা রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত থাকে। কিন্তু প্রকৃত শাসন ক্ষমতা তার হাতে থাকে না। তিনি জাতির প্রতীক, কিন্তু জাতিকে শাসন করেন না। তিনি শাসন বিভাগীয় প্রধান কর্মকর্তা কিন্তু বাস্তবে শাসন কার্য পরিচালনা করেন না। তবে তাঁর নামে শাসন কার্য পরিচালিত হয়। তাই তাকে নামসর্বস্ব শাসক প্রধান বলা হয় (Titular head or Nominal Executive). প্রকৃত শাসন ক্ষমতা মন্ত্রী পরিষদের উপর ন্যস্ত থাকে। মন্ত্রীপরিষদই হল শাসন বিভাগের প্রকৃত কর্ণধার (Real head or Real Executive)। এই মন্ত্রীসভাই রাষ্ট্রপতি বা রাজার নামে দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করে।

সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে অনুসরণ করে যা স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থার রীতিমত বিপরীত একটি ব্যবস্থা। যেমন স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এতে সরকারকে কারও কাছে জবাবদিহি করতে হয় না। একই ব্যক্তির হাতে এখানে সকল ক্ষমতা কুক্ষিগত থাকে এবং তার সাথে কোন দ্বিমত কিংবা বিরোধিতাকে বল প্রয়োগের মাধ্যমে দমন করা হয়। পক্ষান্তরে সংসদীয় পদ্ধতি জোর দিয়ে থাকে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের উপর এবং সরকারের জবাবদিহিতার উপর। এ শাসন ব্যবস্থায় প্রকৃত শাসক হলো মন্ত্রীসভা যা জনগণের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত। ফলে জনগণের প্রতিনিধিদের দ্বারাই সরকারি নীতি নির্ধারিত হয় এবং শাসনকার্য পরিচালিত হয়। জনগণের প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিমত প্রতিফলিত হয়। সরকার এই অভিমতকে উপেক্ষা করতে পারে না। সরকার প্রত্যক্ষভাবে আইনসভার কাছে এবং চূড়ান্তভাবে জনগণের কাছে দায়বদ্ধ থাকে। ফলে এ শাসন ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক শাসন বা জনগণের শাসনের স্বরূপ বজায় থাকে। সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় সরকারী দলের পাশাপাশি বিরোধী দলের মর্যাদাও সমানভাবে স্বীকৃত। বিরোধীদল গঠনমূলক সমালোচনার মাধ্যমে সরকারকে জনকল্যাণমূলক পথে ও গণতান্ত্রিক উপায়ে শাসনকার্য পরিচালনা করতে বাধ্য করে। সরকারী দলের স্বৈরাচারিতার পথে বাধার সৃষ্টি করে। শাসনব্যবস্থায় গণতন্ত্রের স্বরূপ সংরক্ষণের ব্যাপারে বিরোধী দলের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। সংসদীয়

---

[৩৯] W.F. Willoughby, 1935, The government of Modern states, pp. 225-226.

Dhaka University Institutional Repository

শাসনব্যবস্থায় একটি শক্তিশালী বিরোধীদল সরকারকে সংযত ও গণতন্ত্রের স্বরূপ রক্ষা করতে সাহায্য করে। সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা মূলত দলীয় শাসন ব্যবস্থা। এ শাসন ব্যবস্থায় এক বা একাধিক দল বা জোট ক্ষমতায় থাকে, পাশাপাশি এক বা একাধিক দল বা জোট বিরোধী দলে থাকে। সরকারি দল ও দলীয় নেতারা রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করেন এবং বিরোধী দল ও দলীয় নেতারা সরকারের ব্যর্থতা ও ভুলত্রুটি জনসমক্ষে তুলে ধরার চেষ্টা করেন। সরকারি ও বিরোধী দল উভয়ের সমন্বিত প্রচেষ্টায় এখানে সরকারের সামগ্রিক রূপ পরিস্ফুট হয়।

সরকারি দলের থাকে মন্ত্রিপরিষদ বা কেবিনেট, বিরোধী দলের থাকে ছায়া কেবিনেট। একটি কায়া আর অন্যটি ছায়া। দুইয়ের সমষ্টিই সরকার। সরকারি দলের নেতা সংসদেরও নেতা তেমনি বিরোধী দলের নেতারও রয়েছে সাংবিধানিক মর্যাদা। তিনিও একজন মন্ত্রীর পদমর্যাদাসম্পন্ন। সরকারি ব্যয়ে তাঁর আবাসিক এবং অন্যান্য সুবিধার ব্যবস্থা হয়। সরকারি দল ব্যর্থ হলে শাসন ব্যবস্থা পরিচালনার দায়িত্ব বিরোধী দলের ওপরই হয় ন্যস্ত।[৪০]

রাষ্ট্রীয় যে কোনো গুরুত্বপুর্ণ বিষয়ে আলোচনা-পর্যালোচনার জন্য জাতীয় সংসদ হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট স্থান এবং যে কোনো আইন প্রণয়নের জন্য জাতীয় সংসদে বিল উপস্থাপন অপরিহার্য। মোট কথা জাতীয় কোনো আলোচনা- পর্যালোচনার কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে সংসদ। এবং কোনো বিষয়ে দিকনির্দেশনাও এসে থাকে জাতীয় সংসদ থেকে।

উপরোক্ত আলোচনা শেষে বলা যায় যে সংসদীয় গণতন্ত্র হলো এমন সরকার পদ্ধতি যা জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এবং সরকার তার যাবতীয় কাজের জন্য জনগণ ও আইন সভার কাছে দায়বদ্ধ থাকে।

---

৪০ আহমদ, এমাজউদ্দীন, প্রাগুক্ত, ঢাকা, ১৯৯৩ ইং, পৃঃ-২।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

৩.১ বাংলাদেশের স্বাধীনতাপূর্ব রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক পটভূমি

বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও সংসদীয় গণতন্ত্র সম্পর্কে জানতে হলে বাংলাদেশের স্বাধীনতাপূর্ব তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পটভূমি সম্পর্কে ধারণা নেয়া অত্যন্ত জরুরী। ভারতীয় উপমহাদেশের সুদীর্ঘ দুইশত বছরের ব্রিটিশ শাসনের পথ বেয়ে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র ভারত ও পাকিস্তানের আবির্ভাব ঘটে ১৯৪৭ সালে। মূলত ব্রিটিশ শাসক গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রন ও নাগাপাশ থেকে মুক্ত হতে তৎকালীন ভারতীয় উপমহাদেশের হিন্দু মুসলমানদেরকে অবতীর্ণ হতে হয়েছে এক সুদীর্ঘ জাতীয়তাবাদী সংগ্রামে। ১৯৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজদের হাতে ভারতীয় উপমহাদেশের স্বাধীনতা লুণ্ঠিত হয় যার কারণে পরবর্তীতে এই স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে ভারত ও পাকিস্তানের লক্ষ কোটি জনগনকে অপেক্ষা করতে হয়েছে দীর্ঘ ১৯০ বছর। বৃটিশ শাসিত ভারতীয় উপমহাদেশের সুদীর্ঘ এই ১৯০ বছরের ইতিহাস ছিল আন্দোলন, সংগ্রাম, অসহযোগ, অসহযোগিতা আর অনৈক্যের ইতিহাস। তৎকালীন ভারতীয় উপমহাদেশের হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে যেটুকু ঐক্য মাঝেমধ্যে দেখা যেতো তা ছিল মূলত ইংরেজদের ভাগ কর এবং শাসন কর এই নীতিরই অব্যবহিত ফল। তথাকথিত এ ঐক্যে কোন বাস্তবতা ছিল না বললেই চলে। কেননা ভারতীয় উপমহাদেশ সৃষ্টির প্রথম থেকেই শেষ পর্যন্ত এ অঞ্চলের দুটি প্রধান জাতি হিন্দু, মুসলমানদের মধ্যে সত্যিকারের ঐক্যের অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে বহুবার। ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবে পাকিস্তানের রূপকার কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ তার দ্বি-জাতি তত্ত্বের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন "বারোশো বছরের ইতিহাসে ভারত ঐক্যবদ্ধ হতে পারেনি, বরং দেখা গেছে যুগের পর যুগ ভারত সর্বদা হিন্দু ভারত এবং মুসলিম ভারত এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। ভারতের বর্তমানের কৃত্রিম ঐক্য ব্রিটিশের অবদান। ব্রিটিশের বিজয় এ ঐক্য সাধন করেছে এবং ব্রিটিশ বেয়নেটের জোরেই এ ঐক্য বজায় রেখেছে। কিন্তু ব্রিটিশ শাসনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র ভারতের ভাঙ্গনের সূচনা হবে।[১]

পাকিস্তানের জাতির পিতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর এ বক্তব্য সর্বাংশে সত্য প্রমাণিত হয় ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তি ও ব্রিটিশ শাসনের অবসানের মধ্য দিয়ে। প্রায় দুইশত বৎসরের বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসন শোষণের পরে ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট পৃথিবীর পঞ্চম বৃহত্তম রাষ্ট্ররূপে পূর্ব বাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান নিয়ে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের আত্মপ্রকাশ ঘটে।[২]

---

১ ভুঁইয়া ,ড. মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াদুদ, ১৯৮৯, 'বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন' রয়েল লাইব্রেরী, ঢাকা, পৃঃ ১৮৪।

২ আহমদ,এমাজ উদ্দীন, ১৯৯২,"পাকিস্তানের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমস্যার সূচনা ঃ পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বিরোধের কারণ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কথা, বাংলাদেশ বুক কর্পোরেশন লিমিটেড, ঢাকা, পৃঃ ১০৫।

Dhaka University Institutional Repository

তবে শুরুতেই নানাবিধ সমস্যা ও জটিলতার কারনে পাকিস্তানের রাজনীতিতে যে দুর্বল রাজনৈতিক সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কারণ হলো ঐক্যবদ্ধ জাতীয়তাবাদী শক্তির অভাব, প্রশাসনিক ও সাংগঠিনিক দুর্বলতা। সৃষ্টির প্রথম থেকেই পাকিস্তানী জনগণের প্রত্যাশিত দাবিছিল রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক ঐক্যবদ্ধতার এবং সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষমতার সুষ্ঠু বন্টন। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, তৎকালীন রাজনৈতিক নেতৃত্ব ১৯৪৭ সালের পর দীর্ঘ ৯ বছর ধরে বহু চেষ্টার পরও পাকিস্তানের জন্য একটি সংবিধান উপহার দিতে পারেনি।

অবশেষে ৯ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে পাকিস্তানের দ্বিতীয় গণপরিষদ দেশকে প্রথমবারের মত একটি সংবিধান দিতে সক্ষম হয় যা ১৯৫৬ সালের ২৩শে মার্চ থেকে কার্যকর হয়। পাকিস্তানে ১৯৫৬ সালের সংবিধানের অধীনে সর্বপ্রথম সংসদীয় তথা মন্ত্রী পরিষদ শাসিত শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। ব্রিটিশ সংবিধানের সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে পকিস্তানের সংবিধানেও আইন পরিষদের প্রাধান্যকে স্বীকার করে নেয়া হয়। নিয়মানুযায়ী কেন্দ্রে প্রেসিডেন্ট এবং প্রদেশে প্রাদেশিক গভর্ণর হলেন সাংবিধানিক প্রধান। উক্ত সংবিধানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পরিষদ জাতীয় পরিষদের কাছে এবং প্রাদেশিক মন্ত্রী পরিষদ প্রাদেশিক আইন পরিষদের কাছে দায়িছিলেন। ১৯৫৬ সালের এ সংবিধানের যে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলি ছিল তাতে দেখা যায় এ সংবিধানের মাধ্যমে পাকিস্তানে মন্ত্রী পরিষদ শাসিত সরকার গঠনের পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাও প্রবর্তিত হয়। এ ব্যবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের প্রায় সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল। যেমন সংবিধানের প্রাধান্য, লিখিত সংবিধান, উচ্চ বিচারালয়, বিচার বিভাগের প্রাধান্য, সংবিধান কর্তৃক কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বষ্ঠন প্রভৃতি। ১৯৫৬ সালের সংবিধানের বৈশিষ্ট্য যাই হোক না কেন এ সংবিধানের মূল লক্ষ্য ছিল সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, কিন্তু সমালোচকদের মতে, এ সংবিধানের মাধ্যমে পাকিস্তানের প্রবর্তিত সংসদীয় বা পার্লামেন্টারী শাসন ব্যবস্থা কার্যত কোন ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়নি। এ ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছিল। আবার কারো কারো মতে, সংসদীয় ব্যবস্থা পাকিস্তানে ব্যর্থ হয়নি বরং এ ব্যবস্থাকে যথাযথভাবে কাজ করতে দেয়া হয়নি।[৩]

১৯৫৮ সালের গোড়ার দিকে পাকিস্তানের সংসদীয় ব্যবস্থা ও রাজনীতিতে ব্যাপক স্থিতিহীনতা দেখা দেয়। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মন্ত্রীসভার দ্রুত রদবদল হতে থাকে। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে নানা অজুহাত দেখিয়ে প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর সমগ্র পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি করেন, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারগুলোকে বাতিল বলে ঘোষণা করেন, সকল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করেন, সংবিধানকে বাতিল করে দেন এবং জেনারেল আইয়ুব খানকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে নিযুক্ত করেন।

---

[৩] ভুঁইয়া, ড. আব্দুল ওদুদ, প্রাগুক্ত পৃঃ ২৪২।

Dhaka University Institutional Repository

এরপর শুরু হয় আইয়ুব খানের স্বৈরাচারী শাসন। পাকিস্তান সৃষ্টির পর পরই অভ্যন্তরীণ উপনিবেশবাদের[৪] বিরুদ্ধে অন্দোলন করে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য পাকিস্তানী জনগণ যে সংগ্রাম শুরু করেছিল তা সামরিক শাসনের প্রারম্ভে কিছুটা বাধাগ্রস্ত হলেও আইয়ুব খানের শাসনামলেই সংসদীয় গণতন্ত্র ও প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের দাবি গনআন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে।

১৯৬২ সালের সংবিধানের অধীনে পাকিস্তানে সংসদীয় গণতন্ত্রের পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। পাকিস্তানের যে সকল জনগণ দীর্ঘদিন যাবত পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন সম্বলিত সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠার দাবি ও প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছিলেন তাদের কাছে ১৯৬২ সালের সংবিধান এক ধরনের সাংবিধানিক স্বৈরতন্ত্র'র প্রতিষ্ঠা বলে প্রতিভাত হয়। পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র সমাজের ডাকে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তারা এ সংবিধানের বিরুদ্ধে গণ আন্দোলন গড়ে তোলে। ১৯৬২ সালের ১৫ই মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ধর্মঘট আহ্বান করে এবং ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত এক সভায় সংবিধানের দুটি কপি পুড়িয়ে দেয়। এরপর ২৪ মার্চ ছাত্ররা সংবিধান বাতিল, দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং শেখ মুজিবসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তির দাবি সংবলিত ৩ দফা আন্দোলনের ভিত্তিতে অনির্দিষ্ট কালের জন্য ধর্মঘটের ডাক দেয়। এ আন্দোলনে বহু ছাত্র কারাগারে আটক হয়। এরই মধ্যে সরকার ১৯৬২ সালের সংবিধানের অধীনে জাতীয় পরিষদের প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দিলে রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে আবার বিদ্রোহের সূচনা হয়। কোন কোন রাজনৈতিক সংগঠন নির্বাচনের প্রকাশ্য বিরোধীতা শুরু করে তথাপিও এমতাবস্থায় প্রতিক্রিয়াশীল কিছু রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সমর্থন ও প্রচেষ্টায় জাতীয় পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনের পর ১৯৬২ সালের ৮ই জুন প্রেসিডেন্ট আইয়ুব সামরিক শাসন প্রত্যাহার করে নিলে পাকিস্তানে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে রাজনৈতিক দল, ছাত্র সমাজসহ আপামর জনসাধারণের মধ্যে আশার সঞ্চার হতে থাকে। কিন্তু বাস্তবতায় এর ভিন্ন চিত্র ফুটে ওঠে। পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ প্রসঙ্গে তৎকালীন পাকিস্তানের অর্থমন্ত্রী আব্দুল কাদিরের সরল স্বীকারোক্তি "There has been some disparity in the field of economic development between the two provinces"[৫] আইনমন্ত্রী বিচারপতি মোহাম্মদ ইব্রাহীম বলেন, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার অর্থনৈতিক বৈষম্যকে আর তুচ্ছ মনে করা কিংবা উপেক্ষা করা যায় না। এমনকি প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানও জনসমক্ষে স্বীকার করেন যে, অতীতে পূর্ব

---

৪ 'অভ্যন্তরীন উপনিবেশবাদ' এর ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, Rounaq Jahan, Bangladesh Politics:Problems and Issues, UPL 1980 P. Zillur Rahman Khan, Leadership, parties and politics in Bangladesh, western political quarterly, vol. 29, No. 2 March 1976, p.102.

৫ The Pakistan observer, Dhaka, 4 May 1962.

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তান তার সঠিক পাওনা থেকে বঞ্চিত হয়েছে।[৬] আইয়ুব সরকারের স্বৈরাচারী শাসন পূর্ব পাকিস্তানের সকল জনগনকে স্তিমিত করার পরিবর্তে আইয়ুব সরকারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গঠনে উৎসাহ যোগাতে থাকে। ক্ষমতাসীন সরকার যতই অত্যাচার, অনাচার বাড়াতে থাকে জনমনে আইয়ুব বিরোধী বিক্ষোভ ততই বেগবান হতে থাকে। পরোক্ষভাবে পূর্ব পাকিস্তানকে সামগ্রিক বিবেচনায় ক্ষতিগ্রস্ত করার উদ্দেশ্যে সুকৌশলে পাক ভারত যুদ্ধের ইন্ধন যোগাতে থাকে আইয়ুব সরকার। কিন্তু ১৯৬৫ সালের পাক ভারত যুদ্ধ পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষতির পরিবর্তে এ এলাকার স্বায়ত্বশাসনের দাবিকে সুতীব্র গতিবেগ দান করে। পাক ভারত যুদ্ধের অব্যবহিত পর থেকেই জনমনে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর উদাসীনতা ও বৈষম্যমূলক আচরণের প্রতি অসন্তোষ ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। এ অসন্তোষ ও প্রতিক্রিয়া ক্রমে নতুন পথে জমাট বাঁধতে থাকে। আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দসহ দেশের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি সরকারের এ চরম অবহেলা ও উদাসীনতার বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। আইয়ুব সরকারের তথাকথিত উন্নয়নে পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানিদের মধ্যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য মারাত্মক আকার ধারণ করে। এ আমলে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ সীমিত থাকার ফলে নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে সামরিক ও বেসামরিক আমলাগণ মূখ্য ভূমিকা পালন করেন। কিন্তু এ আমলাবাহিনীতে বাঙালীদের সংখ্যা ছিল নগন্য। ১৯৬৪ সালে কেন্দ্রীয় সচিবালয়ে মোট ১৭ জন সচিবের মধ্যে মাত্র ২ জন ছিলেন বাঙালী। তাছাড়া সচিবালয়ের প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের মধ্য বাঙালীদের প্রতিনিধিত্ব ছিল মাত্র ২১%। ১৯৬৬ সালের মোট ৮০১ জন প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তার মধ্যে মাত্র ১৭০ জন বাঙালী ছিলেন।[৭] সামরিক বাহিনীতে বাঙালীদের সংখ্যা ছিল আরও কম। ১৯৬৫ সালে মোট ১৭ জন জেনারেল, লেঃ জেনারেল ও মেজর জেনারেলের মধ্যে মাত্র ১ জন মেজর জেনারেল ছিলেন বাঙালী।[৮] পূর্ব পাকিস্তান ও পাশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্যও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছিল মারাত্মকভাবে। ১৯৬৪-৬৫ সালে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে মাথা পিছু আয়ের বৈষম্য ছিল ৪৬%। পাকিস্তানের তৃতীয় পঞ্চম বার্ষিকী পরিকল্পনার (১৯৬৫-৭০) অন্যতম ঘোষিক লক্ষ্য ছিল দুই অঞ্চলের মধ্য মাথা পিছু আয়ের বৈষম্য ২০% কমানো, কিন্তু বাস্তবে ১৯৬৯-৭০ সালে এই বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়ে ৬০% এ দাঁড়ায়।[৯] পাকিস্তানের সামরিক ও বেসামরিক শাসক চক্রের অর্থনৈতিক শোষন ও রাজনৈতিক অভিজাত্যের কারণে পূর্ব বাংলার জনগন যখন ক্ষুব্ধ তখন ১৯৬৫ সালে ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তান দারুনভাবে অরক্ষিত হয়ে পড়ে। এ পরিস্থিতিতে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ পাকিস্তানের কেন্দ্রীয়

---

[৬] ভূঁইয়া, ড. আবদুল ওদুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩।

[৭] Jahan, Rounaq, 1973, Pakistan:Failure in national Intergrationi, UPL, Dhaka, p. 9.

[৮] Sayeed, K.B, 1967, The political System of Pakistan. Boston, p.195.

[৯] Government of East Pakistan, Economic Security of East Pakistan 1969-70, Dhaka,1970 p.15.

Dhaka University Institutional Repository

সরকারের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলে। এ সময় ১৯৬৬ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী লাহোরে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালীর মুক্তির সনদ হিসেবে খ্যাতি অর্জনকারী ৬ দফা কর্মসূচি উত্থাপন করেন। ছয় দফায় প্রথম দফায় উল্লেখ করা হয়েছে, ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে সংবিধান রচনা করে পাকিস্তানকে একটি সত্যিকার অর্থে যুক্তরাষ্ট্ররূপে গঠন করতে হবে। এতে যে সরকার ব্যবস্থা হবে তা হবে পার্লামেন্টারী পদ্ধতির। সার্বজনীন প্রাপ্ত বয়স্কদের সরাসরি ভোটে যাবতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। তাতে পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব বিদ্যামন থাকবে। সরকার তার যাবতীয় কার্যাবলীর জন্য আইনসভার কাছে দায়বদ্ধ থাকবে। সংবিধানে জনগণের পূর্ণ মৌলিক অধিকার সংরক্ষিত হবে। তাছাড়া এখানে বিচারবিভাগের স্বাধীনতার কথাও উল্লেখ থাকবে। মোট কথা ৬ দফা কর্মসূচির মূল লক্ষ্যই ছিল যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানের অধীনে একটি সত্যিকার সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। ৬ দফা কর্মসূচির অন্যান্য দফাগুলির গুরুত্ব, অনুধাবনের জন্য শেখ মুজিব এই কর্মসূচিকে বাঙালীর বাঁচার দাবি বলে উল্লেখ করেন। পশ্চিম পাকিস্তানের শক্তিশালী আমলা ও বুর্জোয়া শ্রেণীর নিয়ন্ত্রনমুক্ত হয়ে পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদের উপর বাঙালী উদীয়মান শিল্পপতি, ব্যবসায়ী ও পেশাজীবীদের নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠা করাও ছিল এ কর্মসূচীর অন্যতম একটি লক্ষ্য। ফলে পূর্ব বাংলার সকল শ্রেণীর আপামর জনগণ এ কর্মসূচিকে বিপুলভাবে সমর্থন করে। মূলত ৬ দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে পূর্ব বাংলার যে স্বায়ত্বশাসন আন্দোলন শুরু হয় পরবর্তীতে তা জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে পরিণত হয়।

পাকিস্তান সরকার বাঙালীর স্বায়ত্বশাসনের দাবি ৬ দফাকে চিরতরে ধ্বংস করার জন্য শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধান আসামী করে ১৯৬৮ সালের জানুয়ারী মানে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে। ১৯৬৮ সালের জুন মাসে কুর্মিটোলা সেনানিবাসে এক বিশেষ আদালতে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শুনানী শুরু হয়। অভিযুক্ত ব্যক্তিরা তাদের উপর আকথা-অত্যাচার এবং সামরিক বাহিনী ও প্রশাসনে বাঙালীদের বিরুদ্ধে বৈষম্য মূলক আচারনের বিস্তারিত বিবরণ দান করে সংবাদ পত্রে প্রকাশ করেন। বাংলাদেশের মানুষ এইসব বিবরনকে মনে প্রাণে বিশ্বাস করে এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাকে বাঙালীদের বিরুদ্ধে আইয়ুব খানের নির্মম ষড়যন্ত্র বলে বিবেচনা করে। পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর এ চক্রান্ত ও দমনীতির ফলে পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মধ্যে বিরাজমান বিভেদ, অবিশ্বাস ও ঘৃনার মনোভাব তীব্রতর হয়। শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি বাংলার মানুষের সহানুভূতি ও শ্রদ্ধাবোধ বৃদ্ধি পায়। ফলে খুব সহজেই তিনি বাঙালীদের অতি প্রিয় জাতীয় নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ১৯৬৯ সালে বাঙালীদের গণআন্দোলনের প্রবল চাপের মুখে আইয়ুব সরকার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার ও শেখ মুজিবসহ সকল অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিনাশর্তে মুক্তি প্রদান করতে বাধ্য হন।

Dhaka University Institutional Repository

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ফলে শুধুমাত্র পূর্ব বাংলার জনমনেই নয় বরং পশ্চিম পাকিস্তানেও জনগনের মনে ব্যাপক ক্ষোভের সঞ্চার হয়। পশ্চিম পাকিস্তানীরা আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে শরিক হতে থাকে। পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র সমাজ পশ্চিম পাকিস্তানে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনকে স্বাগত জানায় এবং ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে ও দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবিতে ধর্মঘট পালন করে।[১০] ১৯৬৯ সালের ২ শে মার্চ প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান কর্তৃক ক্ষমতা ছেড়ে দেয়ার পর তৎকালীন সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানের প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত হয়ে পাকিস্তানে দ্বিতীয়বারের মত সামরিক শাসন জারি করেন। গণ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে আইয়ুব খানের পতন হয়েছে এ বাস্তব সত্যটি উপলব্ধি করে জেনারেল ইয়াহিয়া খান দেশে সৃষ্ঠ নানাবিধ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ভিন্ন রাজনৈতিক পন্থা অবলম্বন করলেন। ২৫শে মার্চ রাতেই এক নেতার ভাষনে ইয়াহিয়া খান সামরিক শাসন সংক্রান্ত নির্দেশনামা পাঠ প্রমঙ্গে সংবিধান বাতিল আইন সভা সমূহ বিলুপ্ত এবং প্রেসিডেন্ট গর্ভনর ও মন্ত্রী পদে সমাসীন ব্যক্তিবর্গ আর স্ব স্ব পদে বহাল থাকবেন না বলে ঘোষণা দেন। পাশাপাশি তিনি হরতাল ধর্মঘটকারী ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী ব্যক্তিদের এবং যারা সামরিক শাসনের সমালোচনা করবে তাদেরকে শাস্তি দানের কথা ঘোষণা করেন।[১১]

এ সময় জনগণের গণতান্ত্রিক চেতনায় যেন কোন নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া না পড়ে সে লক্ষ্যে তিনি তার বক্তব্যে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন যে,"দমন ও নিপীড়ন মূলক চিন্তা ভাবনার চেয়ে তাঁর মনে সংস্কার সাধনের চিন্তাই অধিক মাত্রায় বিদ্যমান।[১২] এ মুহূর্তে ইয়াহিয়া খানের স্বৈরাচারী মনোভাবের পরিবর্তে সমগ্র প্রশাসন ব্যবস্থাকে সুষ্ঠভাবে গড়ে তোলা, আইন ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা এবং নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা কায়েম করার মনোভাব অনেকটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তার ২৫ শে মার্চের ভাষণ ও কার্যকলাপে এটা মনে হচ্ছিল যে তিনি জনগণের দাবিঅর্থাৎ গণতন্ত্রের দাবীর বিরুদ্ধে নন। অনেকটা আশ্চার্যজনক হলেও এটা সত্য তখন পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক আবহাওয়া বিরাজ করতে থাকে।[১৩] জুলফিকার আলী ভুট্টোর অভিমত "Unless the military get a taste for power themselves and I do not think this good"[১৪] ভুট্টোর এ মতামতের সাথে শেখ মুজিব একাত্মতা ঘোষণা করেন এবং সত্যিকার অর্থে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ছয় দফা ও এগার দফার ভিত্তিতে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

---

[১০] হক, ড. আবদুল ফজল, বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি, টাউন স্টোর্স রংপুর, ২০০৩ পৃ. ১১৬।

[১১] ভূইয়া আবদুল ওদুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৩।

[১২] The News week, April 7, 1969.

[১৩] ভূইয়া ড. আব্দুল ওদুদ, প্রগুক্ত, পৃ. ২৪৩।

[১৪] The Sunday times, London, March 30, 1969.

Dhaka University Institutional Repository

এদিকে ক্ষমতা গ্রহণের এক সপ্তাহের মধ্যেই ইয়াহিয়া খান তাঁর সহকারী সামরিক আইন প্রশাসকদের নিয়ে দেশে প্রয়োজনীয় পরিবেশ সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হন। স্বল্পকালের মধ্যেই আশ্চার্যজনকভাবে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি ঘটে। সামরিক আইন ভঙ্গ করার জন্য কয়েকজন ছাত্রকে কারাগারে বন্দী করা হয় এবং লঘু শাস্তি প্রদান করা হয়। পশ্চিম পাকিস্তানের কোয়েটা কয়লা খনিতে একজন শ্রমিক নেতাকে হত্যা করা হয় এবং অপর পাঁচজন শ্রমিক আহত হয়। শুরুতেই ইয়াহিয়া খান উপলব্ধি করেন যে পাকিস্তানের মৌলিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাদি কেবল রাজনীতিকরাই সমাধান করতে পারবেন যখন তারা রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হবেন এবং তাঁর ব্যক্তিগত কাজ হবে এ প্রক্রিয়ায় সাহায্য করা। ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করেন যে, তিনি নিজের স্বার্থের জন্য ক্ষমতায় আসেননি, ক্ষমতায় থাকার কোন লোভও তাঁর নেই, আর তাই নিয়মতান্ত্রিক একটি সরকারকে প্রতিষ্ঠা করেই তিনি ব্যারাকে ফিরে যাবেন। তিনি আরও বলেন যে, ছাত্র, শ্রমিক ও কৃষক সম্প্রদায়সহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সত্যিকার অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ সচেতন রয়েছেন এবং তাঁর সরকার তাদের অভাব অভিযোগের প্রতিকারের জন্য চেষ্টার এতটুকু ত্রুটি করবে না।

জনমন থেকে সকল সন্দেহ দূর করে তাদের মধ্যে আশার সঞ্চার করতে ইয়াহিয়া খান যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। তিনি জনগণ ও রাজনীতিবিদদের মন থেকে হতাশা দূর করার জন্য ১৯৬৮-৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারীদের দাবি-দাওয়া মেটাতে অগ্রসর হন। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে ইয়াহিয়া খান বিভিন্ন সমঝোতামূলক নীতি গ্রহণের মাধ্যমে অতি সতর্কতার সাথে কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন। বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি তিনি সজাগ দৃষ্টি রাখলেন। সে সাথে সামরিক শাসনকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্য জনগণকে সামরিক বিধি লংঘনের শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করে দেন। এরপর তিনি জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে মনোনিবেশ করেন। ১৯৬৯ সালের ২৮ জুলাই প্রেসিডেন্ট প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ করেন এবং পরবর্তী ১৮ মাসের মধ্যে জাতীয় নির্বাচনের কথা ঘোষণা দেন। এরপর তিনি ঘোষণা করেন যে, পাকিস্তানে পৃথক পৃথক প্রদেশ গঠন করা হবে। এক ব্যক্তি এক ভোট, এর ভিত্তিতে জাতীয় পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং পাকিস্তানের উভয় প্রদেশকে অধিকমাত্রায় স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা হবে যা পাকিস্তানের জাতীয় সংহতি ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা বিনষ্ট করবে না। তিনি আরো ঘোষণা করেন ১৯৭০ সালে ৫ই অক্টোবর দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং উক্ত সালের ১ জানুয়ারি থেকে যাবতীয় বিধি নিষেধ প্রত্যাহার করা হবে। পাশপাশি দেশে পুনরায় রাজনৈতিক তৎপরতা শুরুর অনুমতি দেয়া হবে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭০ সালের ৫ই অক্টোবর পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনের তারিখ ধার্য করা হলেও সে সময় পূর্ব পাকিস্তানে প্রবল ঘুর্ণিঝড় জলোচ্ছাস ও বন্যার কারণে নির্বাচনের তারিখ পিছিয়ে দেয়া হয়। পরবর্তী সময়সূচি অনুযায়ী পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ৭ ডিসেম্বর এবং প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় একই বছর অর্থাৎ ১৯৭০ সালের ১৭ ডিসেম্বর।

Dhaka University Institutional Repository

৩.২ ১৯৭০ সালের নির্বাচন ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম

পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দিপনা ও কর্মচাঞ্চল্যের মধ্যে দিয়ে ১৯৭০ সালের ১ জানুয়ারি পাকিস্তানের নির্বাচনী প্রচারাভিযানের কার্যক্রম শুরু হয়। এ নির্বাচনে ২৫টি রাজনৈতিক দল তাদের প্রার্থী মনোনয়ন করেন এরমধ্যে ১০টি রাজনৈতিক দল ছিল রাজনৈতিকভাবে যথেষ্ট সুসংগঠিত ও সক্রিয়। এগুলোর মধ্যে কিছু রাজনৈতিক দল ছিল যারা ধর্মীয় আদর্শে ছিল উদ্দিপ্ত যেমন– জামায়েতে ইসলাম, জামায়াতে উলেমা, মারকাযি জামায়াতে উলেমায়ে ইসলাম ইত্যাদি। বাম পন্থী রাজনৈতিক দলের মধ্যে আওয়ামী লীগ, পাকিস্তান মুসলিম লীগ, ন্যাপ, পি.পি.পি, কাউন্সিল মুসলিম লীগ ও কাইয়ুম মুসলিম লীগ ইত্যাদি।

নিচে সারণীর সাহায্যে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে দলীয় ও অঞ্চলগত প্রার্থী মনোনয়ন দেখানো হলোঃ

সারণী-১[১৫]

১৯৭০ সালের পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে দলীয় ও অঞ্চলগত প্রার্থী মনোনয়ন

মোট সিট	বেলুচস্তান (৪)	এন.ডাব্লিউএফপি. (২৫)	পাঞ্জাব (৩২)	সিন্দু (২৭)	প.পাকিস্তান (১৩৮)	পূর্ব পাকিস্তান (১৬২)	পাকিস্তান (৩০০)
আওয়ামী লীগ	১	২	২	২	৭	১৬২	১৬৯
জামায়াতে ইসলাম	২	১৫	৪৩	১৯	৭৮	৬৯	১৪৮
কাইয়ুম মুসলিম লীগ	৪	১৭	২৪	১২	৬৭	৬৫	১৩২
পা.মুসলিম লীগ	-	১	২৪	৬	৩১	৯৩	১২৪
পি.পি.পি	১	১৬	৭৭	২৫	১১৯	-	১১৯
কাউন্সিল মু.লীগ	২	৫	৫০	১২	৬৯	৫০	১১৯
পিডিপি	১	২	২১	৩	২৭	৮১	১০৮
জেইউপি	৪	১৯	৪৭	২০	৯০	১৩	১০৩
ন্যাপ (ভাসানী)	৩	১৬	-	৬	২৫	৩৬	৬১
এম.জে.ইউ. আই	-	২	৪	১	৭	৪৫	৫২
জে ইউপি	-	১	৩৯	৮	৪৮	-	৪৮
ন্যাপ	১	-	২	২	৫	১৫	২০
পিএনএল	-	-	-	-	-	১৩	২০
অন্যান্য দল	১	১	৬	৯	১৭	১৮	৩৫
স্বতন্ত্র	৫	৪৫	১১৪	৪৬	২১০	১০৯	৩১৯
মোট	২৫	১৪২	৪৬৩	১৭১	৮০১	৭৬৯	১৫৭০

[১৫] Sharif Al-Mujahid, "Pakistan : First General Elections" Asian Survey, February 1971, Vol. XI. No. 2.

Dhaka University Institutional Repository

নির্ধারিত সময়ে পাকিস্তানের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদে ২টি আসন ছাড়া বাকি যে ক'টি আসনে অংশ গ্রহণ করেছিল সবগুলোতে জয় লাভ করে। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রায় ৭৫ শতাংশ ভোট পেয়ে জাতীয় পরিষদে বিপুল সংখ্যাগরিষ্টতা অর্জন করে। নিম্নে সারণীর সাহায্যে জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের ফলাফল দেখানো হলোঃ

সারণী-২[১৬]

১৯৭০ সালের পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের ফলাফল

দল	প্রাপ্ত ভোট (শতাংশ)	প্রার্থী সংখ্যা	প্রাপ্ত আসন সংখ্যা
আওয়ামী লীগ	৭৫.১১	১৬২	১৬০
ন্যাপ (মোকোশহা)	২.০৬	৩৯	-
পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি	২.৮১	৭৮	০১
মুসলিম লীগ (কনভেনশন)	২.৮১	৯৩	-
মুসলিম লীগ (কাউন্সিল)	১.৬০	৫০	-
মুসলিম লীগ (ফাইয়ুম)	১.০৭	৬৫	-
জামায়াত-ই-ইসলামী	৬.০৭	৭১	-
জামিয়াত ই উলামা-ই ইসলাম	০.৯২	১৫	-
জামিয়াত ও নেজাম ই ইসলাম	২.৮৩	৪৯	-
অন্যান্য দল	১.২৫	৪৬	-
নির্দলীয় প্রার্থী	৩.৪৭	১১৩	০১
মোট		৭৮১	১৬২

আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেও সমস্যা ছিল এটাই যে, আওয়ামী লীগের বিজিত সকল সদস্যই ছিল পূর্ব অঞ্চলের প্রতিনিধি। পূর্ব পাকিস্তানে ১৬২টি সাধারণ আসনের মধ্যে ১৬০ টিতেই আাওয়ামী লীগের প্রার্থীরা জয় লাভ করে। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের জয়ী প্রার্থীর সংখ্যা ছিল মাত্র ৮জন। অনুরূপভাবে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানের ৩০০ আসনের মধ্যে ২৮৮টি আসন লাভ করে। পক্ষান্তরে পশ্চিম পাকিস্তানে ১১ জন প্রার্থীর মধ্যে কেউ জয় লাভ করতে পারেনা না। এদিকে, জুলফিকার আলী ভুট্টোর পিপল্‌স পার্টি জাতীয় পরিষদের মোট ৮৩টি আসন লাভ করে যা সবক'টি ছিল পশ্চিম পাকিস্তান অঞ্চলে। প্রাদেশিক নির্বাচনে এ পার্টির ৩ জন প্রার্থী প্রতিদন্দ্বিতা করেন কিন্তু

[১৬] হক, ড. আবুল ফজল, প্রাগুক্ত, পৃ : ১২৫।

Dhaka University Institutional Repository

তাদের সবগুলোর জামানতই বাজেয়াপ্ত হয়। নিম্নে সারণীর সাহায্যে ১৯৭০ সালের পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক আইন পরিষদের নির্বাচনের ফলাফল দেখানো হলো ঃ

সারণী-৩[১৭]

১৯৭০ সালের পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক আইন পরিষদের নির্বাচনের ফলাফল

দল	প্রাপ্ত ভোট (শতাংশ)	প্রার্থী সংখ্যা	প্রাপ্ত আসন সংখ্যা
আওয়ামী লীগ	৭০.৪৫	৩০০	২৮৮
পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি	১.৯৮	১৪৪	২
জামায়াত-ই-ইসলামী	৪.৫০	১৭৪	১
ন্যাপ (মস্কোপন্থী)	৩.২৭	১০৭	১
মুসলিম লীগ (কনভেনশন)	৩.৫৪	২০৮	-
মুসলিম লীগ (কাউন্সিল)	১.২২	১১৬	-
মুসলিম লীগ (কাইয়ুম)	১.১১	১২৮	-
জামিয়াত ই উলামা-ই ইসলাম	০.৫১	২৩	-
জামিয়াত ও নেজাম ই ইসলাম	১.৪৮	৬৩	-
পাকিস্তান পিপল্‌স পার্টি (পি.পি.পি)	০.০২	০৩	-
অন্যান্য দল	১.১৬	১০৪	-
নির্দলীয় প্রার্থী	১০.৭৬	৪৮০	৮
মোট	১০০.০০	১৮৫০	৩০০

এভাবেই পাকিস্তানের ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পরিবেশের মধ্য দিয়ে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়। এটা ছিল পাকিস্তানের ইতিহাসে সর্ব প্রথম সাধারণ নির্বাচন যা ছিল বিশৃঙ্খলাবিহীন ও কারচুপি ব্যতিত নির্বাচন। এ নির্বাচনের পরে সাধারণ জনগণ নতুন আশায় বুক বাধে। এ নির্বাচনের মাধ্যমে বাঙালীরা প্রথমবারের মতো আত্ম প্রতিষ্ঠার ও স্বশাসনের সুযোগ লাভ করে। আওয়ামী লীগের ছয় দফা কর্মসূচিও ৬৯'র গণঅভ্যুত্থানের ভিত্তিতে দেশে সত্যিকারভাবে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে নীরবে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে ব্যালট বিপ্লব ঘটায়। নির্বাচনের কয়েকদিন পরে শেখ মুজিবুর রহমান সাংবাদিক সম্মেলন করে ঘোষণা করেন যে, বাংলার জনগণের ৬ দফা কর্মসূচির প্রতি রয়েছে ব্যাপক সমর্থন। আর সেই কারণেই সরকার গঠনের পরেই তার প্রথম কাজ হবে ছয় দফা কর্মসূচিকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দলীয় কর্মসূচির ভিত্তিতে সংবিধান রচনা করে আপামর জনসাধারণের আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটানো।

---

[১৭] হক, ড. আবুল ফজল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬।

Dhaka University Institutional Repository

এখানে উল্লেখ্য, তৎকালীন পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠী হয়তো ভেবেছিল নির্বাচনে আওয়ামীলীগের পরাজয় ঘটবে এবং পরবর্তীতে তারা অন্যদলের সাথে কোয়ালিশন করবে। এতে তাদের পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্বশাসন ভিত্তিক আন্দোলন অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়বে। কিন্তু নির্বাচনের ফলাফল তাদের সেই হিসাবকে সম্পূর্ণভাবে পাল্টে দেয়। এমতাবস্থায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ও পি.পি.পি. নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো নতুন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। লক্ষ্য ছিল শেখ মুজিবুর রহমানকে ক্ষমতায় বসতে না দেয়া। কেননা নির্বাচনের পরপরই ইয়াহিয়া খান বাংলার জনগণকে লক্ষ্য করে ঘোষণা করেছিলেন জাতীয় পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসাবে শেখ মুজিবই হবেন পাকিস্তানের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী।

কিন্তু আদতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান আওয়ামী লীগ ও পি.পি.পির মধ্যে মতানৈক্য ও কোন্দল বাধানোর নানা কৌশল খুঁজতে থাকে। এরই ফল স্বরূপ পি.পি.পির প্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টোর জাতীয় পরিষদের বিরোধী দলের আসন গ্রহণের অস্বীকৃতি জানান। তিনি ঘোষণা করেন স্বায়ত্বশাসন শুধুমাত্র সংখ্যা গরিষ্ঠতার মাধ্যমেই নির্ধারণ করা যাবে না। কেননা এভাবেই পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান উভয়ের কাছে কখনোই কোন গ্রহণযোগ্য সংবিধান প্রদান করা সম্ভব নয়। তিনি আরও বলেন সংবিধান রচনায় আওয়ামী লীগ ও পি.পি.পির উভয়েরই সংশ্লিষ্টতা থাকতে হবে। এ ঘোষণার মাধ্যমে তিনি আওয়ামী লীগ ও পি.পি.পির মধ্যে কোয়ালিশন গঠনের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। যেটা সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আওয়ামী লীগের কাছে মোটেই গ্রহণ যোগ্য ছিল না।

পি.পি.পি নেতার এ ঘোষণার পর পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতাদের বোঝতে আর বাকি রইল না যে, জুলফিকার আলী ভুট্টো ও তার দল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিষ্ঠিত হতে চান। ক্ষমতার মোহে তিনি সংসদীয় নিয়ম-শৃঙ্খলাকে তোয়াক্কা না করে নানা প্রকার কৌশল অবলম্বন করতে থাকেন। কেননা সংসদীয় সরকারের রীতি অনুযায়ী জুলফিকার আলী ভুট্টোর বিরোধী দল গঠন ছাড়া অন্য কোন পথ খোলা ছিল না। এমতাবস্থায় ১৯৭১ সালে ৩রা জানুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন পাকিস্তানের সংবিধান রচিত হবে ১৯৬৬ সালের ছয় দফা ও ১৯৬৯ সালের ১১ দফার ভিত্তিতে। এ লক্ষ্যে তিনি নিম্নোক্ত ঘোষণার মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃত্বের কাছে সমর্থন চাইলেন । তিনি ঘোষণা করেন যে, There was no scope of readjustment in his party's Six-Point programme because it was on the basis of this programme that the referendum was held in the country. And as such the Six-Point Demands were no more his party's properties, it belonged to the people.[১৮]

---

[১৮] The pakistan Observer, 1971, January 4.

Dhaka University Institutional Repository

এরই পরপর রমনা রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুবিজুর রহমানের পরিচালনায় আওয়ামী লীগের নবনির্বাচিত সদস্যরা এভাবে শপথ গ্রহণ করেন ঃ

"জাতীয় সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে এ দেশের আপামর জনসাধারণ আওয়ামী লীগের কর্মসূচি ও নেতৃত্বের প্রতি যে বিপুল ও অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন করিয়াছেন, উহার মর্যাদা রক্ষাকল্পে আমরা সর্বশক্তি নিয়োগ করিব। ছয় দফা ও ১১ দফা কর্মসূচির উপর প্রদত্ত সুস্পষ্টগণরায়ের প্রতি আমরা একনিষ্ঠরূপে বিশ্বস্ত থাকিব এবং সংবিধানে ও বাস্তব প্রয়োগে ছয় দফা কর্মসূচি ভিত্তিক স্বায়ত্ত শাসন ও ১১ দফা কর্মসূচির প্রতিফলন ঘটাইতে সর্ব শক্তি প্রয়োগ করিব।"[১৯]

১৯৭১ সালে ১১ই জানুয়ারি ঢাকায় এসে শেখ মুবিবুর বহমানের সাথে দুই দফা বৈঠক করেন। বৈঠক শেষে শেখ মুজিবুর রহমান সাংবাদিকদের কাছে বলেন, প্রেসিডেন্টের সাথে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান সম্পর্কিত একটি সফল আলোচনা হয়েছে। ঢাকা ছাড়ার প্রাক্কালে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বিমান বন্দরে সাংবাদিকদের কাছে একই অভিমত ব্যক্ত করেন। প্রেসিডেন্টের এ অভিমতের প্রেক্ষিতে সকলের মনে এ ধারাণা দৃঢ় হয় যে শেখ মুজিবুর রহমান হবেন পাকিস্তানের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী। পূর্ব আলোচনা অনুযায়ী প্রেসিডেন্টের অনুরোধে জুলফিকার আলী ভুট্টো ২৭ জানুয়ারি ১৯৭১ ঢাকায় এসে ঘোষণা করলেন শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে সমঝোতামূলক আলোচনার জন্য তিনি ঢাকায় আসেন।

এরপর পাকিস্তানের ফিরে গিয়ে তিনি পেশোয়ারে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা দেন আওয়ামী লীগ যদি ছয় দফার প্রশ্নে আপোশ না করেন তাহলে তার দল ৩রা মার্চে ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করবেন না। ভুট্টোর এ ধরণের ঘোষণায় সমগ্র রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক রাজনৈতিক ক্ষোভের সঞ্চয় হয়। সকলের মনে গণতন্ত্রের নিশ্চয়তা সম্পর্কে প্রবল সন্দেহের সৃষ্টি হয়। যা পাকিস্তানের সংসদীয় রাজনীতির পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ন্যাপ নেতা ওয়ালি খান গণতান্ত্রিক ও সংসদীয় রীতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে তার দলের অংশ গ্রহণের কথা ঘোষণা করেন। এ সময় পূর্ব-পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ ৩রা মার্চের অধিবেশনে অংশ গ্রহণের জন্য জাতীয় পরিষদের নির্বাচিত সদস্যের প্রতি আহ্বান জানান। এমতাবস্থায় জুলফিকার আলী ভুট্টোর হুমকি দেন যে, জাতীয় পরিষদের অধিবেশন যদি ৩রা মার্চ অনুষ্ঠিত হয় তাহলে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলবেন। এ সকল ঘটনার প্রেক্ষিতে ১৯৭১ সালের ১ মার্চ প্রেসিডেন্ট ৩ মার্চের অধিবেশন অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত করে দেন। এ ব্যাপারে তিনি সংখ্যাগরিষ্ট দলের নেতা শেখ মুজিবের সাথে কোন প্রকার আলাপ-আলোচনাই করলেন না যা তৎকালীন পরিস্থিতিতে সংসদীয় গণতন্ত্রকে আরো হুমকির মুখে ঠেলে দিল।

---

[১৯], দৈনিক পাকিস্তান, ৪ঠা জানুয়ারি ১৯৭১।

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার পর পরই শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার অভিযোগে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর এস.এম. আহসানকে সরিয়ে তার স্থানে লে. জেনারেল টিক্কা খানকে নিয়োগ দেয়া হয়। পাশাপাশি সামরিক শাসনকে আরো কঠোর করে সংবাদপত্রের ওপরে কঠোর বিধি নিষেধ করা হয়। এমতাবস্থায় বাংলার জনগণ প্রতিবাদ ও বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। তারা স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার জন্য তীব্র আন্দোলন করতে থাকে। জনগণের দাবির প্রতি সাড়া দিয়ে শেখ মুজিব ঢাকাসহ সমগ্র পূর্বপাকিস্তানে হরতালের ডাক দেন। সামরিক কর্তৃপক্ষ সারা ঢাকা শহরে সান্ধ্য আইন জারি করেন।

কিন্তু আপামর জনসাধারণ এ সান্ধ্য আইনকে উপেক্ষা করে ৩রা মার্চ ১৯৭১ ঢাকার পল্টনে শেখ মুজিবুর রহমানের জনসভা আহ্বান করেন। এ জনসভায় শেখ মুজিবুর রহমান সামরিক কর্তৃপক্ষকে সান্ধ্য আইন প্রত্যাহার করে গণপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি জানান। এরপর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে শেখ মুজিবুর রহমান সামরিক কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করেন এদেশের মানুষের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তি ঘটিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে বদ্ধ পরিকর। এ জনসভায় শেখ মুজিবুর রহমান উপস্থিত জনতার সামনে তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি হবে এবং এ বিষয়ে জনগণের কর্তব্য কি সে ব্যাপারে সুস্পষ্টধারণা দেন। তিনি সকল জনগণকে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রস্তুতি নেয়ারও নির্দেশ দিলেন। এরই ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন সময়ে পাকিস্তানী সামরিক কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা পরামর্শ করে এ দেশের রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ এ বিষয় অনেকটা নিশ্চিত হলে যে পরবর্তী ২৫শে মার্চে পাকিস্তানের সামরিক শাসকগণ তাদের ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়ে সর্বশেষ সিদ্ধান্তের ঘোষণা দিবেন। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস ২৫শে মার্চ নির্দিষ্ট ক্ষমতা হস্তান্তরের চূড়ান্ত অধিবেশনে যোগ না দিয়ে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান গোপনে পাকিস্তানে চলে যান এবং যাওয়ার প্রাক্কালে লে. জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানে গণহত্যা চালাবার নির্দেশ দেন। আর এ নির্দেশ মোতাবেক ২৫ মার্চ কাল রাতেই লে. জেনারেল টিক্কা খানের নেতৃত্বে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী বাংলার আপামর জনসাধারণের উপর ইতিহাসের বর্বরোচিত হামলা চালায়। উক্ত রাতে অসংখ্য ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবীসহ সর্বশ্রেণীর জনগণ এ হামলার স্বীকার হয়। এ রাতেই কারারুদ্ধ হওয়ার পূর্বক্ষণে শেখ মুজিবুর রহমান সর্বস্তরের জনগণকে সশস্ত্র প্রতিরোধ তোলার নির্দেশ দেন এবং বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র বলে ঘোষণা দেন। এ ঘোষণার পরপরই সর্বস্তরের জনগণ স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। প্রায় নয় মাস পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম ও যুদ্ধ করে লাখ লাখ মানুষের জীবন উৎসর্গের বিনিময়ে ১৯৭১ সালে ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশকে শত্রুমুক্ত করে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করে। আর এ স্বাধীন রাষ্ট্রের ভিত্তি বাংলাদেশের আপামর জনগণের দীর্ঘদিনের গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবি বাস্তবায়নের পথকে সুগম করে দেয়।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

৪.১ বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন ও সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রবর্তন

রাজনৈতিক ব্যাবস্থা ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির মধ্যকার সম্পর্কটা মূলত পারস্পারিক সম্পর্ক। ব্যক্তির রাজনৈতিক বিশ্বাস,মূল্যবোধ,দৃষ্টিভঙ্গি প্রভৃতি বৃহত্তর রাজনৈতিক পরিসরে তার ভূমিকা সংস্কৃতির প্রকৃতি নির্ধারণ করে। অতএব বলা যায়, একটি দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির উপাদানগুলোর বিকাশ সাধনের প্রক্রিয়ায় সমাজ কাঠামোর বিভিন্ন স্তরে একটা সাযুজ্য বিদ্যমান থাকা আবশ্যক। রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে গনতান্ত্রিক নীতি ও আদর্শেও শক্ত ভিত রচনা করতে হলে রাষ্ট্র ও সমাজের প্রতিটি পর্যায়েই গনতান্ত্রিক আচার- আচরণ, রীতি- নীতি,বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গিও বিকাশ সাধন আবশ্যক[১]।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির ইতিহাসকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের একটি উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে সংসদীয় গণতন্ত্র । ভারত-পাকিস্তান বিভক্তির পূর্ব ইতিহাসেও এর সত্যতার প্রমান মেলে। বৃটিশ শাসিত পাক ভারতের অধিকাংশ আন্দোলন সংগ্রামের মূলে ছিল সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার পর সুদীর্ঘ ৯ বছর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে পাকিস্তানের দ্বিতীয় গণপরিষদ অবশেষে দেশকে প্রথমবারের মতো একটি সংবিধান দিতে সক্ষম হয়। পূর্ব প্রতিশ্রুতি মোতাবেক এই সংবিধান পাকিস্তানের যে সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করে তা ছিল মূলত সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা। কিন্তু দূর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে ১৯৫৬ সালের সংবিধানের মাধ্যমে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হলেও কার্যত তা বাস্তবায়িত হয়নি। তৎকালিন পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন তালবাহানা ও নানা অজুহাত দেখিয়ে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থার ভিত্তিমূলে কুঠারাঘাত করে এবং ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানে প্রথমবারের মতো সামরিক শাসন জারি করে। এরপর শুরু হয় আইয়ুব খানের স্বৈরাচারী শাসন। আইয়ুব খানের স্বৈরশাসনামলেই তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের আপামর জনগন সংসদীয় গণতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসনের দাবীর প্রেক্ষিতে একভাবদ্ধ হয় উঠে এবং তা এক ব্যাপক ও গণআন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। পরবর্তীতে পাকিস্তানী তৎকালীন শাসকগোষ্ঠীদের অমানুষিক নির্যাতন, শোষণ ও বঞ্চনার বিরূদ্ধে পূর্ববাংলার জনগণ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ছয় দফা দাবিউত্থাপন করে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে পূর্বপাকিস্তানের ছাত্রছাত্রীদের সাথে এ অঞ্চলের জনগণ একাত্মতা প্রকাশ করলে আন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগ হয়। অবশেষে এই উভয় দাবি সংবলিত কর্মসূচী নিয়ে আওয়ামীলীগ পশ্চিম পাকিস্তানী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে।এবং ওই নির্বাচনে আওয়ামী

---

[১] রহমান, এ এইচ এম আমিনুর, রাষ্ট্রীয় নীতি ব্যাবস্থা ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি, বাংলাদেশ রাজনীতির চার দশক, প্রথম খন্ড (তারেক শামসুর রেহমান সম্পাদিত) শোভা প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৯, পৃ : ৭৩।

Dhaka University Institutional Repository

লীগ ব্যাপক জনসমর্থন লাভে সক্ষম হয়। কিন্তু নির্বাচনে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করলেও পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের ও ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে বিরোধীতা করতে থাকে যেটা ছিল সম্পূর্ণভাবে পশ্চিম পাকিস্তানীদের ষড়যন্ত্র। ক্ষমতা হস্তান্তরের টালবাহানা শেষ পর্যন্ত আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার গণআন্দোলনে পরিণত হয়। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ গভীর রাতে পাকিস্তান সেনবাহিনী কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ওপর এক অতর্কিত আক্রমনের মধ্য দিয়ে সূচিত হয় বাঙালীদের স্বাধীনতা সংগ্রাম। এবং দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর বিশ্বের মানচিত্রে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের আবির্ভাব ঘটে। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের অব্যবহিত পরই স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন শেখ মুজিবুর রহমান এবং ১৯৭২ সালের ১১ জানুয়ারি বাংলাদেশ অস্থায়ী সংবিধান আদেশ জারির মাধ্যমে দেশে সংসদীয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ১৯৭২ সালের সংবিধানের মাধ্যমে সরকারের এই প্রচেষ্টা বাস্তব রূপ লাভ করে। প্রকৃতপক্ষে ১৯৭২ সালের সংবিধান বাংলাদেশে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় গোড়াপত্তন করে। এ প্রসঙ্গে মওদুদ আহমেদ তাঁর- 'Bangladesh : Era of Sheikh Mujibur Rahman' নামক গ্রন্থে লিখেছেন ঃ The constitution of Bangladesh envisaged a west minister type of parliamentary system reflecting the aspirations to the people nurtured for nearly two decades. The Awami League's commitment since it inception of the establishment of a 'Real living democracy' for which they struggled and suffered for so many years could now be fulfilled because of the absolute power of the government.[২]

১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর বাংলাদেশ সংবিধান গৃহীত হয় এবং একই বছরের ১৬ ডিসেম্বর তা কার্যকর হয়। ১৯৭২ সালে সংবিধান রচনায় ভারত ও ব্রিটিশ মডেলকে অনুসরন করা হয়।[৩] ১৯৭২ সালের সংবিধানে সংসদীয় ব্যবস্থার নিয়ম অনুযায়ী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতিকে দেশের নিয়মতান্ত্রিক নির্বাহী প্রধান হিসেবে রাখা হয়। পাশাপাশি রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রিত রাখার জন্য যথেষ্ট সতর্কতাও অবলম্বন করা হয়। এলক্ষে প্রকৃত নির্বাহী ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর কেবিনেটের হাতে ন্যস্ত করা হয়। এখানে উল্লেখ্য পাকিস্তান আমলে রাষ্ট্রপতি অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন যার বহি:প্রকাশ ঘটেছে ১৯৪৭-১৯৭১ সালের পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিমন্ডলে। সেই তিক্ত অভিজ্ঞতার আলোকেই বাংলাদেশে সংসদীয় সাংবিধানিক ব্যবস্থা গৃহীত হয়, যাতে এর পুনরাবৃত্তি না ঘটতে পারে। নব্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত বাংলাদেশে ১৯৭২ সালের সংবিধানে প্রধানমন্ত্রীকে প্রকৃত

---

[২] Ahmed, Moudud : 'Bangladesh Era of Sheekh Mujibur Rahman' Dhaka: UPL, P. 104

[৩] ইসলাম, মোহাম্মদ নজরুল, বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র ঃ মুজিব থেকে হাসিনা, বাংলাদেশ ঃ রাষ্ট্র ও রাজনীতি (ড.তারেক শামসুর রেহমান সম্পাদিত) মাওলা ব্রাদার্স,৩১ বাংলাবাজার,ঢাকা, পৃঃ ৮২।

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাহীর ক্ষমতা প্রদান করা হয়। সংবিধানুযায়ী তিনিই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রকৃত অধিকারী এবং তিনি জাতীয় সংসদের অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। কেবিনেট সদস্যগণ যৌথভাবে জাতীয় সংসদের নিকট দায়বদ্ধ। জাতীয় সংসদে মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব গ্রহীত হলে মন্ত্রিগণকে পদত্যাগ করতে হয়। আইন প্রণয়ন ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও জাতীয় সংসদের ছিল ব্যাপক ক্ষমতা। সংবিধান সংশোধন করার ক্ষেত্রে জাতীয় সংসদের দুই-তৃতীয়াংশে সদস্যের ভোটের প্রয়োজন হতো। "১৯৭২ সালের সংবিধান অনুসারে যে সংসদীয় ব্যবস্থা বাংলাদেশে প্রবর্তন করা হয়েছিল তাতে প্রধানমন্ত্রী ছিলেন প্রকৃত নির্বাহী প্রধান। তিনি ছিলেন কেবিনেটের মধ্যমণি এবং সমগ্র শাসন ব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র। জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা ও মন্ত্রীসভার সভাপতি হিসেবে তিনি ভোগ করতেন সুউচ্চ পদমর্যাদা। তাঁর ক্ষমতা ও পদমর্যাদা ছিল ব্রিটেনের ক্ষমতা ও পদমর্যাদার সমতুল্য। ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর ন্যায় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীও ছিলেন 'রাষ্ট্র নামক জাহাজের চালনা শক্তি'। [৪]

সংসদীয় সরকার ব্যাবস্থার নিয়ম অনুযায়ী একজন রাষ্ট্রপতি থাকবেন। যার পদমর্যাদা হবে সবার উর্ধ্বে। রাষ্ট্রপতির নামেই রাষ্ট্রের সমুদয় গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী সম্পাদিত হলেও তিনি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী সকল কার্য সম্পন্ন করবেন। রাষ্ট্রপতি সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হবেন। তবে তিনি সংবিধান অনুযায়ী দুই মেয়াদের অধিক নির্বাচিত হতে পারবেন না। সংবিধান অনুযায়ী সংবিধান লঙ্ঘন বা কোনো প্রকার অসদাচরণের অভিযোগে রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসিত করা যাবে।

৪.২ সংসদীয় গণতন্ত্রের বিলুপ্তি ও তৎপরবর্তী রাজনৈতিক অবস্থা

প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বাংলাদেশের আপামর জনগনের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণের লক্ষেই আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৭২ সালের সংবিধানের মাধ্যমে বাংলাদেশে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার গোড়াপত্তন করে। কিন্তু কয়েক বছর যেতে না যেতেই ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি আওয়ামী লীগ সরকার জাতীয় সংসদের অধিবেশনে চতুর্থ সংশোধনী আইন প্রণয়ন ও বিধিবদ্ধ করে। এই সংশোধনীর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল সংবিধানের মৌলিক পরিবর্তন সূচিত করা। সমালোচকদের মতে, এ ছিল এমন এক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার পদ্ধতিগত পরিবর্তন, যার ফলে সংসদীয় ব্যবস্থার স্থলে রাষ্ট্রপতি-শাসিত শাসন ব্যবস্থা এবং বহুদলীয় ব্যবস্থার পরিবর্তে একদলীয় ব্যবস্থার গোড়াপত্তন হয়।

সরকার ব্যবস্থার পদ্ধতিগত এ আমূল পরিবর্তনে বাংলাদেশের তৎকালীন রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে কিছুটা নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। এ ধরনের পদক্ষেপ দেশে সাংবিধানিকতাবাদ-চর্চাকে বাধাগ্রস্থ করে। তাছাড়া,

[৪] ভূঁইয়া, মোহাম্মদ আব্দুল ওদুদ, বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন, ঢাকা, পৃঃ ৪৮-৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭৫ সালে চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে একদলীয় রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থা চালু হলে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসাবে সংবিধানের কার্যকারিতা ক্ষুন্ন হয়।[৫]

কোন দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা একদিনে প্রতিষ্ঠা হয় না। গণতন্ত্র দীর্ঘ প্রক্রিয়ার ফল। ব্রিটেনে গণতন্ত্র প্রতিষ্টার ইতিহাস কয়েক শতাব্দীর। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের যে রূপ তা শুরু হয়েছিল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন থেকে। পরে তা স্বাধীনতা আন্দোলনে সশস্ত্র রূপ নেয়। স্বাধীনতার পর একদলীয় শাসন প্রচেষ্টা কিংবা সামরিক শাসন বাংলাদেশের জনগনের কাছে গ্রহনযোগ্য ছিল না।[৬]

তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, স্বাধীনতা লাভের পর এসব দেশে পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। কিন্তু স্বল্পকালের মধ্যেই এসব রাষ্ট্র পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিবর্তে হয় একদলীয় ব্যবস্থা নতুবা সামরিক একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে। বাংলাদেশেও এর কোনো ব্যতিক্রম হয়নি। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক রওনক জাহান লিখেছেন, "In a relatively short span of three years following the birth of the country, the ruling elite in Bangladesh first adopted and later rejected parliamentary democracy as its model of government and politics. The constitutional experimentations in Bangladesh in the aftermath of liberation are very similar to the constitutional changes in other new states of the Third World. What is worse, the ruling elite did not have sufficient empathy for liberal constitutional democracies, and they grossly violated the rules of the game."[৭]

এটা সত্য যে, স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে বাংলাদেশে সাংবিধানিক পরিবর্তন তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য নতুন দেশের সাংবিধানিক পরিবর্তনের মতোই। তবে তুলনামূলক দৃষ্টিতে যে পার্থক্যটা স্পষ্ট সেটা হলো তৎকালীন শাসক এলিটদের উদারপন্থী সাংবিধানিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি উদাসীনতা। দেশ স্বাধীন হবার পর মাত্র তিন বছর সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের শাসক এলিট প্রথমত সরকার ও রাজনীতির মডেল হিসেবে পার্লামেন্টারি ব্যবস্থাকে গ্রহণ করে এদেশের জনগনের দীর্ঘদিনের দাবীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন কিন্তু পরবর্তীকালে সল্প সময়ের মধ্যে তা প্রত্যাখ্যান করে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে শুধু যে রাজনৈতিক ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন তাই নয়, বাংলাদেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে একটি দুর্বল ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়ে গেছেন। যা পরবর্তীকালে বাংলাদেশের সুস্থ রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক চর্চার অন্যতম অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

---

[৫] হাসানুজ্জামান, আল মাসুদ, বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠান নির্মান, বাংলাদেশ রাজনীতির চার দশক, প্রথম খন্ড (তারেক শামসুর রেহমান সম্পাদিত) শোভা প্রকাশ,ঢাকা, ২০০৯, পৃঃ ৫১।

[৬] মনিরুজ্জামান, তালুকদার, বাংলাদেশের রাজনীতি, বাংলাদেশ রাজনীতির চার দশক, প্রথম খন্ড (তারেক শামসুর রেহমান সম্পাদিত) শোভা প্রকাশ,ঢাকা, ২০০৯, পৃঃ ৩৬।

[৭] Rounaq Jahan, op.cit. 2005 (new expandad edition), p. 133.

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের জনগণের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল সংসদীয় সরকার। এই আলোকে পাকিস্তান আমলে প্রথম ১৯৫৬ সালের সংবিধানের অধীনে যে সংসদীয় সরকার গঠন করা হয় তা ১৯৫৮ সালে সামরিক আইন জারির মাধ্যমে বিলুপ্ত হয়। স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭২ সালের সংবিধানের অধীনে যে সংসদীয় সরকার প্রবর্তন করা হয় ১৯৭৫ সালে চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে তারও অপমৃত্যু ঘটানো হয়।[৮] এখানে প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক, যে আওয়ামী লীগ সরকার স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সংসদীয় সরকার পদ্ধতি গ্রহন করে সেই আওয়ামী লীগ কোন্ অবস্থায় একদলীয় রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থার প্রতি ঝুঁকে পড়ে? অধিকাংশ রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও লেখকদের মতে সংসদীয় গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য সংবিধানের প্রতি অনুগত ও শ্রদ্ধাশীলসম্পন্ন যে রাজনৈতিক দলের প্রয়োজন তৎকালীন বাংলাদেশে তার যথেষ্ঠ অভাব ছিল। কেননা তৎকালীন বিরোধী দলগুলির অধিকাংশই সংসদীয় রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিল না।[৯]

১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারী সংসদীয় গণতন্ত্র বিলুপ্ত করা হয়। ১৯৭৫ সালে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী পাশ হওয়ায় দেশে সংসদীয় পদ্ধতির পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবহার যাত্রা শুরু হয়। চতুর্থ সংশোধনী পাশ হওয়ায় আমলাদের ক্ষমতা দারুণভাবে খর্ব হয় এবং তাদের কার্যকলাপের ওপর রাজনীতিবিদদের হস্তক্ষেপ বেড়ে যায়। ফলে আমলারা এই সংশোধনী পাশ হওয়ায় নাখোশ হয়। এমনি এক পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কয়েকজন জুনিয়র অফিসার ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট ভোরে একটি রক্তাক্ত অভ্যুত্থান ঘটায়। অভ্যুত্থানে শেখ মুজিব, তাঁর পরিবারের অধিকাংশ সদস্য এবং তাঁর কয়েকজন ঘনিষ্ঠ সহযোগী নিহত হন। এ সময় খন্দকার মোশতাক আহমদ রাষ্ট্রপতির পদে আসীন হন এবং তিনি দেশে সামরিক আইন ঘোষণা করেন। খন্দকার মোশতাক আহমদ মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে সেনাবাহিনীর স্টাফ প্রধান নিযুক্ত করেন। তৎকালীন সেনাবাহিনীর উপপ্রধান ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর মোশতাককে ক্ষমতাচ্যুত করেন এবং জিয়াউর রহমানকে গৃহবন্ধী করে নিজেই সেনাবাহিনীর স্টাফ প্রধান হন। এবং সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি মোহাম্মদ সায়েমকে রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত করেন। ৭ নভেম্বর এক সিপাহী অভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে খালেদ মোশাররফ এর হত্যাকান্ড সংগঠিত হয় এবং মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান সেনাবাহিনীর স্টাফ প্রধান পদে পুনঃঅধিষ্ঠিত হন। এসময় সায়েম রাষ্ট্রপতির পদে বহাল থাকেন। পরবর্তিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার কারণে ১৯৭৭ সালের ২১ এপ্রিল আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম রাষ্ট্রপতির পদ ত্যাগ করেন এবং প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহন করেন। ১৯৭৭ সালের ৩০ মে

---

[৮] আলম, মো: জামছুল, ২০০৩, বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির একটি বিশ্লেষণ (পি.এইচ.ডি অভিসন্দর্ভ),ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০।

[৯] হক, ড. আবুল ফজল, প্রাগুক্ত, পৃঃ-১৮৪।

Dhaka University Institutional Repository

গণভোটের মাধ্যমে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান তাঁর প্রেসিডেন্সিকে পদকে বৈধ করেন। সেনাপ্রধানের পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান ১৯৭৮ সালের ৩ জুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ১৯৭৯ সালের ফেব্রুয়ারীতে দ্বিতীয় পার্লামেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বাধীন বিএনপি তিনশত আসনবিশিষ্ট সংসদে ২১০ আসন লাভ করে।

১৯৮১ সালের ৩০ মে এক দল বিদ্রোহী সেনা কর্মকর্তার হাতে চট্টগ্রামে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান নিহত হন। উপ-রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তার রাষ্ট্রপতি জিয়ার উত্তরসুরি হিসেবে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ১৯৮১ সালের ১৫ নভেম্বর বিচারপতি সাত্তার আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। এক বছর যেতে না যেতেই রাষ্ট্রপতি সাত্তার ক্ষমতাচ্যুত হন। ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ এক রক্তপাতহীন অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সেনাবাহিনী প্রধান লে. জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ক্ষমতা দখল করেন। তিনি নয় বছর একটানা দেশ শাসন করেন। এরশাদও সংবিধানে কয়েকটি পরিবর্তন সাধন করেন। তার আমলের উল্লেখযোগ্য সংশোধনীর মধ্যে রয়েছে অষ্টম সংশোধনী। এ সংশোধনীতে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং দেশের বিচার বিভাগের কাঠামোতে পরিবর্তন আনা হয়। অষ্টম সংশোধনী বিচার বিভাগ সংক্রান্ত অংশটুকু পরবর্তীকালে সুপ্রিম কোর্ট বাতিল করে দেয়। তবে চতুর্থ সংশোধনীতে যে রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির ব্যবস্থা রাখা হয় পরবর্তী আমলে তা অক্ষুন্ন রাখা হয়।

শুরু থেকেই অধিকাংশ জনগণ ও রাজনৈতিক দলগুলো এরশাদ সরকারের বিরোধিতা করতে থাকে। কারণ, তিনি বিচারপতি সাত্তারের নেতৃত্বাধীন একটি নির্বাচিত সরকারকে হটিয়ে ক্ষমতা দখল করেছিলেন। ১৯৮৬ সালে তৃতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু এই নির্বাচনে জেনারেল এরশাদের জাতীয় পার্টি ব্যাপক ভোট ডাকাতি করে। ১৯৮৬ এর নির্বাচনে আওয়ামীলীগ ও জামায়াতে ইসলামী অংশগ্রহণ করলেও বিএনপি তাতে অংশগ্রহণ করেনি। ১৯৮৮ সালের মার্চে চতুর্থ সংসদীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু এই নির্বাচনে প্রধান বিরোধী দলগুলো অংশগহণ না করায় জনগণের কাছে তা গ্রহণযোগ্যতা পায়নি ।

৪.৩ ১৯৯০ সালের গণঅভ্যুত্থান ও সংসদীয় গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা

১৯৯০ সালের গোড়ার দিকে বিএনপি, আওয়ামী লীগ, জামায়াতে ইসলামী ও কয়েকটি বামপন্থী দল এরশাদ সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য গণআন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে কর্মসূচি ঘোষণা করে। সরকার বিরোধী আন্দোলন চূড়ান্তভাবে একটি গণআন্দোলনে পরিণত হয়। প্রচন্ড গণআন্দোলনের মুখে ১৯৯০ সালের ডিসেম্বরে এরশাদ সরকারের পতন ঘটে এবং এরশাদ প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন।[১০]

---

[১০] ইসলাম, মোহাম্মদ নজরুল, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৪।

Dhaka University Institutional Repository

প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে গঠিত নির্দলীয়, নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ১৯৯১ সালের ফেব্রুয়ারীতে বাংলাদেশে পঞ্চম সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনকে সকলেই অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু বলে রায় দিয়েছে। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ এবং বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপির মধ্যে এ নির্বাচনে মূল লড়াই হয়। জাতীয় পার্টি, জামায়াতে ইসলামী এবং ৫টি বামপন্থী দলের একটি গ্রুপ এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। বিপুল সংখ্যক প্রার্থী স্বতন্ত্র হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। বিএনপি পঞ্চম সংসদে একক বৃহত্তম দল হিসেবে আবির্ভূত হয়। তবে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারেনি। আওয়ামী লীগ ৯২টি আসন পেয়ে দ্বিতীয় বৃহত্তম, জাতীয় পার্টি ৩৫টি আসন পেয়ে তৃতীয় এবং জামায়াতে ইসলামী ১৯টি আসন পেয়ে চতুর্থ বৃহত্তম দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। স্বতন্ত্র ও বামপন্থী দলগুলোর সমন্বয়ে গঠিত একটি গ্রুপ বাকি আসনগুলো লাভ করে। এমতাবস্থায় বিএনপি জামায়েত ইসলামীকে সাথে নিয়ে কোয়ালিশন সরকার গঠন করে। এবং ১৯৯১ সালের মার্চে সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।

১৯৯১ সালের সংসদ নির্বাচনে বিএনপির বড় ধরনের সাফল্য অর্জিত হয়েছিল। তবে সংসদ নির্বাচনে বিএনপি সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পেলেও তার মোট প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা ছিল আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন আট দলীয় জোটের চেয়ে কম। সুতরাং বিএনপি রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ঝুঁকি না নিয়ে সংসদ নির্বাচনের ফলাফলের ভিত্তিতেই ক্ষমতায় যাবার কৌশল অবলম্বন করে। আওয়ামী লীগও রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য পীড়াপীড়ি করেনি। কারণ, আওয়ামী লীগ নির্বাচনী মেনিফেস্টোতে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা কায়েম করার ঘোষণা করেছিল । বিএনপি ও আওয়ামী লীগ উভয়েই নিজ নিজ কৌশলগত সীমাবদ্ধতার জন্য সংসদীয় পদ্ধতির সরকার কায়েমে সম্মত হয়। ফলে ১৯৯১ সালের সেপ্টেম্বরে জাতীয় সংসদে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী পাশের মাধ্যমে দেশে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

এটি ছিল তৎকালীন সংসদের একটি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত। এ প্রেক্ষিতে অধ্যাপক ড. এমাজউদ্দীন আহমদ লিখেছেন দীর্ঘ ১৬ বছর পর বাংলাদেশে আবারও সংসদীয় গণতন্ত্রের যাত্রা শুরু হয়। দ্বাদশ সংশোধনী আইন অনুমোদিত হলো গণভোটে। যদিও গণভোট সম্পর্কে জনগণের আগ্রহ ছিল সীমিত, তথাপি যারা ভোট দিয়েছেন তাদের চার-পঞ্চমাংশেরও বেশী সমর্থন লাভ করেছে সংবিধান সংশোধন আইন। এসব কারণে এ মুহূর্তটি এ জাতির জন্য যেমন পরম পরিতৃপ্তির, তেমনি সীমাহীন দায়িত্ব গ্রহণের। যতটুকু আনন্দের, তার চেয়ে অনেক বেশি দায়বদ্ধতার।[১১]

---

[১১] আহমদ, এমাজউদ্দীন, সমাজ ও রাজনীতি জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক, ঢাকা, ১৯৯৩ ইং, পৃঃ-১।

Dhaka University Institutional Repository

৪.৪ ১৯৭২ সালের সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পূর্বে পরিচালিত গণআন্দোলনসমূহ

আইয়ুব দশকের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের মুল্যায়নে যখন পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী ব্যতিব্যস্ত তখন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ উক্ত দশকের শোষণনীতি ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠে। ১৯৬৬ সালে আওয়ামী লীগের ছয় দফা কর্মসূচি ঘোষণা ও ১৯৬৮ সালের শেষ দিকে ছাত্রসমাজের এগারো দফা দাবি পেশ পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর এ শোষণনীতিরই বহিঃপ্রকাশ। এ সময়ে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ আইয়ুব শাসনের বিরুদ্ধে আগের চেয়ে অনেক বেশি সচেতন ও সোচ্চার হয়ে উঠে। ক্রমে আন্দোলনের গতিধারা দ্রুত পরিবর্তিত হতে থাকে। পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতি চরমভাবাপন্ন হয়ে উঠে এবং পরিশেষে তা গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়। এর ফলে ক্ষমতাচ্যুত হন আইয়ুব খান এবং ইয়াহিয়া খান আইয়ুব খানের স্থলাভিষিক্ত হন।

১৯৬৯ সালের ৮ই জানুয়ারি আটটি রাজনৈতিক দল একটি রাজনৈতিক জোট গঠন করে। এ জোটের নামকরণ করা হয় গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ সংক্ষেপে বলা হয় ড্যাক। ড্যাক দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য ৮ দফা কর্মসূচি প্রণয়ন করে যার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল:

- দেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় পার্লামেন্টারী পদ্ধতির সরকার প্রতিষ্ঠা করা।
- প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান।
- অবিলম্বে জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার করা।
- নাগরিক স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার ও সব কালো আইন বিশেষ করে বিনা বিচারে আটক ও বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স বাতিল করা।
- সংবাদপত্রের উপর থেকে বিধিনিষেধ প্রত্যাহার, নতুন ডিক্লারেশন প্রদান, পত্রপত্রিকা ও সাময়িক পত্রের বাজেয়াপ্ত নির্দেশ প্রত্যাহার এবং 'ইত্তেফাক' ও 'চাট্টান'সহ যে ক্ষেত্রে ডিক্লারেশন বাতিল করা হয়েছে সে ক্ষেত্রে তা পুনঃপ্রদান, প্রোগ্রেসিভ পেপারস্ লিঃ কে এর সাবেক মালিকদের পুনঃপ্রদানের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পুনরুদ্ধার করা।[১২]

ক্ষমতাসীন আইয়ুব সরকারের বিরুদ্ধে যে আন্দোলনে এতদিন মুলতঃ ছাত্রসমাজের প্রাধান্য বিরাজমান ছিল ও প্রধানত ঢাকা শহরের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তা ১৯৬৯ সালের মাঝামাঝি সময়ে দেশের অন্যান্য গোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করে। সেই সাথে আন্দোলন ধীরে ধীরে দেশের ছোট ছোট শহর ও পল্লী এলাকায় বিস্তার লাভ করতে থাকে। পূর্ব পাকিস্তানের শিল্পাঞ্চলগুলো থেকে আগত শিল্প শ্রমিকরাও এতে সমর্থন দেয়। মাওলানা ভাসানীও এতে তাঁর সমর্থন দেন। ফলে এ আন্দোলন প্রদেশের সব শ্রমিক ও কৃষকদের সমর্থন লাভ করতে

---

[১২] উৎস ঃ দৈনিক ইত্তেফাক, ৯ জানুয়ারি, ১৯৬৯ (ঢাকা), এবং পাকিস্তান অবজারভার, ১০ জানুয়ারি ১৯৬৯ (ঢাকা)।

Dhaka University Institutional Repository

সক্ষম হয়। এভাবে ছাত্র-শ্রমিক-কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ জোট এত শক্তিশালী হয়ে উঠে যে তাদের সরকার বিরোধী ক্রিয়াকলাপ সমগ্র প্রদেশের প্রশাসন ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে অচল করে দেয়। কল-কারখানা, শিল্প প্রতিষ্ঠান, সরকারি অফিস-আদালত ও প্রশাসন বিল্ডিং-এ আক্রমণ করা হয়। আক্রমণ এত তীব্র হয়ে উঠে যে, সকল প্রকার সরকারি আদেশ ও নির্দেশ অচল হয়ে পড়ে। সমগ্র প্রশাসন ব্যবস্থা জনগণের হাতে চলে যায়। এক পর্যায়ে যেন জনগণই প্রদেশের হর্তাকর্তা হয়ে উঠে। স্বল্পকালের মধ্যেই উক্ত আন্দোলন গণআন্দোলন তথা গণঅভ্যুত্থানের রূপ পরিগ্রহ করে। এটাই ১৯৬৯ সালের ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থান বলে অভিহিত। গণঅভ্যুত্থানের ফলে আইয়ুব খানের স্বপ্ন ধুলায় লুটিয়ে পড়ে। সমগ্র পূর্ব পাকিস্তান প্রচণ্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। এ গণজাগরণের ঢেউ পশ্চিম পাকিস্তানেও গিয়ে তীব্রভাবে আছড়ে পড়ে। পেশোয়ার, গুজরানওয়ালা ও করাচীতে আইন অমান্য আন্দোলন প্রতিহত করার জন্য সরকার সেনাবাহিনী তলব করেন। তবে পূর্ব বাংলার এ গণঅভ্যুত্থান প্রত্যক্ষ করে আইয়ুব সরকার নিশ্চুপ বসে থাকেননি। সমগ্র শক্তি নিয়ে আইয়ুব সরকার ঝাঁপিয়ে পড়ে এ অভ্যুত্থানকে প্রতিহত করতে। ছাত্র-শ্রমিক-কৃষক ও অন্যান্যদের শায়েস্তা করতে সামরিক বাহিনীকে লেলিয়ে দেয়। অবাধে চলতে থাকে সরকারি দমননীতি। সাথে চলে জেল, জুলুম ও হত্যাযজ্ঞ। এ সকল অবস্থা অবলোকন করে জাতীয় পরিষদের বিরোধী দলীয় নেতা নূরুল আমীন সরকারকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, সকল দমননীতি অবিলম্বে বন্ধ করা হোক। বুলেট ও বেয়োনেটের শাসন টিকিয়ে রাখার জন্য তিনি সরকারকে দায়ী করেন।[১৩] মূলত ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের মধ্য নিম্নলিখিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলি গুরুত্বপূর্ণ ছিল:

- গণতন্ত্রের পূর্ণ বাস্তবায়ন;
- স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা;
- পাকিস্তানের উভয় অংশের মধ্যে বিরাজমান বৈষম্য দূরীকরণ;
- সকল গণবিরোধী ও অশুভ শক্তির মূলোৎপাটন;
- সামরিক ও বেসামরিক আমলাতন্ত্রের কর্তৃত্ব লোপ।

এসব উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে সামনে রেখে গণঅভ্যুত্থানের তীব্রতা ক্রমেই বাড়তে থাকে। শত বাঁধাবিপত্তি সত্ত্বেও সংগ্রামী জনতার উত্তাল তরঙ্গের আঘাতে ক্ষমতাসীন সরকারের ভিত কেঁপে উঠে। বিগত দশকে যারা সরকারি অনুকম্পা লাভ করেছিল এবং যাদের কায়েমী স্বার্থপরতা সমগ্র সমাজের উপর জগদ্দল পাথরের ন্যায় চেপে বসেছিল তাদের জানমালের নিরাপত্তা সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত হয়। ছাত্র-জনতা তাদের কারো কারো ঘর-বাড়ি ঘেরাও ও তাতে অগ্নিসংযোগ করে। রাস্তায় রাস্তায় তাজা রক্তের বন্যা বইতে থাকে। এ অবস্থা দেখে পুলিশ ও

---

[১৩] দৈনিক ইত্তেফাক, ১৯৬৯, জানুয়ারি ৩০।

Dhaka University Institutional Repository

ই.পি.আর বাহিনী হাঁপিয়ে উঠে। ক্রমে তারা নিষ্ক্রিয় হতে থাকে। এমতাবস্থায় সরকার সেনাবাহিনীকে লেলিয়ে দিলেন। কিন্তু এতেও শেষ রক্ষা হলো না। ১ ফেব্রুয়ারি'৬৯ বেতার ভাষণে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান অনেকটা নতি স্বীকার করে ঘোষণা দেন যে, "শীঘ্র আলাপ-আলোচনার জন্য আমি দায়িত্বশীল রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ জানাব।" এ সময় সেনাবাহিনীর ছাউনি থেকে মুক্তি লাভের পর অগণিত ছাত্র-জনতা শেখ মুজিবকে অভিনন্দন জানান তাদের সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে। অতঃপর ২৩শে ফেব্রুয়ারি'৬৯ শেখ মুজিবকে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের তরফ থেকে এক সংবর্ধনা জানান হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে তাঁকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। সেখানে বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন যে, তাঁর দল ছয়দফা ও ১১ দফা দাবি আদায়ের জন্য সংগ্রাম করে যাবে। গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান সম্পর্কে তিনি বলেন যে, তিনি তাতে যোগদান করবেন তবে তাঁর দাবি যদি মেনে নেয়া না হয় তাহলে তিনি সংগ্রাম অব্যাহত রাখবেন। তিনি গোলটেবিলে তাঁর উত্থাপিত দাবি-দাওয়া সম্পর্কে নিম্নরূপ পূর্বাভাষ দিলেন :

- প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন;
- পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব;
- প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ নির্বাচন;
- সংবাদপত্রের স্বাধীনতা।

উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে ১০ই মার্চ রাওয়ালপিণ্ডিতে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের সভাপতিত্বে পুনরায় গোল টেবিল বৈঠক শুরু হয়। সে বৈঠকে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে শেখ মুজিবুর রহমান সর্ব প্রথম বক্তব্য রাখেন। বৈঠক ১৩ই মার্চ পর্যন্ত চলে এবং তাতে শেখ মুজিবের ভাষণই আলোচনার মূল বিষয়বস্তু ছিল। ১৩ই মার্চ'৬৯ প্রেসিডেন্ট আইয়ুব উপস্থিত নেতৃবৃন্দকে অভিনন্দন জানিয়ে গোল টেবিল বৈঠকে ভাষণ দিলেন। উক্ত ভাষনে তিনি জনগণের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নিম্নলিখিত দু'টি প্রস্তাব মেনে নিলেন:

সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারভিত্তিক প্রত্যক্ষ নির্বাচন।

পার্লামেন্টারী শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন।

৪.৫ ১৯৯১ সালের সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পূর্বে পরিচালিত গণআন্দোলনসমূহ

সুদীর্ঘ নয় বছর স্বৈরশাসন চলাকালে দেশের বিরোধী দল ও জোটসমূহ কঠোরভাবে তার সমালোচনা ও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে আন্দোলনে অবতীর্ণ হয়। বিভিন্ন চড়াই-উৎরাই পার হয়ে শেষ অবধি নব্বইয়ের শেষভাগে এরশাদ বিরোধী আন্দোলন তুঙ্গে উঠে। ৮-দলীয়, ৭-দলীয় এবং ৫-দলীয় জোট এ আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ১৯৮৭ থেকে শুরু করে ১৯৯০-এর নভেম্বর মাসে এ তিন জোট এক অভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮৭ সালের সরকার বিরোধী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠা রাজনৈতিক ঐকমত্যের ভিত্তিতে তিন জোটের রাজনৈতিক নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়। কিন্তু সেই ঐকমত্যের ভিত্তিতে তখন কোনরূপ সমন্বিত ঘোষণা প্রদান করা সম্ভব হয়নি। ১৯৯০ সালের নভেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে পূর্বের ঐকমত্যের উপর নির্ভর করে তিন জোট পুনরায় এক নতুন রাজনৈতিক ঘোষণার খসড়া প্রণয়ন করে। খসড়া ঘোষণাটি ছিল নিম্নরূপ:[১৪]

১. অবিলম্বে এরশাদ ও তাঁর সরকারকে পদত্যাগ করতে হবে। সাংবিধানিক ধারা অব্যাহত রেখে সংবিধানের সংশ্লিষ্ট বিধান অনুসারে ৫১ নং ধারার ক (৩) উপধারা, ৫৫নং ধারার ক(১) উপধারা এবং ৫১ নং ধারার ৩ নং উপধারা অনুসরণ করে স্বৈরাচার ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী আন্দোলনরত জোট ও দলসমূহের এবং দেশপ্রেমিক সকল শক্তির নিকট গ্রহণযোগ্য একজন নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ ব্যক্তির (রাষ্ট্রপতির) নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।

২. এ নতুন রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে একটি অন্তবর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে বর্তমান জাতীয় সংসদ বিলোপ করে ৩ মাসের মধ্যে সার্বভৌম জাতীয় সংসদের অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা এবং নির্বাচনের পর নির্বাচিত জাতীয় সদস্যদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।

৩. ক) নির্বাচনকে যে কোন প্রকার সরকারি হস্তক্ষেপ অথবা পক্ষপাত মুক্ত রাখার ব্যবস্থা করা;
খ) ভোটারদের স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ভোট প্রদানের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য ভোটকেন্দ্রে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখা এবং যে কোন বাধাকে কঠোরভাবে দমনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
গ) গণপ্রচার মাধ্যমের নিরপেক্ষ ব্যবহার, ভোট কারচুপি প্রতিরোধে কার্যকর নিবৃত্তিমূলক কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ;

৪. ক) জনগণের সার্বভৌমত্ব স্বীকৃতির ভিত্তিতে দেশে সাংবিধানিক শাসনের ধারা নিরঙ্কুশ ও অব্যাহত থাকতে হবে এবং অসাংবিধানিক যে কোন পন্থায় ক্ষমতা দখলের চেষ্টা প্রতিরোধ করা হবে।
খ) বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা এবং আইনের শাসন নিশ্চিত করা হবে। নিবর্তনমূলক কালাকানুন বাতিল করা হবে এবং এরূপ কোন আইন কখনো প্রণয়ন করা হবে না।
গ) সরকার পরিচালনা ও আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত সংসদ হবে সংবিধানসম্মতভাবে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে জাতীয় সংসদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কার্যক্রমে পরিচালিত হবে এবং সেই সাথে সংখ্যালঘিষ্ঠদের মত ও অবস্থানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকার গণতান্ত্রিক রীতিরও বিকাশ ঘটানো হবে। সংসদের

---

[১৪] সাপ্তাহিক খবরের কাগজ , ১৫ নভেম্বর ১৯৯০।

Dhaka University Institutional Repository

নিকট জবাবদিহিতামূলক সরকার পদ্ধতি সুপ্রতিষ্ঠিত করা হবে। জনগণের ভোটের রায়ের মাধ্যমে সরকারের উপর জনগণের সার্বভৌম কর্তৃত্ব প্রয়োগ করা হবে।

ঘ) প্রশাসনের পরিপূর্ণ দল নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা হবে। গণপ্রচার মাধ্যমকে সম্পূর্ণভাবে নিরপেক্ষ রাখার ব্যবস্থা করা হবে।

ঙ) গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার স্বাভাবিক রীতি ও সংস্কৃতি সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে পরমত সহিষ্ণুতা, সহনশীলতার আলোকে রাজনৈতিক আচরণবিধি অনুসরণ ও দৃঢ়মূল করা হবে।

বিরোধী দলগুলোর বক্তব্য ছিল, অতীতে এদেশে নির্বাচনে কারচুপি হয়েছে কিন্তু এরশাদ শাসনামলের মত ভোট ডাকাতি হয়নি। সঙ্গত কারণেই বিরোধী দলগুলো দাবিকরে যে রাষ্ট্রপতিকে পদত্যাগ করে নির্বাচনে অংশ নিতে হবে।

স্বল্পকালের মধ্যেই সরকার বিরোধী আন্দোলন জনমনে অভূতপূর্ব সাড়া জাগায়। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় যে, জন-বিচ্ছিন্ন সরকারের পতন অবশ্যম্ভাবী। বাস্তবে হয়েওছিল তাই। নব্বইয়ের নভেম্বর-ডিসেম্বরে সূচিত হয় এক গণ-অভ্যুত্থান যার ফলশ্রুতিতে এরশাদ সরকার ক্ষমতা ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। আর সেই সাথে অবসান ঘটে সাংবিধানিক শূন্যতা সৃষ্টির অহেতুক বিতর্কের।

১৯৯০ সালের মাঝামাঝি সময় থেকে এ গণ-আন্দোলন সুতীব্র আকার ধারণ করতে থাকে এবং শেষ অবধি তা গণঅভ্যুত্থানের রূপ পরিগ্রহ করে। বলাবাহুল্য, দীর্ঘ নয় বছরের অত্যাচার, উৎপীড়ন আর ব্যর্থতার ফলশ্রুতি হলো ৯০-এর এ গণঅভ্যুত্থান।

নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল:

- স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করা।
- গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান নিশ্চিত করা।
- জাতীয় সংসদকে সত্যিকার অর্থে সার্বভৌম সংসদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা।
- দেশে সত্যিকার অর্থে জবাবদিহিমূলক তথা দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা করা।
- দেশে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।

উনসত্তুর ও নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, স্বৈরাচারী আইয়ুব ও স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করার এই গণঅভ্যুত্থান দুটি সংঘটিত হয়েছে। তাছাড়া সীমাহীন দূর্নীতি, শোষণ, বঞ্চনা, নির্যাতন, নিপীড়ন ও সামাজিক অবক্ষয় রোধকল্পে দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, ঐতিহ্যকে লালন করাই ছিল এর অপর একটি উদ্দেশ্য। নির্বাচনের মত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানকে সুপ্রতিষ্ঠিত ও অর্থবহ করে তোলার লক্ষ্যে অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহ তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করে।

উদ্দেশ্যের দিক থেকে উভয় গণঅভ্যুত্থানের লক্ষ্য অনেকটা ছিল এক এবং অভিন্ন। এগুরোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থেকে স্বৈরাচারী শাসকের অপসারণ। এ উদ্দেশ্যে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য থেকে শুরু করে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও জোটগুলোর মধ্যে ছিল এক সুদৃঢ় ঐক্য। এ ঐক্যের ফলেই অবশেষে আইয়ুব সরকার এবং এরশাদ সরকার ক্ষমতা ছেড়ে দিতে বাধ্য হন।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

৫.১ বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও সংসদীয় গণতন্ত্রের স্বরূপ

বহু রাজনৈতিক উত্থান-পতন ও নানা চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে দ্বিতীয় বারের মত বাংলাদেশে যে সংসদীয় ব্যবস্থার প্রচলন শুরু হয়েছে তার জন্ম মূলত ১৯৯১ সালের দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে। এ দিক থেকে বিচার করলে বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের বয়স মাত্র ১৯ বছর। এই ১৯ বছরে গণতন্ত্রের পদ যাত্রায় আমাদের অর্জন কতটুকু, অমাদের সামগ্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা কোন পথে পরিচালিত হচ্ছে কিংবা আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতির কোন ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে কিনা ইত্যাদি বিষয়ে জানতে হলে ১৯৯১ সালের পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত অতিবাহিত হওয়া বাংলাদেশের রাজনৈতিক কার্যাবলীসমূহ বিশ্লেষণের প্রয়োজন রয়েছে।

১৯৯১ সালের পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি সরকার গঠন করে। বিএনপি সরকার মোটামুটি স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশের মধ্য দিয়ে কার্যক্রম শুরু করে। কিন্তু কিছু দিন যেতে না যেতেই বিরোধীদলসমূহ ছোট বড় নানা ধরণের রাজনৈতিক ইস্যুকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রাম শুরু করে। দিনের পর দিন এই আন্দোলনের মাত্রা চরম আকার ধারণ করে। শুরু হয় বিরোধী দলের সংসদ বর্জনসহ নানা ধরণের অগণতান্ত্রিক ও সংসদীয় আচরণ বিরোধী কার্যক্রম। ১৯৯৪ সালের মাঝামাঝি থেকে বিরোধী দল লাগাতার সংসদ বর্জন করতে থাকে। এই সময় থেকেই দেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক অবস্থা খারাপ থেকে খারাপতর হতে থাকে। বিরোধী দলগুলোর দীর্ঘদিন সংসদ বর্জনে দেশে সাংবিধানিক সঙ্কট সৃষ্টি হয়। বিরোধী দলগুলো সংসদ বর্জন করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে ঐক্যবদ্ধ হয়। কিন্তু ক্ষমতাসীন বিএনপি সরকার এ দাবির প্রতি অনমনীয় মনোভাব প্রদর্শন করতে থাকে।

দীর্ঘদিন সংসদ বয়কটের পর আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন বিরোধী দল একযোগে পার্লামেন্ট থেকে পদত্যাগ করে। তখন বিএনপি সরকারের জন্য নতুন করে নির্বাচনে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। ১৯৯৬ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি ষষ্ঠ সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান বিরোধী দল এই নির্বাচন বর্জন করে। সুতরাং ক্ষমতাসীন বিএনপিকে দুই-তৃতীয়াংশ আসন লাভ করতে মোটেও বেগ পেতে হয়নি। দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করার পর বিএনপি পার্লামেন্টে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিল পাশ করে। এই বিল পাশ হওয়ায় ভবিষ্যতে সকল জাতীয় নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হবে এ বিধান কার্যকরী হয়। ত্রয়োদশ সংশোধনী পাশ

Dhaka University Institutional Repository

হওয়ার পর ৬ষ্ঠ সংসদ ভেঙে দেয়া হয়। ১৯৯৬ সালের ১২ জুন দেশে প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সপ্তম সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ১৪৬টি আসন লাভ করে এবং জাতীয় পার্টি ও জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের সমর্থনে ১৯৯৬ সালের ২৩ জুন জাতীয় ঐক্যমতের সরকার গঠন করে। বিএনপি ১১৬টি আসন লাভ করে এবং পার্লামেন্টে দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে শেখ হাসিনা ২৩ জুন ১৯৯৬ সালে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহনের পরপরই জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে তিনি বলেন," আমি আন্তরিক ভালবাসা জানাই বাংলাদেশের মানুষদের, যাদের সাদর সমর্থনে আজ একুশ বছর পর এক চক্রান্ত অতিক্রম করে সংগ্রামের দীর্ঘ পথ পার হয়ে সরকার গঠনে সমর্থ হয়েছি। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, এ দেশ স্বাধীন করেছিলাম আমরা সবাই মিলে যেমন এক ভয়ংকর দুঃসময়ে ঠিক তেমনি আজ সন্ত্রাস,দুর্নীতি ও দুঃশাসনের শৃঙ্খল থেকে দেশকে মুক্ত করার আরেক সংগ্রামে আমরা এক সাথে নিঃশ্বাস নেব, এক প্রত্যয়কে অবলম্বন করবো, এক লক্ষ্যে হব পথের সাথী।"[১] কিন্তু আওয়ামী লীগের ক্ষমতা গ্রহণের ছ'মাসের মধ্যেই পুনরায় দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি চরম আকার ধারণ করতে থাকে। এবার শুরু হয় প্রধান বিরোধীদল বিএনপি সহ অন্যান্য বিরোধী দলের সংসদ বর্জন কর্মসূচী। শুরু হয় বিরোধী হরতাল, অবরোধসহ নানা প্রকার গণতন্ত্র বিরোধী কর্মসূচী। পাশাপাশি চলতে থাকে সরকারি দলের দমন নীতি সহ নানা প্রকার নির্যাতন, নিপীড়নমূলক কর্মকান্ড। এভাবেই চলে ২০০১ সাল পর্যন্ত। এরপর ২০০১ সালে অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বিএনপি'র নেতৃত্বে চারদলীয় ঐক্যজোট সরকার গঠন করে। সর্বশেষ ২০০৮ সালের নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে গঠিত মহাজোট সরকার বাংলাদেশের রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসীন হয়েছে।

১৯৭২ সালে দেশে যখন সংসদীয় ব্যবস্থার সূচনা হয় তখনও জাতির কামনা ছিল সমস্যা সংকুল ও সমাজে সমস্যা সুরাহা সংসদই করবে, সংসদই হয়ে সকল রাজনৈতিক কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দু, কিন্তু জাতির প্রত্যাশা পূর্ণ হয়নি। মাত্র ক'মাসের মধ্যেই দেখা গেল, রাজনীতি সংসদ ছেড়ে রাজপথে নেমেছে?[২] বিগত ১৯ বছরের সংসদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বাংলাদেশের রাজনীতিতে সংসদীয় সংস্কৃতি আশানুরূপ উন্নতি লাভ করেনি যে কারনে সংসদও তেমনটা প্রাণবন্ত হয়ে ওঠেনি। বিরোধী দলের লাগাতার সংসদ বয়কট বাংলাদেশের সুস্থ রাজনৈতিক সংস্কৃতির পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাছাড়া বিগত সময়ে

---

১ সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ১৯৯৬, ২৭ ডিসেম্বর।

২ আহমদ, এমাজউদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ : ২।

Dhaka University Institutional Repository

সরকারও বিরোধী দলকে সংসদমুখী করার তেমন কোণ প্রয়াস ও আন্তরিকতা দেখায়নি। রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা, অসহযোগ, রাজনৈতিক অসহনশীলতা, ধর্মঘট, হরতাল জনজীবনকে যেমন অতিষ্ঠ করে তুলেছে পাশাপাশি এদেশের ভবিষ্যত রাজনৈতিক পরিবেশকে ক্রমাগত অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিচ্ছে । সরকারি দলে প্রধানমন্ত্রীর একচ্ছত্র কর্তৃত্বই প্রস্ফুটিত হয়েছে বারবার। রাজনৈতিক দলগুলো যেন বংশানুক্রমিক ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে। একথা ঠিক যে সংসদে শক্তিশালী বিরোধী দলের উপস্থিতির পাশাপাশি তাদের গঠনমূলক সমালোচনার প্রয়োজন রয়েছে কিন্তু বাংলাদেশে এর নেতিবাচক প্রভাব দারুনভাবে লক্ষ্যণীয়। এখানে সরকারি যে কোনো সিদ্ধান্তের ব্যাপারে বিরোধী দল গঠনমূলক সমালোচনার পরিবর্তে যেন বিরোধীতার জন্যই বিরোধিতা করেছে বা নেতিবাচক মনোভাব গ্রহণ করেছে। রাজনীতির নামে চলছে কাদা ছোঁড়াছুড়ি, ব্যক্তিগত আক্রমণ, অশ্লীল বাক্যবিনিময়, হিংসাত্মক কথাবার্তার বলার অসুস্থ প্রতিযোগিতা। তবে এর জন্য শুধুমাত্র আমাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলসমূহ এককভাবে দায়ী নয়। এর পাশাপাশি বিদ্যমান পারিপার্শ্বিক রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থাও সমান অংশে দায়ী। এ অধ্যায়ে মূলত বাংলাদেশের রাজনীতি, রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও সংসদীয় গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যসমূহ সম্পর্কে সংক্ষেপে একটি ধারণা দেয়ার চেষ্টা করবো।

Dhaka University Institutional Repository

৫.২ বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন সমূহের গতিপ্রকৃতি

নির্বাচন পদ্ধতি হলো যেকোন একটি দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির অন্যতম পরিচায়ক। বাংলাদেশের গনতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতির এক বিরাট অংশ জুড়ে আছে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন। বাংলাদেশের সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগের ১১ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে "প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহন নিশ্চিত হইবে।" অর্থাৎ এখানে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে দেশ শাসন করার কথা বলা হয়েছে।[৩]

জন স্টুয়ার্ট মিলের মতে, প্রতিনিধিত্বশীল সরকার আদর্শগতভাবে সর্বশ্রেষ্ঠ সরকার। কথাটি বহু পুরোনো। আজ সারা বিশ্বে আদর্শগতভাবে প্রতিনিধিত্বশীল সরকারকেই সকলের সেরা সরকার বলে স্বীকার করা হয়।[৪] এ প্রতিনিধিত্বশীল সরকার বা গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় সদস্যদের নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত করা হয়। অধুনিক যুগে রাষ্ট্রের বিশাল আয়তন এবং জনসংখ্যার বৃদ্ধি দ্রুততর হওয়ায় জনসাধারণের পক্ষে প্রত্যক্ষ ভাবে শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। তাই আধুনিক যুগে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে ভোট প্রদানের মাধ্যমে প্রতিনিধি নির্বাচন করে তাদের হাতে সার্বভৌম ক্ষমতা প্রদান করে থাকে এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ জনগণের পক্ষে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। পেঙ্গুইনের রাজনীতি বিষয়ক অভিধানে অধ্যাপক ডেভিড রবার্টসন বলেন, "নির্বাচনী ব্যবস্থা হলো প্রার্থীদের প্রাপ্ত ভোটকে আসন বরাদ্দ বা কে বিজয়ী হয়েছে সে সিদ্ধান্ত গ্রহনের পদ্ধতি।"[৫]

গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার উন্নয়ন ও বিকাশের জন্য নির্বাচন প্রক্রিয়া অত্যন্ত জরুরী। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নির্ধারিত সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠানের রীতি সর্বজনবিদিত এবং এ রীতি বিশ্বের সকল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে চালু রয়েছে। বাংলাদেশে পাঁচ বছর পর পর নিয়মিতভাবে জাতীয় সংসদের নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্র শক্তিশালী হবে এবং এর মাধ্যমে জনগণ তাদের প্রতিনিধি নির্বাচনের সুযোগ লাভ করবে। বস্তুত সংসদীয় গণতন্ত্রের একটি স্তম্ভ হলো সময় অনুযায়ী অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান। নির্বাচনের মাধ্যমেই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকার বদল হয়, নতুন সরকার গঠন হয়। অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত সরকার হলো 'জনগণের সরকার, জনগণের দ্বারা সরকার এবং জনগণের জন্য সরকার'।[৬] বাংলাদেশের নির্বাচনী

---

৩ রেহমান, তারেক শামসুর, জাতীয় সংসদ নির্বাচনঃ ১৯৭৩-২০০১,বাংলাদেশ রাজনীতির চারদশক (সম্পাদিত), প্রথম খন্ড, শোভা প্রকাশ, ঢাকা,২০০৯, পৃ ঃ ৯২।

৪ সাত্তার ,এ এম আবদুস, দৈনিক ইত্তেফাক, (মতামত) , ২০ সেপ্টেম্বর, ২০০১ , পৃষ্ঠা-৫ ।

৫ Robertson, David, The Penguin Dictionary of Politics, Middlesex, England, Penguin Books Ltd,1987.

৬ চৌধুরী, অধ্যাপক আলোয়ার উল্লাহ, দৈনিক ইত্তেফাক, ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০০১,পৃষ্ঠা-৫।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যাদেশবলে গত ৩৮ বছরে সর্বমোট ৯টি জাতীয় সংসদ নির্বাচন, কয়েকটি প্রেসিডেন্ট নির্বাচন এবং একাধিকবার গণভোট অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সকল নির্বাচনের মধ্য দিয়ে এদেশে বিভিন্ন নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সরকার পরিবর্তন হয়েছে এবং এখানকার গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করেছে।

এর মধ্যে প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ১৯৭৩ সালে এবং সর্বশেষ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর। উল্লেখিত নির্বাচনগুলির মধ্যে ১৯৮৮ সালের ৪র্থ এবং ১৯৯৬ সালের ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সর্বোতভাবে গ্রহনযোগ্যতা পায়নি। তাছাড়া সবচেয়ে বড় বিষয় হল প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহ এ দুটি নির্বাচনে অংশ গ্রহন করেনি।

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ইতিহাসকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে ১৯৭৩ সালের প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় সংসদীয় সরকার পদ্ধতির অধীনে। এবং দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থার অধীনে।

সারণি ঃ ৪

১ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল[৭], ১৯৭৩

রাজনৈতিক দলের নাম	মোট আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা	প্রাপ্ত আসন	প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হার	প্রাপ্ত ভোট
আওয়ামী লীগ	২৯২	২৯২ (৯৭.৫৮)	৭৩.২০	১৩৭৯৩৭১৭
ন্যাপ (মোজা.)	২২৪	০১ (০.৩৫)	৮.৩৩	১৫৬৯২৯৯
জাসদ	২৩৭	০১ (০.৩৫)	৬.৫২	১২২৯১১০
ন্যাপ (ভাসানী)	১৬৯	০১ (০.৩৫)	৫.৩২	১০০২৭৭১
বাংলাদেশ জাতীয় লীগ	০৮	০১ (০.৩৫)	০.৩৩	৬২৩৫৪
বাংলা জাতীয় লীগ	১১	-	০.২৮	৫৩০৯৭
সিপিবি	০৪	-	০.২৫	৪৭২১১
শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল	০৩	-	০.২০	৩৮৪২১
কমিউনিস্ট পার্টি(লেনিনবাদ)	০২	-	০.১০	১৮৬১৯
বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি	০৩	-	০.০৬	১১৯১১
বাংলা জাতীয় কংগ্রেস	০৩	-	০.০২	৩৭৬১
জাতীয় শ্রমিক দল	০১	-	০.০১	১৮১৮
স্বতন্ত্র	১২০	০৪ (১.৭৩)	৫.২৫	৯৮৯৮৮৪
মোট	১০৭৮	৩০০	১০০	১৮৮৪৬৮০৮

[৭] বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, ১৯৭৩।

Dhaka University Institutional Repository

তালিকা ঃ ৫

২য় জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল[৮], ১৯৭৯

রাজনৈতিক দলের নাম	মোট আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা	প্রাপ্ত আসন	প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হার	প্রাপ্ত ভোট
বিএনপি	২৯৮	২০৭	৪১.০৬	৭৯৩৪২৩৬
আওয়ামী লীগ (মালেক)	২৯৫	৩৯	২৪.৫৫	৪৭৩৪২৭৭
আওয়ামী লীগ (মিজান)	১৮৪	২	২.৭৮	৫৩৫৪২৬
মুসলিম লীগ/ আই ডি এল	২৬৬	২০	১০.০৮	৬৩১৮৫১
জাসদ	২৪০	৮	৪.৮৪	৯৩১৮৫১
অন্যান্য দল	৪২০	৮	৬.৪৯	২৫৪২৬১৪
স্বতন্ত্র	৪২২	১৬	১.০১	১৯৬৩৩৪৫
মোট	২১৫	৩০০	১০০	১৯২৭৩৬০০

১৯৭৩ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তৎকালীন ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ পেয়েছে ১৯২টি আসন (মোট ভোটের শতকরা ৭৩ দশমিক ১৭ ভাগ)। বাকি ৮টি আসনের মধ্যে জাসদ ১টি, ন্যাপ (মোজাঃ) ১টি, স্বতন্ত্র ৪টি জাতীয় লীগ ১টি ও ন্যাপ (ভাসানী) ১টি আসন পেয়েছিল। ১৯৭৯ সালের দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নবগঠিত বিএনপি ২০৭টি আসন পেয়েছিল (মোট ভোটের শতকরা ৪১ দশমিক ১৭ ভাগ), আওয়ামী লীগ দুই গ্রুপে বিভক্ত হয়ে (মালেক গ্রুপ) ৩৯টি আসন পায় (মোট ভোটের শতকরা ২৪ দশমিক ৫৫ ভাগ) এবং (মিজান গ্রুপ) পেয়েছিল ২টি আসন (মোট ভোটের শতকরা ২ দশমিক ৭৮ ভাগ)। জামায়াতে ইসলামী ও মুসলিম লীগ একত্র হয়ে পেয়েছিল ২০টি আসন (মোট ভোটের শতকরা ১০ দশমিক ০৮ ভাগ)। জাসদ ৮টি(মোট ভোটের শতকরা ৪ দশমিক ৮৪ ভাগ)। স্বতন্ত্র ১৬টি আসন পেয়েছিল (মোট ভোটের শতকরা ১ দশমিক ০১ ভাগ)। অন্যান্যরা পায় ৮টি আসন (মোট ভোটের শতকরা ৬ দশমিক ৪৯ ভাগ)।

---

৮ , সূত্র ঃ বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, ১৯৭৯। দেখুন, Al Masud Hassanuzzaman, Role of opposition in Bangladesh Politics,UPL,Dhaka,1998, P-87.

Dhaka University Institutional Repository

সারণি ঃ ৬

৩য় জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল[৯], ১৯৮৬

রাজনৈতিক দলের নাম	মোট আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা	প্রাপ্ত আসন	প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হার	প্রাপ্ত ভোট
জাতীয় পার্টি	৩০০	১৫৩	৪২.৩৪	১২০৭৯২৫৯
আওয়ামী লীগ	২৫৮	৭৬	২৬.১৬	৭৪৬২১৫৭
জামায়াত-ই-ইসলামী	৭৭	১০	৪.৬১	১৩১৪০৫৭
মুসলিম লীগ	১০২	৪	১.৪৫	৪১২৭৬৫
সিপিবি	৯	৫	০.৯১	২৫৯৭২৮
ন্যাপ	২০	৫	১.২৯	৩৬৮৯৭৯
জাসদ (রব)	১৩৭	৪	২.৫৪	৭২৫৩০৩
অন্যান্য দল	১৭৬	১১	৪.৫১	১২৮৫৩৭৭
স্বতন্ত্র	৪৪৮	৩২	১৬.১৯	৪৬১৯০২৫
মোট	১৫২৭	৩০০	১০০	২৮৫২৬৬৫০

পরিসংখ্যানে দেখা গেছে ১৯৮৬ সালে অনুষ্ঠিত তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জাতীয় পার্টির আসন ছিল ১৫৩টি (মোট ভোটের শতকরা ৪২ দশমিক ৩৪ ভাগ)। বিএনপি এই নির্বাচন বয়কট করলেও আওয়ামী লীগ নির্বাচনে অংশ নিয়েছিল। তাদের আসন ছিল ৭৬টি (মোট ভোটের শতকরা ২৬ দশমিক ১৬ ভাগ)। জামায়াতে ইসলামী ১০টি (মোট ভোটের শতকরা ৪ দশমিক ৬১ ভাগ)। জাসদ (রব) ৪টি (মোট ভোটের শতকরা ২ দশমিক ৫৪ ভাগ)। মুসলিম লীগ ৪টি (মোট ভোটের শতকরা ১ দশমিক ৪৫ ভাগ)। সিপিবি ৫টি (মোট ভোটের শতকরা ০ দশমিক ৯১ ভাগ)। ন্যাপ ৫টি (মোট ভোটের শতকরা ১ দশমিক ২৯ ভাগ)। স্বতন্ত্র ৩২টি আসন পেয়েছিল (মোট ভোটের শতকরা ১৬ দশমিক ১৯ ভাগ)। অন্যান্য দল ১১টি আসন পায় (মোট ভোটের শতকরা ৪ দশমিক ৫১ ভাগ)।

---

[৯] সূত্র ঃ বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, ১৯৭৯। দেখুন, Al Masud Hassanuzzaman, Role of opposition in Bangladesh Politics,UPL,Dhaka,1998, P-119.

Dhaka University Institutional Repository

সারণি ঃ ৭

৪র্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল[১০], ১৯৮৮

রাজনৈতিক দলের নাম	মোট আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা	প্রাপ্ত আসন	প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হার
জাতীয় পার্টি	২৮০	২৫১	৮৩.৬৬
সম্মিলিত বিরোধী দল	২৬৮	১৯	৬.৩৩
জাসদ (সিরাজ)	২৪	০৩	১.০০
ক্রীভম পার্টি	১১১	২	০.৬৬
অন্যান্য দল	৫৯	০	০
স্বতন্ত্র	২১৩	২৫	৮.৩৩
মোট	৯৫৫	৩০০	১০০

এরশাদ বিরোধী গণআন্দোলনের মুখে ১৯৮৭ সালের ৬ ডিসেম্বর সংসদ ভেঙ্গে দেয়া হয় এবং ১৯৮৮ সালের মার্চ মাসে চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে জাতীয় পার্টি ২৫১টি আসন পায় (মোট ভোটের শতকরা ৮৩ দশমিক ৬৬ ভাগ)। আ স ম আবদুর রবের নেতৃত্বে গঠিত হয় সম্মিলিত বিরোধী দল পায় ১৯ টি আসন (মোট ভোটের শতকরা ৬ দশমিক ৩৩ ভাগ)। জাসদ (সিরাজ) ৩টি (মোট ভোটের শতকরা ১ দশমিক ০০ ভাগ)। ক্রীভম পার্টি ২টি (মোট ভোটের শতকরা ০ দশমিক ৬৬ ভাগ)। স্বতন্ত্র ২৫টি (মোট ভোটের শতকরা ৮ দশমিক ৩৩ ভাগ)। আ স ম আবদুর রবের নেতৃত্বে গঠিত হয় সম্মিলিত বিরোধী দল এবং চতুর্থ জাতীয় সংসদে রবের দল বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করে। তবে এ নির্বাচন আওয়ামী লীগ ও বিএনপি বয়কট করে ফলে গঠিত সংসদ গ্রহণযোগ্যতা হারায়।

[১০] বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, ১৯৮৮।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি ঃ ৮

৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল[১১], ১৯৯১

রাজনৈতিক দলের নাম	মোট আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা	প্রাপ্ত আসন	প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হার	প্রাপ্ত ভোট
বিএনপি	৩০০	১৪০	৩০.৮১	১০৫০৭৫৪৯
আওয়ামী লীগ	২৬৪	৮৮	৩০.০৮	১০২৫৯৮৬৬
জাতীয় পার্টি	২৭২	৩৫	১১.৯২	৪০৬৩৫৩৭
জামায়াত-ই-ইসলামী	২২২	১৮	১২.১৩	৪১৩৬৬৬১
বাকশাল	৬৮	৫	১.৮১	৬১৬০১৪
সিপিবি	৪৯	৫	১.১৯	৪১৭৭৩৭
অন্যান্য দল	১১৮৮	৬	৭.৬৭	১৩১১২৫৬৬
স্বতন্ত্র	৪২৪	৩	৪.৩৯	১৪৯৭৩৯৬
মোট	২৭৮৭	৩০০	১০০	৩৪১০৩৭৭৭

১৯৯০ সালে এরশাদের পতনের পর ১৯৯১ সালে অনুষ্ঠিত হয় পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন । এই নির্বাচনে বিএনপির আসন ছিল ১৪০ (মোট ভোটের শতকরা ৩০ দশমিক ৮১ ভাগ)। আওয়ামী লীগের প্রাপ্ত আসন ছিল ৮৮টি (মোট ভোটের শতকরা ৩০ দশমিক শূন্য ৮ ভাগ)। জাতীয় পার্টি তৃতীয় অবস্থানে থেকে ৩৫টি আসন (মোট ভোটের শতকরা ১১ দশমিক ৯২ ভাগ)। জামায়াতে ইসলামী ১৮টি (মোট ভোটের শতকরা ১২ দশমিক ১৩ ভাগ)। বাকশাল ৫টি(মোট ভোটের শতকরা ১ দশমিক ৮১ ভাগ)। সিপিবি ৫টি (মোট ভোটের শতকরা ১ দশমিক ১৯ ভাগ)। অন্যান্য দল মোট ৬ টি (মোট ভোটের শতকরা ৭ দশমিক ৬৭ ভাগ) এবং স্বতন্ত্র ৩টি আসন (মোট ভোটের শতকরা ৪ দশমিক ৩৯ ভাগ) পায়। এই নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে বিএনপি সরকার গঠন করে।

১৯৯৬ সালে ১৫ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হয় ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। তবে এ নির্বাচনে প্রধান বিরোধী দলীয় রাজনৈতিক দলসমূহ অংশগ্রহন না করায় তা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। ফলে পরবর্তী সময়ে এই সংসদ ভেঙ্গে দেওয়া হয়।

---

[১১] সূত্র ঃ বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, ১৯৯১। দেখুন, Al Masud Hassanuzzaman, Role of opposition in Bangladesh Politics, UPL,Dhaka,1998, P-142.

Dhaka University Institutional Repository

একই বছরে অর্থাৎ ১৯৯৬ সালের ১২ জুন অনুষ্ঠিত হয় সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন। এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পায় ১৪৬টি আসন (মোট ভোটের শতকরা হার ৩৭ দশমিক ৫৩ ভাগ), বিএনপি পায় ১১৬টি (মোট ভোটের শতকরা হার ৩৩ দশমিক ৮১ ভাগ), জাতীয় পার্টি পায় ৩২টি (মোট ভোটের শতকরা হার ১১ দশমিক ৯২ ভাগ), এবং জামায়াতে ইসলামী পায় ৩টি আসন (মোট ভোটের শতকরা হার ১২দশমিক ১৩ ভাগ)। জাসদ রব, ইসলামী ঐক্যজোট এবং নির্দলীয় ১টি করে আসন পায় এবং আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে।

সারণি ঃ ৯

৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল[১২], ১৯৯৬

রাজনৈতিক দলের নাম	মোট আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা	প্রাপ্ত আসন	প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হার	প্রাপ্ত ভোট
আওয়ামী লীগ	৩০০	১৪৬	৩৭.৪৪	১৫৮৮২৭৯০
বিএনপি	৩০০	১১৬	৩৩.৬১	১৪২৫৫৯৮২
জাতীয় পার্টি	২৯৩	৩২	১৬.৪	৬৯৫৪৯৮১
জামায়াত-ই-ইসলামী	৩০০	৩	৮.৬১	৩৬৫৩০১৩
ইসলামী ঐক্য জোট	১৬৫	১	১.০৯	৪৬০৯৯৭
অন্যান্য দল সহ জাসদ (রব)	৯৩৫	১ জাসদ (রব)	১.৭৯	৭৬০৩৬৭
স্বতন্ত্র	২৮১	১	১.০৬	৪৫০১৩২
মোট	২৫৭৫	৩০০	১০০	৪২৪১৮২৬২

২০০১ সালের অক্টোবর মাসে অনুষ্ঠিত হয় অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন। এই নির্বাচনে মোট ৫৪টি রাজনৈতিক দল অংশগ্রহন করে। অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বেগম খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনা উভয়েই ৫টি করে আসনে প্রার্থী ছিলেন। এই নির্বাচনে একমাত্র বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ ৩০০ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। বিএনপি, বাংলাদেশ জামায়াত-ই-ইসলামী, জাতীয় পার্টি (নাজিউর-ফিরোজ) ও ইসলামী ঐক্য জোট সম্মিলিতভাবে চার দলীয় ঐক্য জোট নামে নির্বাচনে অংশগ্রহন করে।

এই নির্বাচনে চার দলীয় ঐক্য জোট ২১৬ টি আসন পায় (মোট ভোটের শতকরা হার ৪৭ দশমিক ০৫ ভাগ), আওয়ামী লীগ পায় ৬২টি (মোট ভোটের শতকরা হার ৪০ দশমিক ১৩ ভাগ), জাতীয় পার্টি পায় ১৪টি (মোট ভোটের শতকরা হার ৭ দশমিক ২৫ ভাগ)।

---

[১২] সূত্র ঃ বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, ১৯৯৬। দেখুন, Al Masud Hassanuzzaman, Role of opposition in Bangladesh Politics, UPL, Dhaka, 1998, P-208.

Dhaka University Institutional Repository

সারণি ঃ ১০

৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল[১৩], ২০০১

রাজনৈতিক দলের নাম	মোট আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা	প্রাপ্ত আসন	প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হার	
চার দলীয় জোট				
বিএনপি	২৫২	১৯৩	৪০.৯৭	৪৭.০৫
জামায়াত-ই-ইসলামী	৩১	১৭	৪.১৮	
ইসলামী ঐক্য জোট	০৭	০২	০.৬৮	
জাতীয় পার্টি (না-ফি)	১১	০৪	১.১৮	
আওয়ামী লীগ	৩০০	৬২	৪০.১৩	
ইসলামী জাতীয় ঐক্য ফ্রন্ট (জাতীয় পার্টি)	২৮১	১৪	৭.২৫	
কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ	৩৯	০১	০.৪৭	
জাতীয় পার্টি (মঞ্জু)	১৪০	০১	০.৪৪	
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল	৭৬	-	০.২১	
বাম গণতান্ত্রিক জোট (১১ দল)	১৭৫	-	০.২৫	
স্বতন্ত্র	৪৮৬	০৬	৪.০৬	
অন্যান্য দল	১৪২	-	০.১৪	
মোট	১৯৩৯	৩০০	১০০	

চারদলীয় ঐক্যজোটের নেতৃত্বাধীন অষ্টম জাতীয় সংসদের মেয়াদ ২৭ অক্টোবর ২০০৫ তারিখে পূর্ণ হয়। নিয়মানুযায়ী বিচারপতি হাসানের নিকট তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা থাকলেও তার কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর ঠেকাতে ১৪ দল রাজপথ দখল করে নিয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে।২৮ অক্টোবর দেশজুড়ে আওয়ামীলীগ ও বিএনপির সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে।[১৪] থেকে সৃষ্ট রাজনৈতিক কোন্দলের কারনে ২৮ অক্টোবর দুপুর ১২ টায় বিচারপতি কে.এম.হাসান আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব গ্রহনে অপারগতা প্রকাশ করেন।[১৫] এমতাবস্থায় রাষ্ট্রপতি আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক ও বিএনপির মহাসচিবকে সমাঝোতায় পৌছানোর উদ্দেশ্যে বঙ্গভবনে আলোচনায় আহবান করেন। আলোচনায় রাষ্ট্রপতি

---

[১৩] সূত্র ঃ বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, ২০০১।

[১৪] চৌধুরী,শরীফ আহমদ,প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ২৯।

[১৫] চৌধুরী,শরীফ আহমদ, ও সালেহ, মোঃ আবু, তত্ত্বাবধায়ক সরকার, ১৯৯০-২০০৮ ঃ একটি পর্যালোচনা, বাংলাদেশ রাজনীতির চার দশক, (তারেক শামসুর রেহমান কর্তৃক সম্পাদিত) প্রথম খন্ড, শোভা প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৯, পৃ ঃ ৩৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

কোন রকম সমাঝোতায় পৌছুতে না পেরে তিনি নিজেই প্রধান উপদেষ্টার পদ গ্রহনের আগ্রহ প্রকাশ করেন। আওয়ামীলীগ এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করে রাষ্ট্রপতিকে সংবিধান অনুযায়ী উদ্যোগ নেয়ার আহবান জানায়। রাষ্ট্রপতির সাথে রাজনৈতিক দলগুলোর অলোচনা সফল না হওয়ায় ওই দিন (২৯ অক্টোবর) রাত ৮ টায় রাষ্ট্রপতি সংবিধানের ৫৮গ(৩) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে প্রধান উপদেষ্টার পদ গ্রহন করেন। বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার শপথ গ্রহন এবং চারদলীয় জোটের ক্ষমতা হস্তান্তরের অনুষ্ঠানেচারদলীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত থাকলেও আওয়ামীলীগ সহ ১৪ দল এবং সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী আর কিছু দলের কোন নেতা বা প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন না।[১৬]

রাষ্ট্রপতি ড. ইয়াজউদ্দিন আহমেদের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহনকে অসাংবিধানিক বলে আওয়ামীলীগ সভাপতি শেখ হাসিনা প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। ওয়ার্কাস পার্টির রাশেদ খান মেনন রাষ্ট্রপতির তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব গ্রহনকে "সাংবিধানিক ক্যু" বলে আখ্যায়িত করেন।[১৭] এসময় দেশে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সারাদেশে ব্যাপক সহিংসতা দেখা দেয়। এরূপ আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ১১ জানুয়ারি ২০০৭ সালের সন্ধ্যায় ঢাকাসহ সারাদেশে কারফিউ জারী করা হয় এবং পরবর্তীতে সন্ধ্যা রাতে রাষ্ট্রপতি ও প্রধান উপদেষ্টা রেডিও ও টিভিতে প্রচারিত ভাষণে সারাদেশে জরুরী অবস্থা জারী করেন।[১৮] এবং পদত্যাগ করেন প্রধান উপদেষ্টা ও উপদেষ্টা পরিষদ। এরপর ১২ জানুয়ারি বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. ফখরুদ্দিন আহমেদকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে এবং পরবর্তীতে তিন পর্যায়ে পুনর্গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ১০ জন উপদেষ্টাকে নিয়োগ দেয়া হয়। সামরিক কর্তৃপক্ষের প্রকাশ্য সহযোগিতায় ড. ফখরুদ্দিন আহমেদের আমলে রাজনৈতিক পরিমন্ডলে নানা উত্থান পতন সংঘটিত হয়।

---

[১৬] দৈনিক প্রথম আলো, ঢাকা, ৩০ অক্টোবর, ২০০৬।

[১৭] দৈনিক প্রথম আলো, ঢাকা, ৩০ অক্টোবর, ২০০৬।

[১৮] দৈনিক প্রথম আলো, ঢাকা, ১২ জানুয়ারি, ২০০৭।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি ঃ ১১

৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল[১৯], ২০০৮

রাজনৈতিক দলের নাম	মোট আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা	প্রাপ্ত আসন	প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হার
আওয়ামী লীগ	২৬০	২৩০	৪৮.২৯
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল	৭	৩	০.৭২
বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি	৫	২	০.৩৭
জাতীয় পার্টি	৪৭	২৭	৬.৪৭
মহাজোট	৩১৯	২৬২	৫৫.৮৫
বিএনপি	২৫৭	৩০	৩২.৯৫
জামায়াত-ই-ইসলামী	৩৯	২	৪.৪৮
বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি	২	১	০.২৫
ইসলামী ঐক্য জোট	৪	০	০.১৫
অন্যান্য শরীক দল	৯	০	০.৪০
চার দলীয় ঐক্য জোট	৩১১	৩৩	৩৮.২৩
লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি	১৮	১	০.২৮
অন্যান্য ইসলামিক দল	৩০১	০	১.৩৭
অন্যান্য বাম দল	১৬৪	০	০.২০
ইউনাইটেড ফ্রন্ট	১৬৭	০	০.৩৫
অন্যান্য দল	১২৫	০	০.২২
স্বতন্ত্র	১৪৪	৪	২.৯৪
না ভোট			০.৫৫
মোট	১৫৪৯	৩০০	১০০

[১৯] সূত্রঃ বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন ।

Dhaka University Institutional Repository

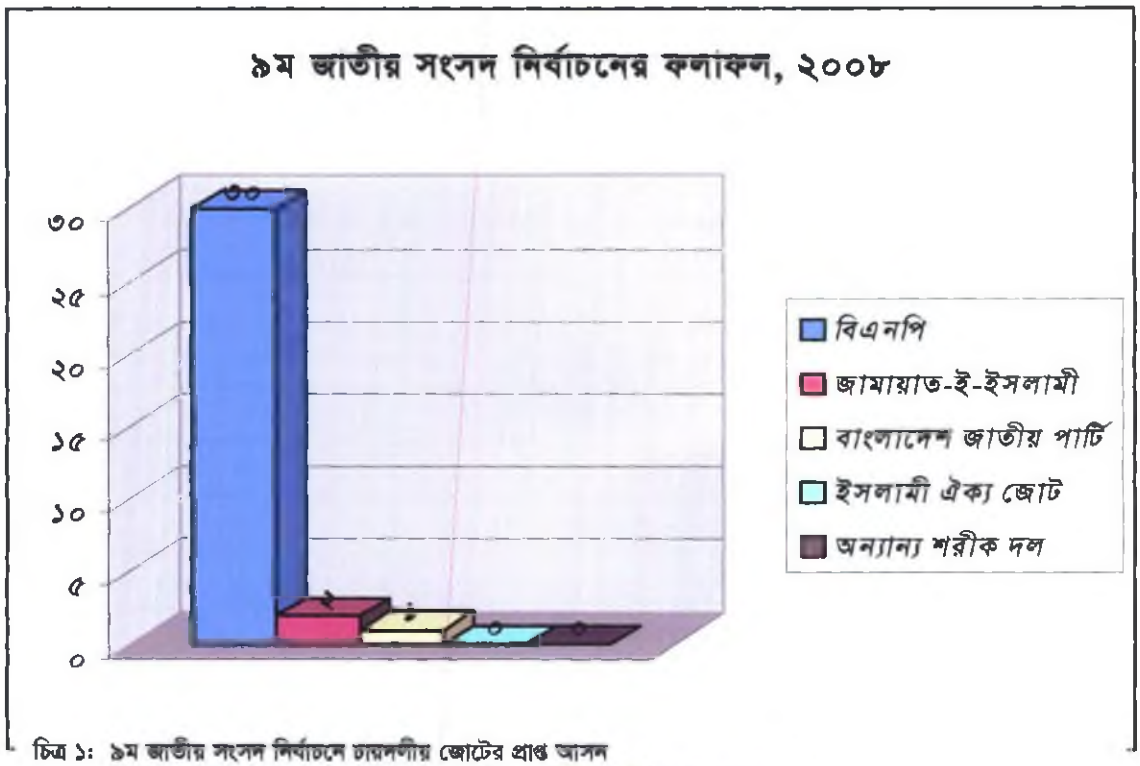

চিত্র ১: ৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চারদলীয় জোটের প্রাপ্ত আসন
বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে গবেষক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত।

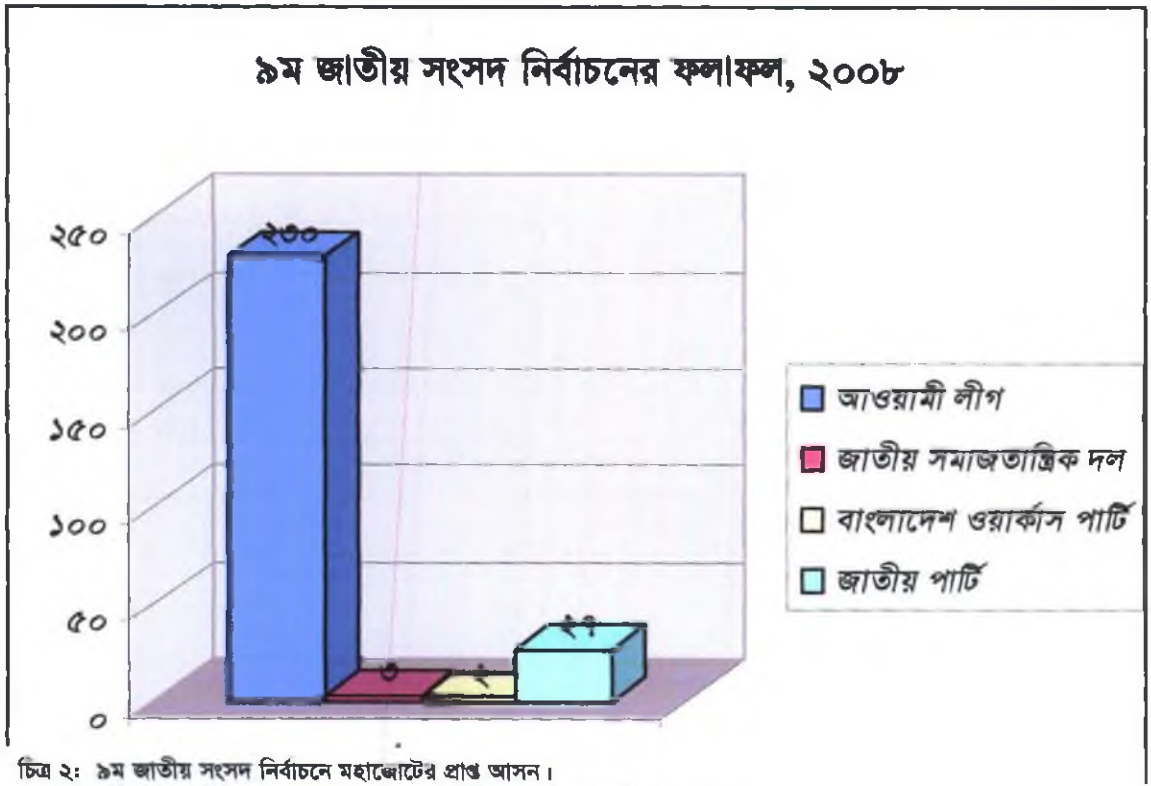

চিত্র ২: ৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মহাজোটের প্রাপ্ত আসন।
বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে গবেষক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত।

Dhaka University Institutional Repository

অবশেষে সকল আলোচনা সমালোচনা এবং গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক পরিবেশ বিনষ্টের আশঙ্কার অবসান ঘটিয়ে দীর্ঘ তিন বছরের অসাংবিধানিক ও অগণতান্ত্রিক শাসনের পর ড. ফখরুদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ২৯ ডিসেম্বর ২০০৯ সালে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে এ নির্বাচন পূর্বেকার অন্যান্য সকল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের মত অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে সংঘঠিত হয়েছে।

এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মহাজোট পায় ২৬২টি আসন (মোট ভোটের শতকরা হার ৫৫ দশমিক ৮৫ ভাগ), বিএনপি'র নেতৃত্বে চারদলীয় ঐক্যজোট পায় ৩৩টি আসন (মোট ভোটের শতকরা হার ৩৮ দশমিক ২৩ ভাগ)। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে গঠিত মহাজোট সংখ্যাগরিষ্ট আসন নিয়ে সরকার গঠন করেছে।

বাংলাদেশের নির্বাচনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ১৯৯১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচন থেকে শুরু করে ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারির নির্বাচন ছাড়া পরবর্তী সবগুলো জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় রাজনীতি নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে বা কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে। তবে ২০০১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য গঠিত এবং ২০০৮ সালের নির্বাচনকে সামনে রেখে গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে কেন্দ্র করে নানা বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। তদুপরি, দেশে বিদেশে ২০০৮ সালের নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। অধিকাংশ জাতীয় দৈনিক পত্রিকা গুলোতে নির্বাচনী ফলাফলকে 'মহাজোটের মহাসাফল্য' শিরোনামে খবর বেরিয়েছে।[২০] বাংলাদেশ মানবাধিকার সমন্বয় পরিষদ, জাতীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ পরিষদ, ইলেকশন ওয়ার্কিং গ্রুপ, ওয়েভ ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন এবং অধিকার নামের নামের সংগঠনগুলি বাংলাদেশের নির্বাচনের ইতিহাসে ২৯ ডিসেম্বরের নির্বাচনকে সবচেয়ে সফল বলে বর্ণনা করেছে। তারা বলেছে এ নির্বাচনে ভোটারদের অংশগ্রহণ ছিল নজিরবিহীন। তারা তাদের পছন্দের প্রার্থীকে স্বাধীনভাবে ভোট দিয়েছে, আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ছিল খুবই ভাল, সেখানে কোন সংঘর্ষ কিংবা সহিংসতা ঘটেনি।[২১]

---

২০ সূত্রঃ The Daily Independent, 2009, 31 December.

২১ HuQ, Abul Fazl, The nine parliament Election: A Socio-Political analysis, Dhaka, 2009.

Dhaka University Institutional Repository

বিগত ৮টি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ করলে বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক সংস্কৃতির নিম্নলিখিত প্রবণতা গুলো স্পস্ট হয়ে উঠবে :

- বিএনপি ও আওয়ামী লীগের মধ্যেই মূলত রাজনৈতিক ক্ষমতা আবর্তিত হচ্ছে এবং এই দুই বড় দলের প্রভাবও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- ধর্ম ভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলির উত্থানের যে সম্ভাবনা ছিল তা ক্রমান্বয়ে ক্ষীণ হয়েছে। ১৯৯১ সালের নির্বাচনের তুলনায় পরবর্তী নির্বাচন গুলোতে এদের প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা বহুগুণে কমে গিয়েছে।
- তৃতীয় বৃহত্তম রাজনৈতিক দল হিসেবে পরিচিত জাতীয় পার্টির বর্তমান অবস্থান আগের তুলনায় কিছুটা কমেছে।
- সরকার গঠন এবং রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের জন্য প্রয়োজনীয় জাতীয় সংসদের আসন সংখ্যা মূলত কখনও কখনও আওয়ামী লীগ ও আবার কখনও কখনও বিএনপির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছে।
- সরকার গঠনে ছোট ছোট দলগুলোর গুরুত্ব বাড়লেও ২০০১ সালের অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির নেতৃত্বে চারদলীয় ঐক্যজোটের এবং ২০০৮ সালের নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মহাজোটের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ায় তা কিছুটা স্তিমিত হয়ে গেছে।
- নির্বাচন কেন্দ্রীক জোট গঠনের প্রবণতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- ধর্ম ভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলির মত বাম সংগঠনগুলোর নির্বাচনী গণভিত্তি আগের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে।
- নির্দলীয় ও স্বতন্ত্র প্রার্থীরা বিগত দিনে বেশ কিছু আসনে বিজয়ী হলেও বর্তমানে ওই প্রবণতাও ক্রমান্বয়ে কমেছে।
- নির্বাচনোত্তর সহিংসতা আগের তুলনায় অনেকটা কমেছে বিধায় এ নির্বাচনগুলোর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

পরিশেষে বলা যায় নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে জাতি জাতীয় ঐক্যমতের পক্ষে রায় দিয়েছে। এই নির্বাচনে মহাজোটের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে গঠিত মহাজোট সরকার বাংলাদেশের সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার সত্যিকার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে ও গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক বিনির্মানে বিরোধীদলসমূহের সাথে সমঝোতার মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনা করবে এটাই সকলের প্রত্যাশা।

Dhaka University Institutional Repository

৫.৩ বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা

বাংলাদেশের রাজনীতির এক সংকটময় পরিস্থিতিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার সূচনা হয়। ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ একটি নির্বাচিত বৈধ সরকারকে সরিয়ে সম্পূর্ন অবৈধ ও অগণতান্ত্রিক পন্থায় জেনারেল এরশাদ বাংলাদেশের রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেন। তার ৮ বছর ৯ মাসের শাসনামলের ইতিহাসে একটি গণভোট, একটি রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ও দুটি জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু এ নির্বাচন গুলির একটিও অবাধ, সুষ্ঠু, গণতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়নি। তাই ১৯৮৮ সালের নির্বাচনের পর প্রধান বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো দেশে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য এরশাদ বিরোধী আন্দোলন শুরু করে। নানা উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে ১৯৯০ সালের শেষের দিকে এ আন্দোলন আরো তীব্রতর হয়। বিরোধী দলগুলোর ঐক্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন পেশাজীবী ও বুদ্ধিজীবী সংগঠনও এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে ব্যাপকভাবে যোগদান করে। সর্বদলীয় ঐক্যজোট আপামর জনগণের সাথে এ সিদ্ধান্তে একাত্মতা পোষণ করে যে সকলের সহযোগিতায় একটি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করে তার অধীনে অবাধ, সুষ্ঠু, গণতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান করে বাংলাদেশে কাঙ্খিত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। রাজনৈতিক দলগুলোর পারস্পরিক অসমঝোতা ও অবিশ্বাসের ফলে বাংলাদেশে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সাংবিধানিক বিধান করা হয়েছে।[২২] নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের লক্ষ্যে জাতীয় সংসদে ত্রয়োদশ সংশোধনী বিল-১৯৯৬ আনয়ন করা হলে বিপুল ভোটে তা পাস হয়। ওই সংশোধনী আইনে সংবিধানের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের সঙ্গে ২ক পরিচ্ছেদ সংযোজনপূর্বক ৫৮-খ, ৫৮-গ, ৫৮-ঘ এবং ৫৮-ঙ অনুচ্ছেদ লিপিবদ্ধ হয়েছে।

এ পর্যন্ত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে মোট চারটি জাতীয় সংসদের সফল নির্বাচন সম্পন্ন হয়। এগুলো যথাক্রমে ১৯৯১, ১৯৯৬, ২০০১ ও ২০০৮ সালে অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৯১ সালের নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হওয়ার পর ১৯৯৬ সালে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়।

সংসদীয় গণতন্ত্র চর্চা এবং রাজনৈতিক উন্নয়নের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখার স্বার্থে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত সকল নির্বাচনই যথেষ্ঠ গুরুত্বের দাবি রাখে। ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারির প্রধান বিরোধী দল বিহীন নির্বাচন বিতর্কিত হলেও ১৯৯৬ সালের ১২ জুন অনুষ্ঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন বাংলাদেশের গণতন্ত্র চর্চায় বড় ভূমিকা রেখেছে। বিশিষ্ট কলামিস্ট জনাব আজিজুল হক ২০০১

---

২২ আখতার, ড. মুহম্মদ ইয়াহইয়া, ২০০১, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কার্যকলাপ প্রসঙ্গ, দৈনিক ইত্তেফাক, ২৪ সেপ্টেম্বর,পৃ ৪ ৫।

Dhaka University Institutional Repository

সালের নির্বাচন প্রসঙ্গে বলেছিলেন,"ইতোপূর্বে যতগুলো নির্বাচন হয়েছে তার চেয়ে এবারের নির্বাচনের সঙ্গে সঙ্গেই জনগণের উদ্দীপনা অনেক বেশী পরিলক্ষিত হয়।"[২৩] ১৯৯১, ১৯৯৬, ২০০১ ও ২০০৮ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদের নির্বাচনগুলির বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করে অধিকাংশ রাজনৈতিক বিশ্লেষকগণ এ সিদ্ধান্তে উপনিত হয়েছেন যে, অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটি কার্যকর ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থার অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনগুলো বিশ্বব্যাপী মডেলে পরিনত হয়েছে এবং বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রাকে সম্প্রসারিত করেছে।[২৪] নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক সহিংসতার সৃস্টি হওয়া বাংলাদেশের নেতিবাচক রাজনৈতিক সংস্কৃতির একটি অন্যতম দিক। তবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা নেয়ার সাথে সাথে সন্ত্রাসীদের মধ্যে গা ঢাকা দেয়ার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় যা জনগণকে স্বস্তি যোগাতে সাহায্য করে। দলীয় সরকারের মেয়াদান্তে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির যে চরম অবনতি ঘটে অর্থাৎ রাজনৈতিক সন্ত্রাস, ছিনতাই, চাঁদাবাজি, অস্ত্রবাজি, ক্যাডার এবং গডফাদারদের দৌরাত্মের যে বিস্তার ঘটে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর তা হ্রাস পায় ফলে নির্বাচনের পূর্বে রাজনৈতিক পরিবেশে যথেষ্ঠ শান্তি বিরাজ করে। এ কারণে, দিনমজুর, কৃষক-শ্রমিক, রাজনৈতিক দল, বিভিন্ন পেশাজীবীসহ সাধারণ মানুষ দলীয় সরকারের চেয়ে এ নির্দলীয় সরকারের প্রতি বেশী সমর্থন প্রদান করে। "এদের অনেককে এ ধরণের মন্তব্যও করতে শোনা যায়, তত্ত্বাবধায়ক সরকার তিন মাসের না হয়ে আরো দীর্ঘ সময়ের জন্য হলে ভালো হতো।"[২৫] হাজার হাজার বেআইনি অস্ত্র উদ্ধার, অসংখ্য সন্ত্রাসী গ্রেপ্তার, ঘুষ, দূর্নীতি বন্ধকরণ, অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ, সঠিক সময়ে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা ও সফলভাবে নির্বাচন সম্পন্ন করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাংলাদেশের বিপর্যস্ত রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে একটি সম্মানজনক অবস্থানে আসীন করেছে।

বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকার মাত্র তিন মাসের জন্য ক্ষমতাসীন থাকে। তার প্রধান দায়িত্ব হলো যে কোন মূল্যেই হোক দলমতের উর্ধ্বে থেকে জাতিকে একটি সুষ্ঠু, সুন্দর ও সর্বজনগ্রাহ্য নির্বাচন উপহার দেয়া। সত্যিকার অর্থে ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পর ১৯৯১ সালের পূর্বে কোন সরকারই সর্বজন স্বীকৃত ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন জাতিকে উপহার দিতে পারেননি। যেহেতু কোনো দলীয় সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচন বিতর্কমুক্ত হয়নি, তাই জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে

---

২৩ হক, আজিজুল, ২০০১, দোহাই তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতিকে বিতর্কিত করবেন না, দৈনিক ইত্তেফাক, ১৭ সেপ্টেম্বর, পৃ ঃ ৫।

২৪ চৌধুরী, শরীফ আহমদ, ও সালেহ, মোঃ আবু, ২০০৯, তত্ত্বাবধায়ক সরকার (১৯৯০-২০০৮) ঃ একটি পর্যালোচনা, বাংলাদেশ রাজনীতির চার দশক, (তারেক শামসুর রেহমান কর্তৃক সম্পাদিত) প্রথম খন্ড, শোভা প্রকাশ, ঢাকা, পৃষ্ঠা - ৩৯৪।

২৫ আখতার, ড. মুহম্মদ ইয়াহইয়া, ২০০১, প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচনের বিধান সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ১৯৯১ সালের নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হয়। দেশী, বিদেশী নির্বাচনী পর্যবেক্ষক, রাজনৈতিক দল, সাধারণ জণগন সকলের কাছে এই নির্বাচন বাংলাদেশের ইতিহাসে পূর্বের যে কোনো নির্বাচনের চেয়ে সার্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল। ১৯৯১ সালের নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা পরবর্তী সময়ের জাতীয় নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠানের দাবিকে জোরদার করে।[৪] ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারির প্রধান বিরোধী দল বিহীন বিতর্কিত নির্বাচন প্রমাণ করে যে, কোনো দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব নয়। তাই মূলত এ সময় থেকেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণাটি জনপ্রিয়তার শীর্ষে চলে যায়। ১৯৯১ সালের জাতীয় নির্বাচন শুধু বাংলাদেশেই নয়, বিশ্বব্যাপী প্রশংসা অর্জন করে এবং বিশ্বের অনেক দেশ অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য বাংলাদেশের তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতিকে মডেল হিসেবে গ্রহণ করেছে।

উন্নত গণতান্ত্রিক দেশসমূহের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে দলসমূহের মধ্যে সুস্পষ্ট ঐক্যমত পরিলক্ষিত হয় এবং পারস্পারিক আস্থা ও সহিষ্ণুতার মাত্রাও উন্নতমানের।[২৬] উন্নত গণতান্ত্রিক দেশসমূহের রাজনৈতিক সংস্কৃতিও উন্নতমানের। কেননা ওই সকল দেশের গণতন্ত্রের চর্চা সংসদীয় গণতন্ত্রের বিভিন্ন প্রপঞ্চ, মূল্যবোধ, প্রথা এবং পারস্পরিক বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। ফলে সরকার পরিবর্তনের ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিক উপায় অনুসরণ করা হয়।[২৭] কিন্তু বাংলাদেশের রাজনীতিতে এ সকল উন্নত সংস্কৃতি অনুপস্থিত।

ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়ায় নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতা, জটিলতা, কারচুপি, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রশ্নে রাজনেতিক দলগুলোর পারস্পরিক অবিশ্বাস, শক্তিশালী ও স্বতন্ত্র নির্বাচন কাঠামোর অভাব ইত্যাদি সমস্যাসমূহ বাংলাদেশের রাজনীতিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের গ্রহনযোগ্যতাকে অপরিহার্য করে তুলেছে। ৩ অক্টোবর ২০০৯ ইং তারিখে দৈনিক প্রথম আলো কর্তৃক আয়োজিত "বাংলাদেশকে বদলে দিতে হলে" শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনায় অংশগ্রহনকারী অধ্যাপক আসিফ নজরুল ২০০৮ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকার সম্পর্কে বলেন "বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকার অনেক ভালো কাজ করেছে। এর মধ্যে আছে সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান, মানবাধিকার কমিশন গঠন, তথ্য অধিকার আইন ও নির্বাচনী আইনের সংস্কার।"[২৮] বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য জনাব মাহাবুবুর রহমান বলেন "এই সরকার ব্যবস্থা তুলে দিয়ে নির্বাচিত সরকারের অধীনে নির্বাচন করার মতো পরিবেশ এখনো তৈরী হয়নি।"[২৯] ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য প্রফেসর এ কে আজাদ

---

২৬ চৌধুরী, শরীফ আহমদ, ও সালেহ, মোঃ আবু, ২০০৯, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ৩৮১।

২৭ Hassanuzzaman, Al Masud, 1998, Role of opposition in Bangladesh Politics, UPL, Dhaka, P-179.

২৮ দৈনিক প্রথম আলো, ৪ অক্টোবর ২০০৯।

২৯ দৈনিক প্রথম আলো, প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

চৌধুরী বলেন," তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দূর্বল দিকগুলো দূর করতে হবে। কিন্তু এ ব্যবস্থা আরও কিছুকাল চলা দরকার।"[৩০]

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রয়োজনীয়তা এবং যথেষ্ঠ গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও অনেক বুদ্ধিজীবী ও কলামিস্ট তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিরূপ সমালোচনা করে নানা বক্তব্য ও কলাম লিখেছেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অধ্যাপক দিলারা চৌধুরীর মতে," তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সংসদীয় গণতন্ত্রের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এ ব্যবস্থা বিচার বিভাগকে বিতর্কিত করবে। রাজনীতিকে শক্তিশালী করতে হলে নির্বাচিত সরকারের অধীনে ভোট হতে হবে।"[৩১] তবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে নিয়ে এ ধরনের সমালোচনা বিভিন রাজনৈতিক দল প্রায়শইঃ করে থাকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ১৯৯৬ এবং ২০০১ এর নির্বাচনের পর তৎকালীন বিরোধীদলীয় রাজনৈতিক দলগুলো তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কম-বেশী সমালোচনা এবং এ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ-অনুযোগ করেছিল। আসলে ১৯৯১ সালের পরবর্তী বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, নিয়মানুযায়ী নির্বাচিত সরকারের নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ছাড়ার পর অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার রাষ্ট্রক্ষমতা গ্রহণ করেছে, কিন্তু নির্বাচনের পর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরাজিত অর্থাৎ বিরোধী রাজনৈতিক দলই তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নানা সমালোচনা এবং অভিযোগ-অনুযোগ করেছে যা কোন ভাবেই সুস্থ রাজনৈতিক সংস্কৃতির সহায়ক নয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান কাজ নিরপেক্ষ প্রশাসন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছু করা। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা থাকে অনেক। তারা চায় অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন। রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও সচেতন সাধারণ জণগনের মতে, বাংলাদেশের বিগত সব সরকারের শাসনামলের মেয়াদান্তে উদ্দেশ্যমূলক প্রশাসনিক রদবদল এ দেশের সংসদীয় রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে বড় নির্মমভাবে। এ সকল অভিযোগ কাটিয়ে উঠে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের স্বার্থেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে ক্ষমতায় এসে প্রশাসনে রদবদল করতে হয়েছে। নিরপেক্ষ নির্বাচনের স্বার্থে এ কাজটি বাঞ্ছনীয় ও প্রত্যাশিত হওয়া উচিত। কিভাবে প্রশাসনকে নিরপেক্ষ করতে হবে, কি করলে নির্বাচন সুষ্ঠু এবং অবাধ হবে এ ব্যাপারে রাজনৈতিক দলসমূহের গঠনমূলক পরামর্শ থাকতে পারে তবে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এখতিয়ারে থাকা সমীচীন। সবাইকে খুশি করে নিরপেক্ষ থাকা এবং সুষ্ঠু নির্বাচন করা সম্ভব নয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সকল কাজ সকল দলের খুবই পছন্দ হলেই বুঝতে

---

[৩০] দৈনিক প্রথম আলো, প্রাগুক্ত।

[৩১] দৈনিক প্রথম আলো, প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

হবে যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দিন ফুরিয়েছে বা এ সরকারের মধ্যেও কোনো সমস্যা হয়েছে। যাই হোক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পক্ষে-বিপক্ষে নানা আলোচনা-সমালোচনা আছে, থাকবে তদুপরি বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এবং নিম্নলিখিত যুক্তি গুলোর ভিত্তিতে ভবিষ্যতেও এ ব্যবস্থার চলমানতার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি ঃ

(১) দেশে কোনো সুষ্ঠু, অবাধ এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান ক্ষমতাসীন দলীয় সরকারের পক্ষে সম্ভব নয় এবং ক্ষমতাসীন সরকারের প্রতি জনগণের কোনো আস্থা নেই।

(২) ক্ষমতাসীন সরকারের প্রতি জনগণের কোনো আস্থা নেই এই জন্য যে তারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাপ্রসূত সকল সুবিধা নির্বাচনে বিজয় অর্জনের লক্ষ্যে ব্যবহার করবে। রেডিও এবং টেলিভিশনের মতো রাষ্ট্রীয় সংস্থাকে দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করবে।

(৩) সিভিল প্রশাসন ও পুলিশ কর্মকর্তাদের সহায়তায়, বিশেষ করে বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার সাহায্যে জনগণের ওপর চাপ প্রয়োগ করে গণরায়কে নিজেদের পক্ষে আনার চেষ্টা করবে।

(৪) নির্বাচন অনুষ্ঠানের সঙ্গে সংশিষ্ট ক্ষেত্রসমূহে সমমনা প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের নিয়োগ দিয়ে সমগ্র নির্বাচন ব্যবস্থায় রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করবে।

(৫) জেলায় জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার এবং থানা পর্যায়ে টিএনও এবং পুলিশ কর্মকর্তাদের মাধ্যমে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করা হবে, যাতে জনপ্রিয় ব্যক্তিরা নির্বাচিত হতে না পারে।

(৬) নির্বাচনের পূর্বক্ষণে অবৈধ এবং বৈধ প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপব্যবহার ঘটিয়ে সমর্থকদের মধ্যে ঠিকাদারি এবং অন্যান্য সুযোগসুবিধা বিতরণ করে দেশময় এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হবে, যার ফলে বিরোধী দলের প্রার্থীদের পক্ষে নির্বাচনে জয়লাভ করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। [৩২]

উপরিউক্ত আলোচনা প্রেক্ষিতে বলা যায়, যতদিন পর্যন্ত দেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে ইতিবাচক পরিবর্তন না আসবে ততদিন পর্যন্ত অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের স্বার্থে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাকে সক্রিয় রাখা যেতে পারে।

---

[৩২] আহমদ, এমাজউদ্দীন, ২০০১, নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে নিজস্ব পথে চলতে দিন, দৈনিক ইত্তেফাক, ২৪ সেপ্টেম্বর, পৃষ্ঠা ঃ ৫।

Dhaka University Institutional Repository

৫.৪ জোটের রাজনীতি ও বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি

জোটের রাজনীতি বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে অন্যতম স্থান দখল করে আছে। রাজনৈতিক কর্মকান্ডে জোট গঠনের প্রবণতা দক্ষিণ এশীয় রাষ্ট্রগুলোতে নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমান বাংলাদেশের রাজনীতিতে এ প্রবণতা ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। বাংলাদেশে রাজনৈতিক জোট গঠনের ইতিহাস নতুন কোন ঘটনা নয় বরং এ ইতিহাস অতি প্রাচীন। ব্রিটিশ শাসনামলেই এতদাঞ্চলে রাজনৈতিক জোট গঠনের সর্ব প্রথম সূত্রপাত ঘটে। তখন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এবং নিখিল ভারত মুসলিম লীগের ব্রিটিশ সরকার বিরোধী বিভিন্ন উদ্যোগ ও কর্মসূচি থেকেই রাজনৈতিক জোটের আবির্ভাব ঘটে। উদাহরণস্বরূপ, ১৯১৬ সালের 'লক্ষ্ণৌচুক্তি' এবং ১৯২৩ সালের 'বেঙ্গল প্যাকট' এর উল্লেখ করা যেতে পারে। তাছাড়া ১৯২০ সালের 'অসহযোগ আন্দোলন' এবং ১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড় আন্দোলনের' কথাও এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে। এসবগুলোই ছিল রাজনৈতিক আঁতাতস্বরূপ। পাকিস্তান আমলেও এ ধরণের রাজনৈতিক জোট গঠিত হয়েছে বিভিন্ন সময়ে। ১৯৫৪ সালের 'যুক্তফ্রন্ট' ১৯৬৫ সালে 'সম্মিলিত বিরোধী দল' ১৯৬৭ সালের 'পাকিস্তান গণতান্ত্রিক আন্দোলন' ১৯৬৯ সালের 'গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটি', ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা সংগ্রাম চলাকালে বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি প্রভৃতিও রাজনৈতিক জোটেরই পরিচয় বহন করে। প্রতিটি জোটেরই নিজস্ব কর্মসূচি ও আদর্শ ছিল এবং সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তে গঠিত হয়েছিল।

শুধু বাংলাদেশেই নয় ভারত, পাকিস্তান, মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার রাজনৈতিক দল সমূহের মধ্যে বহুবার জোট গঠিত হয়েছে। এ সকল জোটের অন্যতম লক্ষ্য থাকে সম্মিলিতভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহন করে নির্বাচনে সফল হওয়া। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় এ ধরনের স্থায়িত্ব থাকে নির্বাচনের আগপর্যন্ত। আবার অনেক ক্ষেত্রে কোন কোন জোট দীর্ঘদিন ধরে টিকে থাকে। কখনও কখনও দেখা যায় এ ধরনের জোটের রাজনীতি থেকে নতুন নতুন রাজনৈতিক দলের আবির্ভাব হয়। বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলের মধ্যে জোট গঠনের প্রবণতার যে বৈশিষ্ট্যগুলি সচারচার লক্ষ্য করা যায় তা থেকে দেখা যায় যে শুধুমাত্র নির্বাচন কেন্দ্রিক জোট নয় বরং কখনও কখনও ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের অহেতুক কর্তৃত্ববাদী আচরণ ও অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে ও রাজনৈতিক দলগুলো বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রাম পরিচালনার সুবিধার্থে জোটবদ্ধ হয়েছে। পাকিস্তানের ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের প্রাক্কালে আওয়ামী লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি, নিজাম-ই-ইসলাম, গণতন্ত্রী দল এবং আরও কতিপয় ক্ষুদ্র সংগঠনের সমন্বয়ে যুক্তফ্রন্ট নামে গঠিত হয় একটি রাজনৈতিক জোট। এ জোটের লক্ষ্য ছিল ক্ষমতাসীন মুসলিমলীগ সরকারের স্বৈরাচারী ও নিপীড়নমূলক

Dhaka University Institutional Repository

শাসনের হাত থেকে পূর্ববাংলার জনগণকে মুক্ত করে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের ভিত্তিতে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে জয়লাভ করা। এ জোটের মূল নেতৃত্বে ছিলেন শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী। পূর্ব বাংলার শ্রমিক, কৃষক, চাকুরিজীবী, ব্যবসায়ী, বুদ্ধিজীবী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী তথা আপামর জনগণ তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানের সর্ববৃহৎ ও রাজনৈতিক জোটের কর্মসূচীর প্রতি একাত্মতা ঘোষণা করে ফলশ্রুতিতে ১৯৫৪ সালের পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে বিপুল ভোটের ব্যাবধানে যুক্তফ্রন্ট জয়লাভ করে। এ নির্বাচনে জয়ের মধ্য দিয়ে এবং পূর্ববাংলার তিনজন রাজনীতিবিদদের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়ে পূর্ববাংলা অবশেষে পশ্চিম পাকিস্তানের দূর্বল অংশরূপে না থেকে এক বিরাট শক্তিতে পরিনত হয়।[৩৩] জোটবদ্ধ এ রাজনৈতিক বিজয় পূর্ববাংলাকে আরও সংগঠিত করে তুলেছিল এবং এর ফলে তাদের মধ্যে সংসদীয় রাজনৈতিক আদর্শের প্রতি দূর্বলতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে। পরবর্তীতে এ ধরণের জোট গঠনের প্রতি পূর্ব বাংলার জনগণ ও নেতৃত্বের আস্থাশীলতাও বেড়ে যায়। যার প্রভাব আমরা লক্ষ্য করেছি ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামীলীগের অভুতপূর্ব বিজয়ে। তবে স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলসমূহ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লক্ষ্য এবং বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে জোটবদ্ধ হয়েছে। এসব রাজনৈতিক জোট কখনও কখনও নির্বাচনের পূর্বে আবার কখনও কখনও নির্বাচনোত্তর সময়ে সরকার গঠনের প্রয়োজনে জোট গঠন করেছে। স্বাধীনতার অব্যবহিত পর সমগ্র দেশে আওয়ামী লীগের কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। সে সময় ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের বিরোধিতা করার মত কান বিরোধী দল কিংবা গোষ্ঠী ছিল না বললেই চলে। একমাত্র মাওলানা ভাসানী মাঝে মধ্যে সরকার বিরোধী বক্তব্য রাখতেন। ক্রমে এ বিরোধিতা এক সুনির্দিষ্ট রূপ লাভ করে যখন মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে একটি ৭ দলীয় ঐক্য জোট গঠিত হয় ১৯৭২ সালের ডিসেম্বর মাসে। কাজেই বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর মাওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগ সরকারের প্রতি সমর্থন জানালেও সে সমর্থন ছিল নিত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। এর ফলশ্রুতিতেই গঠিত হয়েছিল ৭ দলীয় ঐক্য জোট। মাওলানা ভাসানী এ জোটের সভাপতি ছিলেন।

১৯৭৩ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয়ের পর ন্যাপ (মোজাফফর) ও কমিউনিস্ট পার্টি কতকগুলো মৌলিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য আওয়ামী লীগের সাথে জোটবদ্ধভাবে কাজ করতে অগ্রসর হয়। অতঃপর এ সালেরই সেপ্টেম্বর মাসে আওয়ামী লীগ, ন্যাপ (মোজাফফর) ও কমিউনিস্ট পার্টির সমন্বয়ে ত্রিদলীয় ঐক্য জোট গঠিত হয়।

---

[৩৩], The World Today, Voll. 11, no.1, January, 1955, P.42.

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭৩ সালে বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ওই নির্বাচনে ইসলামিক দলগুলো কোনো আসন পায়নি। বাম দলগুলোর মধ্যে ন্যাপ (মোঃ), ন্যাপ (ভাসানী) ও জাসদ ১টি করে আসন পেয়েছিল। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সর্বাধিক ২৯২টি আসন (মোট ভোটের শতকরা ৭৩ দশমিক ২০) পেয়ে সরকার গঠন করে। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের একক কর্তৃত্ব ও প্রভাবের কারণে অন্য দলগুলো একাকার হয়ে গিয়েছিল। ওই সময় অন্যতম বিরোধীদল হিসেবে জাসদের আবির্ভাব ঘটলেও সংসদ নির্বাচনে জাসদ কোন বড় আবেদন সৃষ্টি করতে পারেনি। ১৯৭৯ সালে দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে বাংলাদেশের রাজনীতিতে সদ্য গঠিত জাতীয়তাবাদী চেতনার দল বি এন পি যদিও সর্বাধিক ২০৭টি আসন পেয়ে বিজয়ী হয় তথাপি ইসলামিক ডেমোক্রেটিস লীগ ও মুসলিম লীগ একসঙ্গে জোটবদ্ধ নির্বাচন করে ২০টি আসন লাভ করে। আওয়ামী লীগ (মালেক) ৩৯টি ও মিজান গ্রুপ ২টি ও স্বতন্ত্র সদস্যরা ১৬টি আসন পেয়েছিল। ১৯৮৬ সালের নির্বাচনে পাঁচদলীয় বাম জোট নির্বাচন বয়কট করে। নবগঠিত জাতীয় পার্টি পায় ১৫৩টি আসন (৪২.৩৪% ভোট), আওয়ামী লীগ ৭৬টি (২৬.১৬% ভোট), জামায়াত ইসলামী ১০টি (৪.৬১% ভোট), মুসলিম লীগ ৪টি (১.৪৫% ভোট), সিপিবি ৫টি (০.৯১% ভোট), ন্যাপ (মোঃ) ৫টি (১.২৯% ভোট), জাসদ(রব) ৪টি (২.৫৪% ভোট), অন্যান্য দল ১১টি (৪.৫১% ভোট) এবং স্বতন্ত্র ৩২টি (১৬.১৯% ভোট) আসন পায়। চতুর্থ সংসদ নির্বাচনে দুটি বড় দল বিএনপি ও আওয়ামী লীগ অংশ নেয়নি। যে কারণে এ নির্বাচন কোনো গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। ওই নির্বাচনে জাতীয় পার্টি পেয়েছিল ২৫১টি আসন, আর কমবাইন্ড অপজিশন পার্টি বা 'কপ'(আ.স.ম আবদুর রবের নেতৃত্বে) পেয়েছিল মাত্র ১৯টি আসন। ১৯৭৮ সালের ২১শে এপ্রিল রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করেন যে, দেশে ৩রা জুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং ১লা মে থেকে প্রকাশ্য রাজনীতি শুরু করার অধিকার দেয়া হবে। ৩রা জুন অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আবার জোট রাজনীতি শুরু হয়। একদিকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য ৫টি বিরোধী রাজনৈতিক দল ও কতিপয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব নিয়ে 'গণতান্ত্রিক ঐক্য জোট' গঠন করা হয়। এ ঐক্য জোটভুক্ত দলগুলো হচ্ছে : আওয়ামী লীগ, জাতীয় জনতা পার্টি, গণআজাদী লীগ, ন্যাপ (মোজাফফর), পিপলস্ লীগ।

পক্ষান্তরে, ৬টি দল চেয়ারম্যান হিসেবে রাষ্ট্রপতি জিয়াকে মনোনীত করে 'জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট' নামে নির্বাচনী আঁতাত গঠন করে। জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টের পক্ষে মনোনীত প্রার্থী হিসেবে জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রপতি পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টভুক্ত দলগুলো ছিল: জাগদল, মুসলিম লীগ, ন্যাপ (ভাসানী), ইউনাইটেড পিপলস্ পার্টি, বাংলাদেশ লেবার পার্টি ও বাংলাদেশ তকসিলী সম্প্রদায় ফেডারেশন।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭৯ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারির সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আবার জোটবদ্ধ আন্দোলনের তৎপরতা লক্ষণীয়। স্বল্প সময়ে সামরিক আইনের আওতায় নির্বাচন অনুষ্ঠানকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল প্রহসন হিসেবে গণ্য করে নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত নেয় এবং এ উদ্দেশ্যে দশটি রাজনৈতিক দল ঐক্যবদ্ধ হয়। এ দলগুলো ছিল: বাংলাদেশ জাতীয় লীগ, জাতীয় জনতা পার্টি, গণআজাদী লীগ, ডেমোক্রেটিক লীগ, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল, ইউনাইটেড পিপলস্ পার্টি, ন্যাশনাল ফ্রন্ট ফর ডেমোক্রেসি, গণতান্ত্রিক আন্দোলন, ন্যাপ (নাসের) ও শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল।

এরশাদ সরকারের পতন ঘটানোর লক্ষ্যে আন্দোলনকে সুতীব্র করার জন্য আওয়ামী লীগ কর্তৃক সমমনা দলগুলোকে নিয়ে ১৯৮৩ সালের ১৫ই জানুয়ারি একটি যুক্ত বিবৃতি দানের মধ্য দিয়ে জোট গঠন করে। এ জোট বাংলাদেশের রাজনীতিতে ১৫ দলীয় জোট নামে অভিহিত। ১৫ দলীয় জোটের নেত্রী মনোনীত হন শেখ হাসিনা। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ১৫ দলীয় জোটের শরীক দলগুলো হলো: জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ), ওয়ার্কাস পার্টি, শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল, বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ), আওয়ামী লীগ (হাসিনা), সাম্যবাদী দল (তোয়াহা), বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগ, ন্যাপ (মোজাফফর), সি.পি.বি, মজদুর পার্টি, ন্যাপ (হারুন), ন্যাপ (পংকজ), আওয়ামী লীগ মিজান, গণআজাদী লীগ, সাম্যবাদী দল (নগেন), অন্যদিকে বি.এন.পি. একই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সমমনা দলসমূহ নিয়ে নেত্রী হিসেবে বেগম খালেদা জিয়াকে মনোনীত করে অপর একটি জোট গঠন করে। এ জোট বাংলাদেশের রাজনীতিতে ৭ দলীয় জোট নামে পরিচিত। ৭ দলীয় জোটের অঙ্গীভূত দলগুলো হলো: বি.এন.পি, জাতীয় লীগ, ইউনাইটেড পিপলস্ পার্টি, কমিউনিস্ট লীগ, কে.এস.পি, গণতান্ত্রিক পার্টি, ন্যাশনাল আওয়ামী লীগ। ১৯৯০ সালের গণঅভ্যুত্থানে এরশাদের পতন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে সম্পূর্ণ বদলে দেয়। ১৯৯১ সালে অনুষ্ঠিত হয় ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন। ওই নির্বাচনে বিএনপি ১৪০টি আসনে বিজয়ী হয় (৩০.৮১% ভোট)। এ নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা ছিল ব্যাপক। আওয়ামী লীগ দ্বিতীয় অবস্থানে ছিল ৮৮টি আসন নিয়ে (৩০.০৮% ভোট)। জাতীয় পার্টি ৩৫টি আসন পেয়ে তৃতীয় অবস্থানে থাকে (১১.৯২% ভোট)। জামায়াতে ইসলামী পায় ১৮টি আসন (১২.১৩% ভোট), বাকশাল ৫টি (১.৮১% ভোট), সিপিবি ৫ (১.১৯% ভোট), অন্যান্য দল ৬ (৭.৬৭% ভোট) ও স্বতন্ত্ররা ৩ টি (৪.৩৯% ভোট) আসন পায়। উল্লেখ্য এই নির্বাচনে সিপিবির সদস্যদের কেউ কেউ নৌকা মার্কা নিয়ে নির্বাচনে অংশ নিয়েছিল এবং সেখানে তারা বিজয়ী হয়েছেন। আওয়ামী লীগ ওইসব আসনে প্রার্থী দেয়নি। ওই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ৩৬টি আসন ছেড়ে দিয়েছিল তাদের বাম

Dhaka University Institutional Repository

মিত্রদের। এর মধ্যে ৯টি দেয়া হয়েছিল সিপিবিকে। পরে নির্বাচিত ৫ জন সি পি বি এমপির কেউ আওয়ামী লীগে, কেউ বিএনপিতে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯৯১ সালে সিপিবি অবশ্য নৌকা প্রতীক ছাড়াও আরো ৪০ আসেন কাস্তে -হাতুড়ী নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। এর মধ্যে ৩৯ জনই জামানত খোয়ান। ১৯৯৬ সালে ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও তা ছিল নিয়মমাফিক। আওয়ামী লীগ ওই নির্বাচনে অংশ নেয়নি। সংসদ বসেছিল মাত্র কয়েকদিনের জন্য। এবং ওই সংসদেরই তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সংবলিত সংবিধানের ১৩তম সংশোধনী পাস হয়। ৭ম জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯৬ সালে। ওই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিজয়ী হয়ে বাংলাদেশের ইতিহাসে দ্বিতীয়বারের মতো সরকার গঠন করে। এই নির্বাচনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আওয়ামী লীগ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে সমঝোতা করে একটি 'ঐকমত্যের সরকার' গঠন করে। এই ঐকমত্যের সরকারকে আওয়ামী লীগ কখনো কোয়ালিশন সরকার বলেনি। ঐকমত্যের সরকারে যোগ দিয়ছিলেন আ.স.ম আবদুর রব ও আনোয়ার হোসেন মঞ্জু (জাপা)।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে জোট গঠনের এ প্রবণতা অনেকটা উত্তরাধিকারভিত্তিক। স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে জোট গঠনের অন্যতম কারণ ক্ষমতাসীন সরকারের স্বৈরাচারমূলক শাসনের হাত থেকে মুক্ত হওয়ার লক্ষ্যে নির্বাচনকে সামনে রেখে জোটবদ্ধ হওয়া। জেনারেল এরশাদ সরকারের আমলে বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামে এদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বহুবার জোটবদ্ধ হয়েছে। মূলত এ সময়ই বাংলাদেশের রাজনীতিতে জোট গঠনের প্রবণতা অনেকটা শক্তিশালী হয়েছে। এরপর '৯০ এর পরবর্তী রাজনীতিতে রাজনৈতিক জোটের আবির্ভাব হয় নতুন প্রেরণা ও উদ্দীপনার সাথে। ১৯৯৬-২০০১ সালের আওয়ামী লীগের শাসনামলে ১৯৯৯ সালের নভেম্বর মাসে প্রধান বিরোধী দল বি এন পি'র নেতৃত্বে আরো তিনটি দল (জামায়েত ইসলামী বাংলাদেশ, জাতীয় পার্টি, ইসলামী ঐক্যজোট) একত্রিত হয়ে চারদলীয় ঐক্যজোট গঠন করে[৩৪]। ঠিক একইভাবে চারদলীয় জোটের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দী শক্তি হিসাবে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে অন্যান্য ১৩টি শরীক দলসহ নতুন রাজনৈতিক জোট ১৪ দলের নেতৃত্বে মহাজোট নামে ২০০৮ সালের নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দিতা করে জয়লাভ করে।

[৩৪] আখতার, ড. মুহাম্মদ ইয়াহিয়া, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮।

Dhaka University Institutional Repository

৫.৫ ছাত্র রাজনীতি, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি ও বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি

আমাদের এই উপমহাদেশের সকল আন্দোলন, সংগ্রাম ও রাজনৈতিক ইতিহাসের অধিকাংশই ছাত্র রাজনীতির ইতিহাস। ছাত্র রাজনীতির এ অতীত ইতিহাস যেমন সুদীর্ঘ তেমনি গৌরবময়। বৃটিশ শাসনামলে ভারতীয় উপমহাদেশের উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক পট পরিবর্তনেও ছাত্র রাজনীতির ব্যাপক ভূমিকার নিদর্শন রয়েছে। ভারতীয় উপমহাদেশে কখন থেকে ছাত্র রাজনীতি শুরু হয় তার সঠিক ইতিহাস জানা না থাকলেও উনবিংশ শতাব্দীতে ফরাসি বিপ্লবের সাফল্য যখন ইংরেজ-শাসিত ভারতেও আসতে আরম্ভ করে সে সময়ে ১৮৩০ সালের ছোট্ট একটি ঘটনা তৎকালীন ছাত্র রাজনীতির তৎপরতা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা দিতে সক্ষম হবে। ইংরেজরা কলকাতার মধ্যস্থলে একটি উঁচু স্তম্ভ তৈরি করে যার নাম অক্টোরলনি মনুমেন্ট। তার ওপর ইংরেজ শাসনের নিদর্শন স্বরূপ ইউনিয়ন জ্যাক উড়িয়ে দেয় ইংরেজ বেনিয়ারা। তার ছদ্মবেশ তখনও খসে পড়েনি। তার মানদণ্ড তখনও রাজদণ্ড হয়ে দেখা দেয়নি। কলকাতার কয়েকজন ছাত্র গভীর রাতে ইউনিয়ন জ্যাক নামিয়ে সেখানে ওড়ায় ফরাসি সাম্য, মৈত্রী এবং স্বাধীনতার তিন রঙের পতাকা।[৩৫] ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রতিবাদেও ছাত্ররা রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করে। স্বদেশী আন্দোলনের সময় বিদেশী পণ্য বর্জন করার জন্য ছাত্ররা আন্দোলন করে এবং ১৯০৫ সালে হিন্দু কলেজে অ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটি নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলে। ১৯২০ সালের অসহযোগ আন্দোলনের শুরুতেই ছাত্ররা রাস্তায় নেমে আন্দোলন এবং ধর্মঘটের ডাক দেয় ও মিছিল মিটিং করে।

এই উপমহাদেশে রাজনীতিতে বা রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে ছাত্র রাজনীতি বা আন্দোলনের ইতিহাস সুদীর্ঘ এবং ঐতিহ্যবাহী গৌরবময়। জাতির যে কোনো ক্রান্তিলগ্নে ছাত্র সমাজ বীরদর্পে এগিয়ে এসেছে সমস্যার সমাধানে এবং জাতিকে এগিয়ে নেবার পথ দেখাতে। এ দেশে ছাত্র রাজনীতির অতীত ভূমিকা, বিশেষ করে আমাদের রাষ্ট্রীয় সত্তার উত্তরণে ও স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে সংশ্লিষ্টতাকে প্রায় সবাই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করে।[৩৬] ১৯২৮ সালে সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে হরতাল এবং ছাত্রদের ওপর পুলিশের লাঠিচার্জ এবং তার প্রতিবাদে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন এবং প্রথম ছাত্রীদের আন্দোলনে যোগদান ইত্যাদি ছিল ছাত্র রাজনীতির ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ১৯০৫ সালে কলকাতায় গঠিত হয় বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্রলীগ। ১৯৩৭ সালে ডিসেম্বরে ছাত্র ফেডারেশন নতুন গঠনতন্ত্র তৈরি করে নতুন কর্মসূচী দেয়। ১৯৪০ সালে মুসলিম ছাত্রলীগ গঠিত হয় এবং এবং তারা পাকিস্তান আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ১৯৪৮ সালে ভাষা আন্দোলনকে ছাত্ররাই রাজনীতিকরণ করে। '৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে ছাত্রদের ভূমিকা ছাত্র আন্দোলনকে গৌরবের শীর্ষে উপনীত করে। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খানের স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে, ১৯৬৬ সালে ছয় দফা

---

[৩৫] সোবহান, কে এম, ২০০২, নষ্ট রাজনীতির শিকার, দৈনিক ইত্তেফাক, ৭ জানুয়ারি, পৃষ্ঠা ঃ ৫।
[৩৬], প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

আন্দোলনে, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে এবং ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে শুরু করে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে নানা স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ছাত্র রাজনীতির অতীত ইতিহাসকে ব্যাপক শক্তিশালী করেছে।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস তৎকালীন ছাত্রদের রাজনৈতিক ভূমিকায় মুগ্ধ হয়ে আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বলেছিলেন, "বাংলার ছাত্রসমাজ, আমি তোমাদের নমস্কার করি"। গান্ধিজি বলেছিলেন, "বাংলার ছাত্রসমাজই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেবে এ বিষয়ে মনে কোনো সন্দেহ নেই"।[৩৭] তবে বাংলাদেশের ছাত্র রাজনীতি অতীত ঐতিহ্যের সাথে তাল মিলিয়ে জাতির আশা পূরণে ব্যর্থ হয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা উত্তর ছাত্র রাজনীতির ইতিহাস দুর্ভাগ্য বশত অতি শোচনীয় রূপ ধারণ করেছে। স্বাধীনতা লাভের পর যে অর্থনৈতিক মুক্তি ও সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠার আশা ছিল, জনগণ তা পায়নি। এর কারণ বহুবিধ এবং নানাজন এ বিষয়ে নানা কারণ দর্শায়। এই সময়ে ছাত্রসমাজের এক বিশেষ অংশের ভূমিকা দুর্ভাগ্যবশত হয়ে যায় বিতর্কিত। সকলেই আশা করেছিল যে, স্বাধীনতা লাভের পর দেশের ছাত্রসমাজ মন, প্রাণ ও সময় তাদের প্রয়োজনীয় পড়াশোনার ওপর ব্যয় করবে।[৩৮] জনগণের সাধারণ ও স্বাভাবিক ইচ্ছা ছাত্রসমাজ যথাযথ শিক্ষাদীক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিজেদেরকে ভবিষ্যতে জাতির আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলবে এবং রাজনীতি ছাড়াও শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে নেতৃত্ব দেয়ার যোগ্যতা অর্জন করবে। কিন্তু বাংলাদেশের বর্তমান ছাত্র রাজনীতির চিত্র একেবারেই ভিন্ন।

স্বাধীনতার পর থেকেই লক্ষ্য করা যায় রাজনৈতিক দলগুলো ছাত্রসমাজকে নিজদলীয় রাজনীতির অঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এর ফলে রাজনীতির দুষ্টচক্রে ছাত্র রাজনীতি জড়িয়ে পড়ে এবং জাতীয় রাজনীতিতে তারা যে ভূমিকা স্বাধীনতার পূর্বে রেখেছিল সেখান থেকে তাদের বিচ্যুতি ঘটে। ছাত্রসমাজ নানা খন্ডে বিভক্ত হওয়ার কারণে তারা ক্ষমতাসীন দলে এবং ক্ষমতার বলয়ে প্রবেশ করে। জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলোর নিজেদের দুর্বলতার কারণে ছাত্র রাজনীতিতে নিজদলীয় রাজনীতির প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়।[৩৯] বর্তমান সময়ে শিক্ষাঙ্গনসমূহে ছাত্র রাজনীতির নামে যে বীভৎস, সন্ত্রাসী, হানাহানি, চাঁদাবাজি, জবরদখল চলছে তা অবশ্যই ভয়াবহ আশঙ্কার কারণ এবং আমাদের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকেই স্থবির বিশৃঙ্খলাপূর্ণ এবং

৩৭, আলম, মো: ছামছুল,২০০৩, বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির একটি বিশ্লেষণ, পি এইচ ডি অভিসন্দর্ভ (অপ্রকাশিত), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৩৮ করিম, এম এম রেজাউল, বিগত দিনের ও বর্তমানের ছাত্র-সমাজের একটি সংক্ষিপ্ত সমীক্ষা, দৈনিক ইত্তেফাক, ২০ জানুয়ারি, ২০০২, পৃষ্ঠা ঃ ৫।

৩৯ সোবহান, কে এম, ২০০২, প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

প্রায় নিয়ন্ত্রণহীন করে তুলেছে। পত্রিকার পাতা খুললেই দেখা যায় দেশের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় প্রতিদিনই কোন না কোন বিশৃঙ্খলা লেগেই রয়েছে। অনেক উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ অথবা অচল হয়ে যায়। অনেক প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাস ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়। শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। সেশনজটের কালো থাবা বারবার তাদের ভবিষ্যৎ জীবনকে করে অনিশ্চিত। এভাবে দিনের পর দিন ছাত্র-ছাত্রীদের জীবন থেকে হারিয়ে যাচ্ছে মূল্যবাণ সময়। এসবই বর্তমান সময়ের ছাত্র রাজনীতির প্রভাব।

আমাদের জাতীয় ইতিহাসের সংকটকালে সমাজে অগ্রসর শ্রেণী হিসেবে ছাত্রদের গৌরবময় সব ভূমিকা সত্ত্বেও বিশেষভাবে নব্বইয়ের দশকের শুরুতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্র নামধারী ছাত্র-অছাত্র নেতাদের দৌরাত্ম, টেন্ডারবাজি সন্ত্রাস, নারীঘটিত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ও অন্তর্দলীয় হানাহানি অভাবনীয় মাত্রা পেয়ে যায়। সে সময়কালে প্রায় সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে বিরোধী মতের ছাত্রনেতা ও সমর্থকবৃন্দ বিতাড়িত হয়।[৪০] ছাত্রাবাসে এবং ক্যাম্পাসে মিছিল, মিটিং, শোভাযাত্রায় চলে অস্ত্রের প্রকাশ্য মহড়া। বিরোধীদলীয়দের সঙ্গে এবং নিজেদের দলীয় অন্তকোন্দলে দিবালোকে প্রকাশ্য অস্ত্রের ব্যবহারে ক্যাম্পাসগুলোতে প্রতিনিয়ত ছাত্র/ছাত্রী খুন, জখম অথবা মারাত্মকভাবে আহত হচ্ছে। ছাত্ররা নিজেদের স্বার্থের কথা ভুলে গিয়ে পৃষ্ঠপোষক বড় বড় রাজনৈতিক দলগুলোর স্বার্থ রক্ষার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠছে।

ছাত্র রাজনীতিতে জাতীয় রাজনীতি বা দলীয় রাজনীতির লেজুড়বৃত্তি এবং তার প্রভাব এমনই মাত্রায় উঠেছে যে, নেতা-নেত্রী হিসেবে তারা তেমনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তথা সমাজের স্বার্থ না দেখে শুধু নিজেদের অর্জন বা স্বার্থটাই বড় করে দেখছেন। বাংলাদেশের মতো দরিদ্র দেশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর খানিকটা বেশী দায়িত্ব আছে, সেটি হলো জ্ঞানের জন্য জ্ঞান সৃষ্টি নয়, বরং এ দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর তথা দরিদ্র ও ভাগ্যাহত জনগোষ্ঠীর কল্যাণের জন্য জ্ঞান সৃষ্টি করা। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আজ এই লক্ষ্য পূরণে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য বছরে কয়েকশত কোটি টাকা ব্যয় হয় এবং এই টাকা এ দেশের জনগণের টাকা। অথচ বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর স্বার্থে, তাদের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আজ তেমন কোনো অবদান রাখতে পারছে না। এমনকি জ্ঞান আহরণ

[৪০] মোহন, ড. শামসুল আলম, শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র-রাজনীতির নামে লেজুড়বৃত্তি চলতে দেয়া যায় না, দৈনিক ইত্তেফাক, ২৮ ডিসেম্বর ২০০১।

Dhaka University Institutional Repository

এবং বিতরণের যে কাজ, স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার যে কাজ তা বিঘ্নিত হচ্ছে, বাধাগ্রস্ত হচ্ছে এবং কোথাও কোথাও কখনও কখনও এই স্বাভাবিক শিক্ষা কর্মকান্ড সম্পূর্ণভাবে বিকল হচ্ছে।[৪১]

এ প্রসংগে বদরুদ্দিন ওমর বলেন, "আমাদের দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাসে ছাত্র রাজনীতির ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ এবং এ রাজনীতির ঐতিহ্য গৌরবজনক। বৃটিশ ও পাকিস্তানী আমলে ছাত্র রাজনীতি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে যেভাবে সম্পর্কিত ছিল সেদিকে তাকালেই এটা বোঝার অসুবিধা হয়না। এদিক দিয়ে বাংলাদেশ আমলে ছাত্র রাজনীতির চরিত্র এবং ভূমিকা অন্যরকম। ছাত্র সংগঠনগুলি রাজনৈতিক লেঠেল বাহিনী হিসেবে দুর্বৃত্তসুলভ তৎপরতার মাধ্যমে এদেশে ছাত্র রাজনীতির গৌরবতো ক্ষুন্ন করেছেই, উপরন্ত বলা চলে এরা এখানকার ছাত্র রাজনীতির গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যকে কলঙ্কিত করেছে।"[৪২] ছাত্র রাজনীতির আবরণে আজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে অনাচার, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, খুন জখম হচ্ছে তা কখনও দেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে না। রাজনীতির নামে চলছে অপ-রাজনীতি। আর এর পিছনে মদদদাতা হলো দেশের রাজনৈতিক দুবৃত্তায়ণের সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু স্বার্থান্বেষী মহল।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী একদিকে যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষপাতদুষ্ট প্রশাসন সীমাহীন দলীয়করণ ও দুর্নীতি; অন্যদিকে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের জন্য ছাত্র সংগঠনগুলোর ছত্রছায়ায় প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে সন্ত্রাস ও সংঘর্ষের ঘটনা। বিগত সরকারগুলোর আমলে দেশের সব ক'টি বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকার দলীয় প্রশাসন কায়েম করা হয়েছিল। সম্পূর্ণ দলীয় বিবেচনায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উচ্চ পদে নিয়োগ দান করা হয়েছে; যোগ্যতার মাপকাঠিতে নয়। অতএব এই দলীয় প্রশাসন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পূর্ণভাবে দলীয়করণ করেছে। বাংলাদেশের অসহনীয় দুর্দশাগ্রস্ত রাজনৈতিক পরিবেশের সাথে ছাত্র রাজনীতির এহেন বৈশিষ্ট্যই দেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতির উন্নতি ও সংসদীয় গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি চর্চার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃস্টি করছে।

---

[৪১], প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ৫।

[৪২] খন্দকার, এ্যাড তৈমূর আলম, ২০০৪, দেশের বর্তমান হালচাল, আত্মপ্রকাশ, বাংলাবাজার, ঢাকা, পৃ ঃ ১৬১।

Dhaka University Institutional Repository

৫.৬ বাংলাদেশের রাজনীতিতে ব্যবসায়ী, সামরিক ও বেসামরিক আমলাদের প্রভাব

সুষ্ঠুভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করার জন্য দুটি বিষয়ের দিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হয়। এর মধ্যে প্রথমটি হল, যে কোন বিষয়ে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং দ্বিতীয়টি হল এই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে পরিকল্পনা গ্রহণ ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা। প্রথম কাজটি করেন দেশের রাজনীতিবিদরা এবং দ্বিতীয় কাজ অর্থাৎ পরিকল্পনা গ্রহণ ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের দায়িত্বটি মূলত প্রশাসনিক আমলাদের ওপর বর্তায়। আর এর কোন ব্যত্যয় ঘটলেই রাষ্ট্র পরিচালনা মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত হয়।

বর্তমান বাংলাদেশের রাজনীতি বা রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে একটি নতুন ধারা প্রবাহিত হচ্ছে। তা হলো জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাজনীতি অনভিজ্ঞ ব্যবসায়ী ও আমলাদের অতিমাত্রায় অংশগ্রহণ। '৯০ পরবর্তী জাতীয় নির্বাচনগুলি অর্থাৎ ১৯৯১, ১৯৯৬, ২০০১ এবং সর্বোপরি ২০০৮ সালের নির্বাচনের পরিসংখ্যানগুলি পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে, ১৯৯৬ সালের ১২ জুনের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জাতীয় পার্টি এই তিন প্রধান দলের মনোনীত প্রার্থী তালিকায় ৫১০টি নতুন মুখের সমাবেশ ঘটেছিল যারা কেউই '৯১ এর নির্বাচনে উল্লিখিত তিন দলের কোনটারই প্রার্থী ছিলেন না। '৯৬ এর নির্বাচনে এই তিন দল থেকে প্রায় ৬০ জন অবসরপ্রাপ্ত সামরিক ও বেসামরিক আমলা মনোনয়ন পেয়েছিলেন।[৪৩]

২০০১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল মনোনয়ন প্রার্থীর যে তালিকা প্রকাশ করেছিল, তা থেকে দেখা যায় যে, আওয়ামী লীগ, বিএনপির নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট ও জাতীয় পার্টির নেতৃত্বাধীন (এরশাদ) ইসলামী ঐক্যফ্রন্ট থেকে মনোনয়নপ্রাপ্ত প্রার্থীদের অধিকাংশই ছিলেন ব্যবসায়ী, অবসরপ্রাপ্ত সামরিক-বেসামরিক আমলাসহ অন্য পেশার লোকজন। যাদের অধিকাংশেরই রাজনীতিতে পূর্ব কোন অভিজ্ঞতা ছিল না।

পঞ্চম, সপ্তম ও অষ্টম জাতীয় সংসদে ব্যবসায়ী ছিলেন যথাক্রমে ৩৮.৬৭%, ৪৩.৬৭%, ৫৬.৬৭%। পেশাজীবী আমলা ছিলেন যথাক্রমে ১২%, ১৪% ও ১০.৬৭%। আইনজীবীদের হার হচ্ছে যথাক্রমে ১৯.৩৯%, ১৬.৬৭%, ও ১১%। সার্বক্ষণিক রাজনীতিবিদদের হার হচ্ছে যথাক্রমে ১৭.৬৭%, ৮.৬৬%, ও ৮.৬৬%। অবসরপ্রাপত সামরিক আমলা হচ্ছেন যথাক্রমে ৪%, ৫.৩৩%, ও ৫%। অবসরপ্রাপ্ত বেসামরিক আমলাদের পরিসংখ্যান ছিল এ রকম : ২.৩৩%, ১.৩৩% ও

---

[৪৩] সূত্র ঃ দৈনিক আজকের কাগজ, ১২ মে, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা-১।

Dhaka University Institutional Repository

৩%।[৪৪] এদের কারণে এসব রাজনৈতিক দলের কেন্দ্রীয় অনেক ত্যাগী নেতাকেও নির্বাচন থেকে সরে পড়তে হয়েছে।

সারণী ঃ ১২

পঞ্চম, সপ্তম, অষ্টম ও নবম জাতীয় সংসদে সদস্যদের পেশাগত অবস্থান

সংসদ	সামরিক আমলা	বেসামরিক আমলা	ব্যবসায়ী	আইনজীবী	রাজনীতিবিদ	অন্যান্য
৫ম সংসদ	৪%	২.৩৩%	৩৮.৬৭%	১৯.৩৩%	১৭.৬৭%	৬%
৭ম সংসদ	৫.৩৩%	১.৩৩%	৪৩.৬৭%	১৬.৬৭%	৮.৬৬%	১০.৩৩%
৮ম সংসদ	৫%	৩%	৫৬.৬৭%	১১%	৮.৬৬%	৫%
৯ম সংসদ	৬%	৪%	৫৭.৩৩%	১৪%	৪%	৪%

উৎসঃ আয়েফিন,এ কে এম শামছুল, বাংলাদেশের নির্বাচন, ১৯৭৩-২০০১, বাংলাদেশ রিসার্চ এ্যান্ডপাবলিকেসন্স, ২০০৩ ও Huq, Abul Fazl, The Ninth Parliament Election: A Socio-Political analysis, 2009 থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে গবেষক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত।

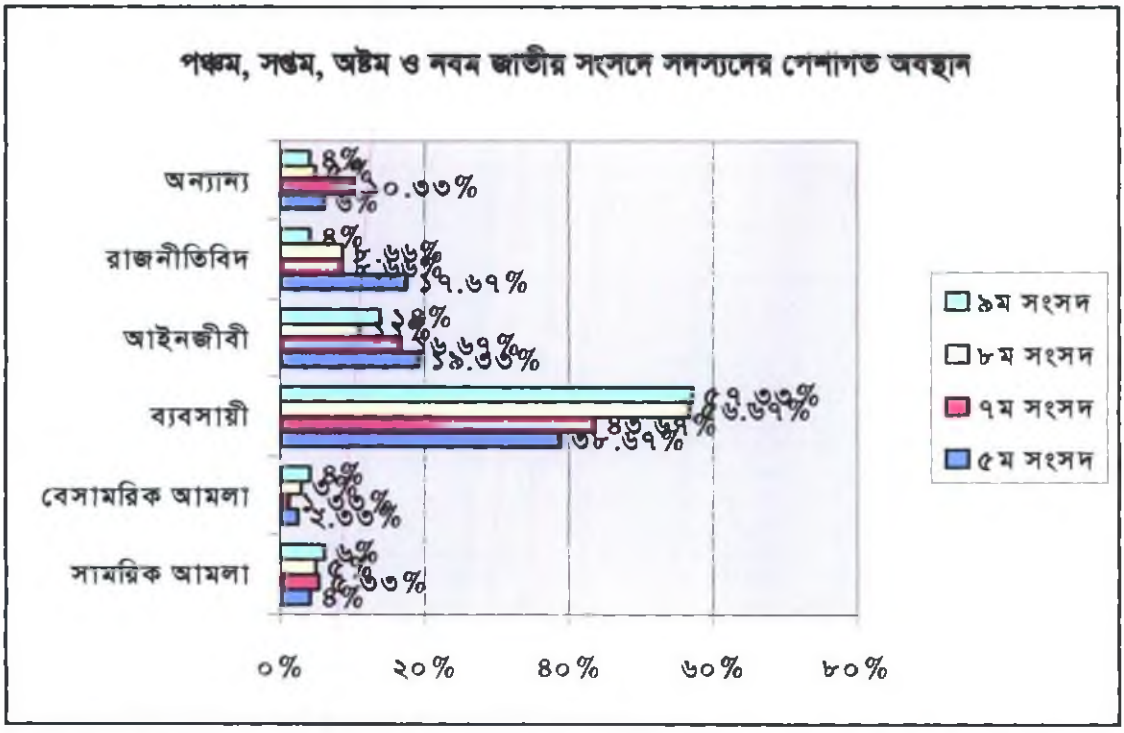

চিত্র : ৩, পঞ্চম, সপ্তম, অষ্টম ও নবম জাতীয় সংসদে সদস্যদের পেশাগত অবস্থান । উৎস ঃ আয়েফিন,এ কে এম শামছুল, বাংলাদেশের নির্বাচন, ১৯৭৩-২০০১, বাংলাদেশ রিসার্চ এ্যান্ড পাবলিকেসন্স,২০০৩ ও Huq, Abul Fazl, The Ninth Parliament Election: A Socio-Political analysis, 2009 থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে গবেষক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত।

[৪৪] সূত্র ঃ আয়েফিন, এ কে. এম. সামছুল, ২০০৩, বাংলাদেশের নির্বাচন, ১৯৭৩-২০০১, বাংলাদেশ রিসার্স এন্ড পাবলিকেশন্স, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

অতীতের মতো নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও ব্যবসায়ীরা এগিয়ে রয়েছেন। একটি পরিসংখ্যানে দেখা যায় নবম জাতীয় সংসদে নির্বাচিত প্রার্থীদের মধ্যে ব্যবসায়ী ৫৭%, আইনজীবী ১৪%, কৃষিজীবী ৭%, সামরিক আমলা ৬% এবং অন্যান্যরা ভিন্ন ভিন্ন পেশার সাথে সংশ্লিষ্ট।[৪৫] এখানে কৃষিজীবী ও সামরিক আমলাদের যে পরিসংখ্যান দেখা যাচ্ছে এরাও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন না কোনভাবে ব্যবসার সাথে সংশ্লিষ্ট।[৪৬]

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি জাতীয় নির্বাচনে নির্বাচিত প্রার্থীদের পরিসংখ্যানগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ মূলত ব্যবসায়ীদের সংগঠনে পরিনত হয়েছে। এ সকল ব্যবসায়ীদের অধিকাংশই কোটিপতি এবং এদের কারণেই টাকাই নির্বাচনের অন্যতম প্রধান নির্দেশক হিসেবে বিবেচিত হয়। সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন)'র একটি রিপোর্টে প্রকাশিত হয়েছে, এবার জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নির্বাচিতদের মধ্যে ব্যবসায়ী ১৬৯জন, এবং এদের মধ্যে কোটিপতি ১২৮ জন, পেশাদার রাজনীতিবিদ মাত্র ১০ জন।[৪৭] সম্প্রতি ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ একটি রিপোর্টে প্রকাশ করেছে যে, যেখানে একজন প্রার্থীর নির্বাচনী খরচ ১৫ লক্ষের বিধান রয়েছে সেখানে এবারের নির্বাচনে ৮৭% প্রার্থী গড়ে ৪৪ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছে। ব্যক্তিগতভাবে একজন প্রার্থী সর্বোচ্চ নির্বাচনী ব্যয় করেছে ২ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা। অবশিষ্ট ১৩% প্রার্থী যারা নির্ধারিত নির্বাচনী ব্যয়ের মাত্রা অতিক্রম করেনি তারা সকলেই পরাজিত হয়েছে।[৪৮]

অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাজনীতিবিদদের পরই দ্বিতীয় অবস্থানে ব্যবসায়ী, তৃতীয় অবস্থানে আইনজীবী, চতুর্থ অবস্থানে অবসরপ্রাপ্ত সামরিক ও বেসামরিক আমলারা ছিলেন। এক হিসাবে দেখা যায়, অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ, চারদলীয় জোট ও জাতীয় পার্টি (এরশাদ) নেতৃত্বাধীন ইসলামী জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের মনোনয়নপ্রাপ্ত ৮৮৮ জন প্রার্থীর মধ্যে রাজনীতিবিদ ৪৬৩ জন, ব্যবসায়ী ১৮৮ জন, আইনজীবী ৬ জন, অবসরপ্রাপ্ত সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তা ৫৬ জন, চিকিৎসক ২৯ জন, শিক্ষক ৪৬ জন, মহিলা ২২ জন, সাংবাদিক ৩ জন এবং অন্যান্য পেশার ২১ জন প্রার্থী ছিলেন। এ নির্বাচনে প্রধান দলগুলো থেকে বিশিষ্ট ব্যবসায়ীদের মধ্যে আওয়ামী লীগের

---

[৪৫] Huq, Abul Fazl, 2009, The Ninth Parliament Election: A Socio-Political analysis, Dhaka, P- 22.

[৪৬] প্রাগুক্ত।

[৪৭] দৈনিক প্রথম আলো, ২০০৯, ২ জানুয়ারি।

[৪৮] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

ইউসুফ আব্দুল্লাহ হারুন কুমিল্লা-৩, সালমান এফ রহমান, ঢাকা-১, নূর আলী, ঢাকা-২, আখতারুজ্জামান চৌধুরী বাবু, চট্টগ্রাম-১২, রফিকুল আনোয়ার, চট্টগ্রাম-৪, কাজী জাফর উল্যাহ্, ফরিদপুর-৫, বি এইচ হারুন, ঝালকাঠি-১, শেখ আফিল উদ্দীন, যশোর-১, সাজ্জাতুজ্জামান, ঝিনাইদহ-৩, মোঃ ওমর ফারুক চৌধুরী, রাজশাহী-১, ড. হামিদা বানু শোভা, নীলফামারী-১ এবং সামরিক ও বেসামরিক (অবঃ) আমলাদের মধ্যে শাহ এ এম এস কিবরিয়া, হবিগঞ্জ-৩, জেনারেল (অবঃ) মোস্তাফিজুর রহমান, রংপুর-৩, কর্ণেল এ এস সাকলান, নীলফামারী-৪, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অবঃ) মোঃ এনামুল হক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ-১, মেজর (অবঃ) মোহসিন শিকদার, বরিশাল-৪, ক্যাপ্টেন (অবঃ) মুজিবুর রহমান ফকির, ময়মনসিংহ-৩, কর্ণেল (অবঃ) মোঃ ফারুক খান, গোপালগঞ্জ-১, ড. মহীউদ্দীন খান আলমগীর চাঁদপুর-১ আসনে প্রার্থী হয়ে রাজনীতিবিদদের জায়গা দখল করেছিলেন। অনুরূপভাবে বিএনপিতে ব্যবসায়ী, সামরিক ও বেসামরিক এবং অন্যান্য পেশার লোকদের মধ্যে মোর্শেদ খান, চট্টগ্রাম-১০, এম এ হাসেম, নোয়াখালী-২, আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, চট্টগ্রাম-৮, জাফরুল ইসলাম চৌধুরী, চট্টগ্রাম-১৫, মোশারফ হোসেন, ফেনী-২, মেজর জেনারেল (অবঃ) আনোয়ারুল কবীর, জামালপুর-৪, মেজর (অবঃ) মঞ্জুর কাদের চৌধুরী, সিরাজগঞ্জ-৬, জেনারেল (অবঃ) মাহবুবুর রহমান, দিনাজপুর-২, একেএম মোশারফ হোসেন, ময়মনসিংহ-৫ এবং জাতীয় পার্টিতে মেজর জেনারেল (অবঃ) শামছুল ইসলাম, চাঁদপুর-২, আবুল কাশেম, টাঙ্গাইল-৫ আসনের প্রার্থী হয়েছিলেন।

১৯৯০ পরবর্তী সংসদীয় পুন:যাত্রায় যে নির্বাচনগুলি অনুষ্ঠিত হয়েছে এদের মধ্যে ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ছাড়া অন্যান্য নির্বাচনগুলি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হওয়ায় সেগুলি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ বলে সকলের কাছে বিবেচিত হয়েছে। তবে পাশাপাশি এসকল নির্বাচনী পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে ব্যবসায়ী, সামরিক ও বেসামরিক আমলাদের প্রভাবও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর এ কারণে এই সকল রাজনীতিতে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ, অবৈধ টাকার মালিক, শিল্পপতি, সামরিক ও বেসামরিক আমলাদের মাত্রাতিরিক্ত অংশগ্রহণে বাংলাদেশের সুষ্ঠু রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক কাঠামো পথে অন্তরায় হয়ে দাড়িয়েছে।

তাছাড়া ব্যবসায়ী, সামরিক ও বেসামরিক আমলাদের দ্বারা রাজনীতিবিদদের জায়গা অব্যাহত ভাবে দখল হয়ে যাওয়ার কারণে প্রতিটি রাজনৈতিক দলে ক্ষোভ ও বিক্ষোভ দিন দিন বেড়েই চলেছে। যার প্রতিক্রিয়া দেখা যায় প্রতিটি নির্বাচনের প্রাক্কালে মনোনয়ন ঘোষণার পর । সারা দেশে মনোনয়ন না পেয়ে বিদ্রোহী প্রার্থীরা হরতাল, অবরোধসহ বিভিন্ন হিংসাত্মক কর্মসূচী পালন করে।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে আমলাদের রাজনীতিতে টেনে আনার প্রক্রিয়া শুরু করেছিল স্বৈরশাসকরা। অবৈধভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের প্রক্রিয়াকে গ্রহণযোগ্য করার জন্য তারা যে তথাকথিত গণতান্ত্রিক রাজনীতি শুরু করে তা সফল করার জন্যই আমলাদের প্রয়োজন হয়েছিল। বিশেষ করে অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল প্রক্রিয়ার সাথে যেসব আমলা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন তাদের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করবার জন্যও আমলাদের রাজনীতিতে পূনর্বাসিত করা হয়। অনেক আমলা আবার স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করে রাজনীতিতে ঢুকে পড়েন অধিক ক্ষমতা ও মর্যাদা লাভের আশায়। একজন নিবেদিত আদর্শবান রাজনীতিতবিদ এবং একজন দক্ষ, শিক্ষিত, সুশৃঙ্খল আমলার জীবন-পদ্ধতি, ক্রিয়াকর্ম ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তুলনামূলকভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, এই দুই ব্যক্তির ভিতর মিলের চেয়ে গরমিলই বেশি। ত্যাগ-তিতিক্ষা, গণমুখী-নেতা ও চরিত্রের দৃঢ়তায় একজন রাজনৈতিক কর্মী একজন দক্ষ, শিক্ষিত, নিয়মতান্ত্রিককতায় বিশ্বাসী আমলার চাইতে অনেক বেশি অগ্রসরমান বলেই মনে হয়। এমন অনেক আমলা আছেন যারা সামরিক শাসনামলে অবৈধ ক্ষমতার অংশীদারিত্ব পেয়ে নিজেদেরকেই শুধু শক্তিশালী বলে মনে করেননি, অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে সে ক্ষমতার অপব্যবহারও করেছেন। যাদের জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হওয়ার যোগ্যতা ছিল না তারা স্বৈরশাসকদের সমর্থনে মন্ত্রী হয়েছেন এ রূপ উদাহরণ অনেক আছে।[৪৯]

রাজনীতিতে যে ত্যাগ-তিতিক্ষার প্রয়োজন তা ব্যবসায়ী কিংবা আমলা কেউই করতে প্রস্তুত নন। সাইনবোর্ডসর্বস্ব রাজনৈতিক দলের নামে কোন প্রকার নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রেখে স্বৈরশাসকদের সুবাদে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অংশীদারিত্ব লাভ করে অবাধ লুটপাটের মাধ্যমে রাতারাতি ভাগ্যের পরিবর্তন করাই হচ্ছে এই সব তথাকথিত আমলাদের মূল লক্ষ্য। পাশাপাশি বহু টাকার মালিক ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে অর্থনৈতিক সাহায্য দিয়ে সেখানে তাদের অবস্থানকে দৃঢ় ও পাকাপোক্ত করে নেন। এরপর এরা নিজেদের পোশাক-আশাকের আমূল পরিবর্তন করে মিটিং-মিছিলের অগ্রভাগে অবস্থান নিয়ে দক্ষ রাজনীতিবিদ হিসেবে তাদের যোগ্যতা প্রমাণের চেষ্টা করেন। অতীত অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়েছে যে, এদেশে যখনই গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে তখনই আমলারা তার বিরোধিতা করেছেন, জনপ্রতিনিধিদের দায়িত্ব পালনের পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছেন। প্রয়োজন ও সুযোগ বুঝে

---

৪৯ মালেক, ডা. এস.এ, ২০০৬, বাংলাদেশ রাষ্ট্র সমাজ রাজনীতি, হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

রাজনীতিবিদদের হটিয়ে স্বৈরশাসকের হাত পাকাপোক্ত করতেও তারা দ্বিধাবোধ করেননি। যে সকল আমলা সাংসদদের কাজে বাঁধা সৃষ্টি করেন, মন্ত্রীদের ফাইল আটকে রাখেন, প্রশাসনকে স্থবির করে উন্নয়ন প্রক্রিয়া ব্যাহত করেন, নির্বাচিত সরকারকে অপদস্থ করেন সে সকল আমলারা যখন রাজনীতিতে প্রবেশ করেন তখন তাদের দ্বারা পরিচালিত রাজনীতি ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি কতটুকু উন্নত হতে পারে তা সহজে অনুমেয়। একই অভিযোগ ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধেও। ব্যবসায়ীরাও রাজনীতি করেন নিছক নিজেদের স্বার্থে, রাজনৈতিক ক্ষমতাকে তারা ব্যবসায়িক স্বার্থেই ব্যবহার করে থাকেন। আর এ কারণে দ্রব্য মূল্যের উর্ধ্বগতিতে যখন দেশের সাধারণ মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়ে তখনও তাদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনাবোধটুকু বিন্দুমাত্র কাজ করেনা। এমন অবস্থা মোকাবেলায় এই সকল তথাকথিত ব্যবসায়ী রাজনীতিবিদদের নেই কোন দায়িত্ববোধ, থাকেনা কোন ভূমিকা , কোন গঠনমূলক উদ্যোগ। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সংসদ সদস্যের পদটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও দায়িত্বশীল। সংসদীয় পদ্ধতির সরকারে এ পদের ক্ষমতা ও প্রভাব থাকে লক্ষ্যণীয়। তাই এ পদ লাভে আগ্রহ থাকে অনেকেরই। বাংলাদেশে প্রত্যক্ষ ভোটে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার ফলে সংসদ সদস্য কোন না কোন রাজনৈতিক দলের থেকে নির্বাচিত হন কিন্তু দুঃখজনক হলেও বাস্তবে রাজনৈতিক দলগুলো প্রার্থী মনোনয়নের সময় প্রার্থীর রাজনৈতিক আদর্শ, ত্যাগ, ব্যক্তিগত চরিত্র, সততা, দেশ ও জনগণের প্রতি ভালবাসা, নৈতিকতা ইত্যাদি গুণাবলী কে বিবেচনা করা হয় না । এজন্য দুর্বৃত্ত ও দুর্নীতিপরায়ণরা নতুন আদলে রাজনীতি করার সুযোগ পায়, নতুন করে ক্ষমতার স্বপ্ন দেখে এবং টাকার জোরে ক্ষমতায় যায়। এসব ক্ষমতালোভী আমলা ও ব্যবসায়ীরা অবৈধভাবে উপার্জিত অর্থে সামাজিক, শিক্ষা ও চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান তৈরী করেন, পত্রিকার মালিক হন কিংবা সম্পাদক হন। আরও স্বার্থ লাভের আশায় রাজনৈতিক দলে মোটা অংকের চাঁদা দিয়ে ক্ষমতা ধরার সব ব্যবস্থা পাকা করেন। এরা যখন ধরা পড়েন তখনও বড় গলায় বলেন- এসব দুর্নীতি তো সমাজের, দলের ও দেশের জন্যই করেছি। এসব রাজনীতিক, সংসদ সদস্য ও মন্ত্রীদের দলে ও সমাজে প্রতিরোধের কোন ব্যবস্থা নেই। একজন কালো টাকার মালিক সরকারী অর্থ আত্মসাতের দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তি, খুন, ধর্ষণের অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তিরাও দলীয় মনোনয়ন নিয়ে সংসদ সদস্য হয়ে যান, জনগণের সেবক বনে যান । এ ধরনের লোকেরা নির্বাচিত হলেও তাদের স্বভাব চরিত্রে পরিবর্তন আসে না।[৫০] রাজনৈতিক সংস্কৃতির গুণগত কোন পরিবর্তন হয় না। এরা সত্যিকার অর্থে সংসদীয় রাজনীতি বোঝেন না, আর এর চর্চাও করেন না। ফলে এদের দ্বারা পরিচালিত রাজনীতি হয় কলুষিত, হয় প্রশ্নবিদ্ধ।

---

[৫০] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

৫.৭ গণমাধ্যমের স্বাধীনতা এবং বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি

বাংলাদেশে '৯০ পরবর্তী সময় থেকে ১৯ বছরেরও অধিক সময় ধরে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে নির্বাচিত সরকারের শাসন পরিচালিত হচ্ছে। চলছে বহুদলীয় গণতান্ত্রিক চর্চা। জনগণের গণতান্ত্রিক অর্জন, আকাঙ্ক্ষা ও দীর্ঘ দিনের প্রত্যাশা একে অপরের পরিপূরক হয়ে বিকশিত করে চলেছে আমাদের সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে। গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ বাস্তবায়ন আমাদের স্বপ্ন, আমাদের চাওয়া পাওয়া লক্ষ্য। এর জন্য যে আত্মত্যাগ করেছি, তা বিফলে যায়নি। যে সংগ্রাম আমরা করে যাচ্ছি, সেই সংগ্রামেও আমরা বহুদূর অগ্রসর হতে পেরেছি। বলা যায় এ অগ্রসরতা আমাদের লক্ষ্যের একেবারে কাছাকাছি। গণতন্ত্রের জন্য আমাদের এ সংগ্রাম একটি অব্যাহত প্রক্রিয়া হিসেবে সর্বদা চলমান। প্রটিতি মূহুর্তে, প্রতিটি ঘটনার মধ্য দিয়ে আমরা অগ্রসর হচ্ছি। তবে পাশাপাশি সম্মুখীনও হচ্ছি নানা বাঁধা, নানা বিপত্তির। আমাদের সামনে এখনও অনেক সংকট আছে। আছে অনেক সীমাবদ্ধতা। কিন্তু সংকট, সীমাবদ্ধতা মূল স্রোত নয়, মূল স্রোত হচ্ছে জনগণ, তাদের গণতান্ত্রিক সংগ্রাম ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ অর্জনের চরম আকাঙ্ক্ষা । এ গণতান্ত্রিক লক্ষ্য অর্জনের সংগ্রামে আমরা অনেকটা সফল আবার কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যর্থ। এই ব্যর্থতাকে জয় করতে না পারলে সংসদীয় গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি বাস্তবায়নের বাকী পথটুকু অতিক্রম করতে পারবো না।

বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি বাস্তবায়নের পথে যে যে সীমাবদ্ধতা ও অন্তরায়গুলি আছে তাদের মধ্যে এ দেশের রাজনীতিতে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা না থাকা বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি এ দু'য়ের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। গণতান্ত্রিক অধিকার এবং গণমাধ্যমের স্বাধীনতা একে অপরের হাত ধরে চলে। যখন গণতন্ত্র থাকে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা থাকে, তখন গণমাধ্যমের স্বাধীনতাও থাকে। বিচ্ছিন্নভাবে একটিকে কখনও একক ভাবে বিদ্যমান থাকতে দেখা যায়নি। রাজপথে একজন রাজনৈতিক কর্মী যেমন মুক্ত থাকতে চায়, ঠিক টেলিমিডিয়াতে সংবাদকর্মী এবং প্রেসমিডিয়া অর্থাৎ সংবাদপত্রের অফিসেও একজন সংবাদপত্র কর্মী তেমনি মুক্ত থাকতে চায়। স্বৈরশাসকরা যখন মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে হরণ বা নিয়ন্ত্রণ করে তখন সংবাদপত্রসহ যাবতীয় গণমাধ্যমের স্বাধীনতাও হরণ অথবা নিয়ন্ত্রণ করে।

Dhaka University Institutional Repository

আসলে একটি দেশের গণমাধ্যম কতটা স্বাধীন তা নির্ভর করে সে দেশের সরকার কতটা গণতান্ত্রিক এবং দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি কতটা উন্নত তার ওপর। বাংলাদেশের মত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে সংবাদপত্রসহ অন্যান্য গণমাধ্যমের স্বাধীনতা মূলত নেই বললেই চলে। সারা বিশ্বে গণমাধ্যমের অবাধ স্বাধীনতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৯১ সালের ৩ মে ইউনেস্কোর জেনারেল কনফারেন্সে ৩ মে দিনটিকে বিশ্ব প্রেসস্বাধীনতা দিবস হিসেবে পালন করার জন্য এক ঘোষনা দেয়া হয়। এর ভিত্তিতে ১৯৯৩ সালের ২০ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ৩ মে কে বিশ্ব প্রেস স্বাধীনতা দিবস হিসেবে ঘোষনা করে। প্রেস স্বাধীনতাসহ যাবতীয় গণমাধ্যমের স্বাধীনতা কিভাবে কেমন করে লঙ্ঘিত বা বিঘ্নিত হচ্ছে, স্বীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে গিয়ে কোন কোন সাংবাদিক মৃত্যুবরণ করছেন বা কারা বন্দি হচ্ছেন সে সব তথ্যও জনসাধারণকে জানানো এই দিবস পালনের লক্ষ্য।[৫১]

সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার ১৯ ধারায় বলা হয়েছে, প্রত্যেকেরই মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা রয়েছে। বিনা হস্তক্ষেপে মতামত পোষণ এবং যে কোন উপায়াদির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সীমানা নির্বিশেষে তথ্য ও মতামত সন্ধান, গ্রহণ ও জ্ঞাত করার স্বাধীনতা এ অধিকারের অন্তর্ভূক্ত। বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদে বলা হযেছে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা, বিদেশী রাষ্ট্র সমূহের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা শালীনতা ও নৈতিকতার স্বার্থে কিংবা আদালত অবমাননা, মানহানি বা অপরাধ সংগঠনে প্ররোচনা সম্পর্কে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা নিষেধ সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের বাক ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের এবং সংবাদ ক্ষেত্রের স্বাধীনতা নিশ্চয়তা দান করা হলো। অথচ সংবাদ প্রকাশের স্বাধীনতা থাকা সত্ত্বেও হাজারও বাঁধা অতিক্রম করে সংবাদ প্রকাশ ও প্রচার করতে হয় সাংবাদিক ও সংবাদপত্র কর্তৃপক্ষকে। তাছাড়া, রিপোর্টটি যদি সংশ্লিষ্ট রিপোর্টারের স্বনামে ছাপা হয়, আর তা যদি কোন মহলবিশেষের স্বার্থের পরিপন্থি, অপ্রিয় এবং দুঃসাহসী সত্যের প্রকাশ হয়, তাহলে ওই রিপোর্টারের পরিণতি কি ভয়াবহ হতে পারে জনকণ্ঠের বিশেষ সংবাদদাতা শামছুর রহমানসহ একাধিক আত্মত্যাগী সাংবাদিক এ দেশে তার দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। এখনও প্রাণহানী ঘটছে সাংবাদিকের। প্রবীর, টিপুর মতো সৎ সাংবাদিকদের বরণ করতে হয় পঙ্গুত্ব।[৫২] কয়েকদিন আগেও এটিএন টিভি চ্যানেলের জনপ্রিয় জনৈক রিপোর্টারকে সন্ত্রাসীরা নির্মমভাবে হত্যা করেছে। এই হল আমাদের দেশের সংবাদপত্র ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতার অবস্থা।

---

[৫১] আলম, মো ছামছুল, প্রাগুক্ত।

[৫২] ভূঁইয়া, আবদুল মান্নান, বাংলাদেশের রাজনীতি ও সংবাদপত্র, যুগান্তর, ১৯ মার্চ, ২০০২, পৃ :১৯।

Dhaka University Institutional Repository

অতীতে আমরা দেখেছি, যারা রাস্তায় মিছিল করতে দেয়নি, মিছিল থেকে মানুষ ধরে নিয়ে গেছে কিংবা মিছিলে উঠিয়ে দিয়েছে ট্রাক, তারাই রাতে আবার সংবাদপত্রের অফিসে নির্দেশনা পাঠিয়েছে এই বলে যে, অমুক রিপোর্টটি যাবে অমুকটা যাবে না। সুতরাং জনগণের মৌলিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে একজন রাজনৈতিক কর্মী ও একজন সাংবাদিককে একই কাতারে এসে সমদায়িত্ব পালন করতে হয়। এখানে একজন গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করেন, দলীয় রাজনীতি করেন এবং অন্যজন দলীয় রাজনীতি না করলেও ন্যায়ের পক্ষে সত্য প্রকাশের জন্য ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করেন। এখানে রাজনীতিক এবং সাংবাদিক দুজনকেই একই লক্ষ্য সামনে রেখে সংগ্রাম করতে হয়। কারণ দু'জনেরই মৌলিক ঐক্য রয়েছে ন্যায়, সত্য ও স্বাধীনতা প্রশ্নে।[৫৩] এ দেশের জনগণ স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্র চর্চার পক্ষে যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে সংবাদপত্রের স্বাধীনতারও পক্ষে। তারা চান সংবাদপত্র নির্ভয়ে নির্মোহে সত্য প্রকাশ করুক। এ দেশের জনগণের এই ঐতিহ্য বহুকালের। পাকিস্তান আমলে আয়ুব খান, ইয়াহিয়া খানের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে সংবাদপত্র দলনের বিরুদ্ধে তারা যুগপৎ সংগ্রাম করেছেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বিভিন্ন সময়ে সংবাদপত্রের ওপর আক্রমণের বিরুদ্ধে জনগণ এবং সাংবাদিকরা যুগপৎভাবে সংগ্রাম করেছে।[৫৪] আবার কোন কোন পত্রিকার গণবিরোধী ভূমিকার বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ সে পত্রিকায় আগুন দিয়েছেন, অর্থাৎ গণবিরোধী শাসক ও রাজনীতির বিরুদ্ধে মানুষ যেমন ক্ষুব্ধ ছিল, তেমনি ক্ষুব্ধ ছিল গণবিরোধী পত্রিকার ওপরও। বর্তমানেও রাজনীতি এবং সংবাদপত্রের ভূমিকার বড় বিচারক হচ্ছেন সাধারণ জনগণ। গণতন্ত্রে পরমতসহিষ্ণুতা আর ভিন্নমতের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ অনিবার্য ও একটি অত্যাবশ্যকীয় শর্ত। অথচ এই অনিবার্য শর্ত ও সত্যকে বাংলাদেশের রাজনীতিতে অস্বীকার করা নিত্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এ অভিযোগ সরকারীদল, বিরোধীদল থেকে শুরু করে ব্যবসায়ী, সরকারী- বেসরকারী, সামরিক-বেসামরিক আমলা শ্রেণীর সকলের বিরুদ্ধে রয়েছে। তুলনামূলক বিচারে সাংবাদিক ও সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে নির্যাতনমূলক আচরণ বাংলাদেশে দিনে দিনে কেবল বেড়েই চলেছে। সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে নির্যাতনমূলক আচরণের অবস্থাটা এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা বিষয়টি ব্যাপক হারে সমালোচিত হয়েছে। একবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ফ্রিডম হাউস তাদের এক রিপোর্টে মন্তব্য করেছিল

---

[৫৩] প্রাগুক্ত।
[৫৪] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

যে, বাংলাদেশে ও হাইতিতে সংবাদমাধ্যমকে তারা স্বাধীন নয় বলে মনে করেছে। ফ্রিডম হাউসের বার্ষিক ওই প্রতিবেদনে আরো উল্লেখ করা হয় যে, অতীতে তারা এ দুটি দেশের সংবাদ মাধ্যমকে আংশিক স্বাধীন মনে করত, এখন তা করে না। কারণ এ দুটি দেশে এখন সংবাদ মাধ্যমকে প্রকাশ্যে হয়রানি করা হয়। বিগত বিভিন্ন সরকারের শাসনামলে বিভিন্ন সংবাদপত্রের রিপোর্টারদেরকে যেভাবে গ্রেপ্তার করা হতো, তেমনি বর্তমান সময়ের আলোচিত ঘটনা আমার দেশ পত্রিকার সম্পাদক মাহমুদুর রহমানকে গ্রেফতার করে উক্ত পত্রিকা অফিসে তালা ঝুলিয়ে দেওয়ার মত ঘটনার প্রেক্ষিতে সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন ওঠে, গণতান্ত্রিক সরকার তথা সুশাসনের এটাই কি চিত্র? শুধু এই নয় সারাদেশে সাংবাদিক লাঞ্ছণা, শারীরিক নির্যাতনের মাত্রা দিন দিন যেভাবে বেড়ে চলেছে তাতে আমাদের গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি ও গণতান্ত্রিক অধিকারের বাস্তবতা কি হবে? এছাড়া প্রতিনিয়ত সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করা হচ্ছে, সাংবাদিকদের ভীতি প্রদর্শন, গ্রেফতার, দৈহিক নির্যাতন, অবমাননা ইত্যাদি চলছে বিভিন্ন সন্ত্রাসী প্রক্রিয়ায়। এভাবে সাংবাদিক মহলে এক ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করা হচ্ছে যা সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে খর্ব করছে, যদিও সংবাদ প্রকাশের ওপর কোনো সরকারি নিয়ন্ত্রণ নেই, কিন্তু সরকার পছন্দ করবে না এমন কোনো সংবাদ প্রকাশ করলে পত্রিকা ও সংশ্লিষ্ট সাংবাদিকদের ভাগ্যে কি ঘটতে পারে তা অনিশ্চিত। আর তাই সামগ্রিক বিচারে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আবার হুমকির সম্মুখীন। রাজনৈতিক আন্দোলনের দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় দেশের গণতন্ত্রকামী ও সচেতন সাংবাদিকমহল যা অর্জন করেছিলেন তা আবারও নস্যাৎ হতে চলছে।

গণতান্ত্রিক সমাজ গঠনের জন্য সংবাদপত্রসহ গণমাধ্যমের বহুমুখী মতামত সহজভাবে গ্রহণ করার কোনো বিকল্প নেই। তাই গণতান্ত্রিক সাস্কৃতিক চর্চ্চাকে অব্যাহত রাখতে হলে গণমাধ্যমের বহুমুখী মতামতকে সহজভাবে গ্রহণ করার মানসিকতা আমাদের অর্জন করতে হবে। আর তা সরকারীদল, বিরোধীদল থেকে শুরু করে ব্যবসায়ী, সামরিক-বেসামরিক আমলা, সুশীল সমাজসহ সাধারণ জনগণের সকলের জন্য অত্যাবশ্যকীয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, বাংলাদেশে যারাই ক্ষমতায় থাকুক আর বিরোধী দলেই থাকুক না কেন কেউই অপ্রিয় সত্যভাষী সমালোচনামুখর পত্রিকাকে কেউ সহ্য করতে চায় না।

পাশাপাশি এ কথাও মিথ্যা নয় যে, সংবাদ পত্রের অবাধ স্বাধীনতা অনেক ক্ষেত্রে মিথ্যা, বানোয়াট, উদ্দেশ্যমূলক ও হয়রানিমূলক সংবাদ প্রকাশের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। একটি পত্রিকার সংবাদের সাথে অন্য পত্রিকার সংবাদের মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। বাংলাদেশ এখন এমন বহু পত্রিকা আছে যার একটি পড়লে

Dhaka University Institutional Repository

দেশের সব খবর পাওয়া যায় না, পাওয়া গেলেও ঘটনার পুরোটা একটি পত্রিকা থেকে পাওয়া যায় না। এসব ক্ষেত্রে পাঠকদের দুই ধারার দুটি পত্রিকা কিনতে হবে এবং দুটি পাঠ করে আসল সত্য বের করার চেষ্টা পাঠককেই করতে হবে। এই প্রবণতা খুব শুভ নয়।[৫৫] সাংবাদিকরা তথ্য উদ্‌ঘাটন ও সংবাদ প্রচারে হবে নিরপেক্ষ। এটাই গণতান্ত্রিক সমাজের কাম্য। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি, জাতির বিবেক বলে দাবিদার সাংবাদিকরা আজ বহু শিবিরে বিভক্ত। যতই দিন যাচ্ছে এই বিভক্তি যেন আরো প্রকট হয়ে উঠছে। সাংবাদিক ইউনিয়নগুলো ঐক্যবদ্ধভাবে কোনো কর্মসূচী কিংবা যৌথ কোনো বিবৃতি আজ আর দিতে পারছে না। সাংবাদিকদের এই বিভক্তির সুযোগ নিচ্ছে রাজনৈতিক ও সামাজিক দুর্বৃত্তরা। নিরাপত্তার অভাবে রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে মুক্ত সাংবাদিকতার দ্বার।[৫৬] ১৯৯১ সালে আমরা যখন নতুন করে আবার গণতন্ত্রের পথে যাত্রা শুরু করলাম তখন থেকেই পত্র-পত্রিকা ইলেকট্রনিক্স মিডিয়াসহ গণমাধ্যমের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। তবে অন্যদিকে দেখা যাচ্ছে যে, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা যেন ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে। বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে দেশের অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ গণমাধ্যম। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে সংবাদ চ্যানেল সিএসবি নিউজ ও বর্তমান সরকারের আমলে জনপ্রিয় চ্যানেল আই বন্ধ করা, যমুনা টিভির পরীক্ষামূলক সম্প্রচার বন্ধ করা আর যাই হোক গণমাধ্যমের স্বাধীনতা হতে পারেনা। কয়েকদিন আগেও বহুল প্রচারিত দৈনিক আমার দেশ পত্রিকাটিও বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। গ্রেফতার হয়েছে পত্রিকাটির সম্পাদক মাহমুদুর রহমান। তাছাড়া সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে সাংবাদিকদের ভীতিপ্রদর্শন, গ্রেপ্তার, দৈহিক নির্যাতন ও অবমাননা। এ কোন ধরণের স্বাধীনতা? এভাবে সংবাদপত্রসহ যাবতীয় গণমাধ্যম যদি সুবিধাবাদীদের খপ্পর থেকে মুক্ত হতে না পারে তাহলে স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিরপেক্ষ প্রতিবেদন, গবেষণা ও কর্মকান্ড পরিচালনা করে নবীন দেশটির গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতি বিকাশের পথে দিকনির্দেশনা দিতে পারবেনা।

---

[৫৫] প্রাগুক্ত।

[৫৬] রহমান, মো: হাবিবুর, প্রথম আলো, ৪ মে ২০০২, পৃ : ৬।

Dhaka University Institutional Repository

৫.৮ পারস্পরিক দোষারোপ, প্রতিহিংসা ও প্রতিশ্রুতিভংগের রাজনৈতিক সংস্কৃতি

বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হলো সরকারি ও বিরোধী দলের পারস্পরিক দোষারোপ, প্রতিহিংসা পরায়ণতা ও প্রতিশ্রুতিভংগ করা। আদর্শগত ভিন্নতার দরুন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে মতবিরোধ থাকতে পারে। এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু এই মতবিরোধকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্রে অস্থিতিশীলতার সৃস্টি হবে এটা কখনও কাম্য নয়। আর সেটা যদি সাধারণ কর্মী, সদস্য থেকে শুরু করে খোদ দলীয় প্রধানদের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে পরিনত হয় তখনই হয় বড় সমস্যা। আর এই সমস্যা বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে প্রকট আকার ধারন করেছে। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং বিরোধীদলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মধ্যে কমবেশি সব সময়ই তর্কযুদ্ধ লেগেই রয়েছে। সরকারি দল ও বিরোধী দলের মধ্যে বিদ্যমান এ তর্কযুদ্ধ একটি অব্যাহত প্রক্রিয়া হিসেবে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে দিন দিন সংঘাতময় করে তুলছে।

২০০২ সালের ৯ মার্চ তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সাংবাদিকদের এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন,"বিরোধী দল সরকারকে অস্থিতিশীল ও অকার্যকর করতে পরিকল্পিতভাবে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটাচ্ছে।" তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্যকে তাৎক্ষনিক জবাব দিয়ে পরদিনই ১০ মার্চ সংবাদ সম্মেলন করে বলেছিলেন "প্রধানমন্ত্রী নিজের ব্যর্থতা আড়াল করতে সব দায়দায়িত্ব বিরোধী দলের ঘাড়ে চাপাতে চাইছেন।" তিনি দেশে আইনশৃঙ্খলার অবনতির জন্য বিএনপি এবং তার অঙ্গসংগঠনগুলোকে দায়ী করেছেন।[৫৭]

৩ মার্চ ২০০২ইং তারিখে তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা ছাত্রলীগের সম্মেলনে বলেছিলেন, "বর্তমান বিএনপি, জামায়াত জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর দেশে অত্যাচার, নির্যাতন, সন্ত্রাস, হত্যা ব্যাপকভাবে বেড়ে গেছে। তিনি বলেন, স্বাধীনতার পর বাংলাদেশকে একটি উদার ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তোলা হয়। কিন্তু বর্তমান জোট সরকার বাংলাদেশকে বিশ্ববাসীর কাছে সন্ত্রাসী রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।"[৫৮] একই দিনে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার মন্তব্যের জবাব দিয়েছিলেন এভাবে " বিগত আওয়ামী লীগ সরকার ৫ বছর ক্ষমতায় থেকে দেশে সন্ত্রাস ও লুটপাটের রাজত্ব কায়েম করেছিল।

---

[৫৭] রহমান, মতিউর, ২০০২, খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনার এই পারস্পরিক দোষারোপ আর কত দিন, দৈনিক প্রথম আলো, মার্চ ১৩,পৃ ঃ ১।

[৫৮] দৈনিক ইত্তেফাক, ২০০২,মার্চ ১৩, পৃ ঃ ১।

Dhaka University Institutional Repository

গত ১ অক্টোবরের নির্বাচনে তাঁরা পরাজিত হয়ে এখন নির্বাচিত সরকারের বিরুদ্ধে দেশে-বিদেশে-অপপ্রচার করছে।[৫৯]

১৯৯৬ সালের নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে প্রধানমন্ত্রিত্ব গ্রহণের কয়েকদিন পরেই তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিরোধী দলকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, "একটি বিশেষ মহল রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে দেশে আইনশৃঙ্খলা বিনষ্টের জন্য সুপরিকল্পিত ভাবে চেষ্টা করছে"[৬০] এর কিছুদিন পর শেখ হাসিনা আবার বলেন, "বিএনপি প্রথম দিন হতে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড চালিয়ে দেশবাসীকে জিম্মি করে রাখতে চায়।[৬১] তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেছিলেন, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসে দেশব্যাপী চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করছে। রক্ষীবাহিনীর কায়দায় বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের হত্যা করছে তারা।[৬২] এর তিন দিন পরই আবার বলেছেন, "দেশব্যাপী যে নির্যাতন নিপীড়ন, রাহাজানি, পুলিশ প্রশাসন দলীয়করণসহ যা চলছে, তাতেই প্রমাণিত হয় যে, তারা পুনরায় একদলীয় বাকশাল কায়েমের চক্রান্তে লিপ্ত রয়েছে।[৬৩] অষ্টম জাতীয় সংসদের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেছিলেন,"আওয়ামীলীগ এখন সংসদে আসতে লজ্জা পাচ্ছে। কারণ জনগণের দেয়া রায় পেয়ে নির্বাচিত মাত্র ৫৮ জন সংসদ সদস্য নিয়ে সংসদে আসতে তাদের এই লজ্জা।[৬৪] জাতীয় সংসদের তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা বলেছিলেন, "সরকার গত ৫ মাসে দেশে উপহার দিয়েছেন কেবল, লাশ, খুন রাহাজানি, সন্ত্রাস এবং নির্যাতন-নিপীড়ন। তাদের এই অত্যাচার ও নির্যাতন বাংলাদেশের মানুষ আর সহ্য করবে না"।[৬৫]

আমরা যদি আরো পিছিয়ে ১৯৯১-১৯৯৬ সাল পর্যন্ত বিএনপি সরকারের সময়কালের পত্রিকা দেখি, তাহলেও তাদের একই রকম কথা, প্রায় একই বক্তব্য, বিবৃতি বা আচরণ দেখতে পাব। শুধু বক্তৃতা-বিবৃতি নয়, দু'দলের রাজনৈতিক কৌশল বা কর্মকান্ডের মধ্যেও সাযুজ্য দেখা যায়। সরকার বা বিরোধী দলে থেকে একে অপরের বিরুদ্ধে হরতাল, অবরোধ, বিক্ষোভ, সংসদ বর্জনের মতো ধ্বংসাত্মক কর্মসূচী পালন করে দুই দলই। নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে দু'দলই কথায় কথায় গণতন্ত্রের কথা বললেও আচরণ করে স্বৈরচারী সরকারের মতো। সে জন্যই এ ধরণের সরকারগুলোকে আজকাল রাজনৈতিক বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় নির্বাচিত স্বৈরতান্ত্রিক সরকার। শুধু দেশ

---

[৫৯] দৈনিক ইত্তেফাক, ৪ মার্চ, ২০০২, পৃঃ ১।
[৬০] দৈনিক ইত্তেফাক, ৯ জুলাই, ১৯৯৬ ।
[৬১] দৈনিক ইত্তেফাক, ১৩ আগস্ট, ১৯৯৬ ।
[৬২] দৈনিক সংবাদ, ২৫ আগস্ট, ১৯৯৬ ।
[৬৩] দৈনিক ইত্তেফাক, ২৮ আগস্ট, ১৯৯৬ ।
[৬৪] দৈনিক ইত্তেফাক, ২০ মার্চ, ২০০২, ।
[৬৫] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

পরিচালনায় নয়, দল পরিচালনার ক্ষেত্রেও এই দুই নেত্রী বা নেতারা প্রায় একই স্টাইলে একই ভাবে স্বৈরতান্ত্রিক পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকেন। এর অন্যথা হওয়ার কোনো সুযোগ নেই বা সম্ভাবনাও সুদূর পরাহত। এদেশের ক্ষমতাসীন দল মানে জনবিচ্ছিন্ন দল। ক্ষমতায় যাবার আগে যা কিছুই বলুক না কেন নির্বাচনী মেনুফেস্টোতে জনগনের কাছে যত প্রতিশ্রুতি দিক ক্ষমতায় বসার পর সব রাজনৈতিক দলের চেহারা, চরিত্র এক রকম হয়ে যায়। জনগনকে দেয়া প্রতিশ্রুতি তখন তাদের মনে থাকে না। জনস্বার্থ তাদের কাছে তখন গৌন হয়ে পড়ে। ব্যক্তিস্বার্থ বাস্তবায়নে তারা অধিক তৎপর হয়ে উঠে। আত্মকেন্দ্রিক, স্বজনপ্রীতি , দূর্নীতি ইত্যাদির বদৌলতে ক্ষমতাসীন সরকার তখন আর জনগনের সরকার থাকে না ।

বিগত ১৯ বছরে চারটি নির্বাচিত সরকারের (১৯৯১-১৯৯৬) বিএনপি, (১৯৯৬-২০০১) আওয়ামীলীগ, (২০০১-২০০৬) বিএনপি সরকারের আমলে আমরা দেখেছি এবং (২০০৯-বর্তমান) আওয়ামীলীগ সরকারের আমলে আমরা দেখছি এই দুই দল আর দুই নেত্রী যখন সরকারে বা বিরোধী দলে থাকে তখন তারা পরস্পরের বিরুদ্ধে একই রকম দোষারোপ করেন। প্রায় একই সুরে অভিযোগ তোলেন। ২০০৮ সালের নির্বাচন নিয়ে আপামর জনগণ সবাই বলেছে, এটা একটি সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন হয়েছে। বিরোধী দলের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, এই নির্বাচনে সূক্ষ্ম কারচুপি হয়েছে। সেটা আমাদের দেশের রজনৈতিক দল সব সময় বলে থাকে। যারা পরাজিত তারা আমাদের দেশে সব সময় এই কথা বলে থাকে।[৬৬] বাংলাদেশের রাজনীতিতে প্রতিহিংসামূলক বক্তব্য প্রদান, জিঘাংসামূলক রাজনৈতিক কর্মকান্ড প্রতিনিয়তই ঘটছে যা আমরা প্রত্যক্ষভাবে জানছি, দেখছি বা পড়ছি। এসব ঘটনা যখন সংবাদপত্রে যখন ফলাও করে প্রকাশিত হচ্ছে, টেলিমিডিয়াতে সরাসরি সম্প্রচার হচ্ছে তখন এগুলো সবই দেশের জনগণ প্রত্যক্ষভাবে উপভোগ করছে। জনগণ জানছে এসব কর্মকান্ড বিরোধী দল করছে না কি সরকারী দল করছে।

২০০৮ সালের নির্বাচনের আগে প্রধান দুই রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপির কাছ থেকে আমরা শুনেছিলাম তারা গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করবে, সংসদকে কার্যকর করবে। এ কথা আমাদের আশা জাগিয়েছিল।[৬৭] কিন্তু অবস্থার কোন পরিবর্তন হলো না। প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন তো নেইই বরং প্রতিশ্রুতিভংগের প্রতিযোগিতা চলছে প্রতিনিয়ত। নির্বাচনের পূর্বে জনগণকে প্রভাবিত করতে প্রায় সকল রাজনৈতিক দলই মিথ্যা আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে যা নির্বাচনের পর বিজিত কিংবা পরাজিত কোন রাজনৈতিক দলই কার্যকর করতে পারে না। সন্ত্রাস নির্মূল করা, দূর্নীতি, দুশাসনের অবসান ঘটানো, পানি,

---

[৬৬] চৌধুরী, দিলারা, ২০০৯, দৈনিক প্রথম আলো, ৪ নভেম্বর ।

[৬৭] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

বিদ্যুৎ, গ্যাস সমস্যা নিরসন, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য কমানো ইত্যাদি স্পর্শকাতর বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়ে সে অনুযায়ী কাজ না করা অর্থাৎ প্রতিশ্রুতি ভংগ করা বাংলাদেশের রাজনীতিবিদদের সহজাত অভ্যাসে পরিনত হয়েছে। হরতাল, অবরোধের মত গুরত্বপূর্ণ বিষয়কে নিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলসমূহ বিভিন্ন সময় নানা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে আবারপরে তা ভঙ্গও করেছে। হরতাল প্রসংগে রাশেদ খান মেনন ১৯৯৯ সালে "হরতাল : জনগণের অধিকারের পক্ষেই অবস্থান নিতে হবে" শিরোনামে লিখেছিলেন "আওয়ামীলীগ আর হরতাল করবে না বলে প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রতিক ঘোষণার পর বাংলাদেশের রাজনীতি ও সংবাদ মাধ্যমের এখনকার প্রধান আলোচ্য বিষয় হরতাল। দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্য নিয়ে তাদের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। বিরোধী দল বি এন পি ইতিপূর্বে বলেছিল, সরকারি দল যদি অঙ্গীকার করে যে তারা বিরোধী দলে গেলে আর হরতাল করবে না, তাহলে তারাও আর হরতাল করবে না"।[৬৮] কিন্তু পরবর্তীতে কোন দলই তাদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাজ করেনি অর্থাৎ আওয়ামী লীগ পরবর্তীতে (২০০১-২০০৬) জোট সরকারের শাসনামলে দিনের পর দিন একের পর এক হরতাল ডেকেছে। বর্তমান মহাজোট সরকারের (২০০৮- চলমান) আমলে ইতিমধ্যে প্রধান বিরোধীদল বিএনপিও গত ১০ মে ২০১০ বগুড়ায় অর্ধদিবস এবং ২৭ জুন'২০১০ সারা দেশব্যাপী হরতাল পালন করেছে। নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর অনেকে আশা করেছিল এবার হয়তো রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে পরিবর্তন আসবে। কিন্তু রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে কোন ইতিবাচক পরিবর্তন আসেনি। সাংবাদিক আশিস সৈকত ও তানভীর সোহেল এক রিপোর্টে উল্লেখ করেন,"সংসদকে কার্যকর করতে সরকার ও বিরোধী দলের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হলেও এক্ষেত্রে দুই পক্ষই উদাসীন। স্পিকার, সরকারি দল ও প্রধান বিরোধীদল এ বিষয়ে নিজেদের মধ্যে কোন আলোচনা করছে না। শুধু গণমাধ্যমকে ব্যবহার করে পরস্পরকে দোষারোপ করছে। অথচ নির্বাচনের আগে দুটি দলই সংসদকে কার্যকর করার ব্যাপারে জনগণকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল"।[৬৯] বিএনপি'র মতে, "আওয়ামী লীগ সংসদকে কার্যকর করার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারেনি। প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা বিরোধী দলকে ডেপুটি স্পিকারের পদ দেয়ার ঘোষনা দিয়েও কথা রাখেননি"।[৭০] বিএনপি বলছে, প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সরকারি দল বিরোধী দলকে সংসদের সামনের আসনও দেয়নি আর সরকারি দল বলছে তারা তাদের কথা রেখেছে, প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আসনও দিতে চেয়েছে কিন্তু বিএনপি তাদের কথা মত সংসদে আসছে না। এ ভাবে সরকারি ও বিরোধী দলের মধ্যে চলতে থাকা প্রতিহিংসামূলক ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের রাজনীতি দেশের সংসদীয় গণতন্ত্র ও সুষ্ঠু রাজনৈতিক সংস্কৃতির জন্য কখনও সুখকর হতে পারেনা।

---

[৬৮] মেনন, রাশেদ খান, রাজনীতির কথকতা, পৃ ঃ ২৬।

[৬৯] দৈনিক প্রথম আলো, ২০০৯, অক্টোবর ৭।

[৭০] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

৫.৯ হরতাল, ধর্মঘট, অবরোধ, সহিংসতা ও বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি

হরতাল, ধর্মঘট, অবরোধ ইত্যাদি বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এদেশের রাজনীতিতে এগুলোর ব্যবহার হয় মূলত রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের কৌশল ও আন্দোলনের হাতিয়ার হিসেবে। কেউ কেউ মনে করেন হরতাল, ধর্মঘট হলো প্রতিবাদের সফল মাধ্যম। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে যে কোনো ইস্যুতে বেকায়দায় ফেলার একটা যুৎসই হাতিয়ার। আমাদের দেশে বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামে হরতাল, ধর্মঘট, অবরোধের ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। বর্তমানে হরতাল আমাদের জাতীয় জীবনের একটি নিত্য - নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশের রাজনীতিতে হরতাল একটি অনিবার্য ঘটনা। গনতন্ত্র যখন স্বৈরাচারীর কবলে পড়ে তখন গনতনন্ত্রকে পুনরুদ্ধারের জন্য বিরোধী দলগুলো একজোট হয়ে জোটবদ্ধ আন্দোলনে নামে। আন্দোলন সফল করার লক্ষ্যে স্বৈরাচারী অগণতান্ত্রিক ক্ষমতাসীন সরকারী দলের ভিত কাঁপিয়ে দেবার উদ্দেশ্যেই বিরোধী দলগুলো তখন নানা কর্মসূচীর সাথে সাথে আন্দোলনের সর্বশেষ অস্ত্র হিসাবে হরতাল ডাকে। এক দিকে বিরোধী দলগুলো হরতাল ডাকে এবং হরতাল সফল করার জন্য সাধারণ জনগণকে আহবান জানায়। অন্যদিকে সরকারী দল হরতালকে জনস্বার্থের বিরোধী বলে আখ্যায়িত করে হরতাল প্রতিহত করার জন্য জনগণের প্রতি আহবান জানায়। এ হরতাল পালন বা বর্জন সবই করে রাজনৈতিক দলগুলো তাদের নেতাকর্মীর মাধ্যমে। এক্ষেত্রে সাধারণ জনগণের সাথে তাদের কোন সংযোগ থাকে না।

465001

এদেশের রাজনৈতিক গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রার ইতিহাস দেখলেও দেখা যায়, সেই মুঘল আমলে এবং তার আগে থেকে জনগণ তাদের প্রতিবাদ-প্রতিরোধ সংঘটিত করতে-ধর্মঘট করে আসছে। মুঘল-ই-আজমের বিরুদ্ধে হরতাল, দাক্ষিণাত্যে কুতুবশাহীর শাসনের অত্যাচারের বিরুদ্ধে হায়দ্রাবাদের মহাজনদের হরতাল ও 'বন্‌ধ' পালন, অওরঙ্গজেবের করনীতির বিরুদ্ধে হরতাল ও 'বন্‌ধ' পালন, এমনকি মুঘল শাসনেও এই অস্ত্রের প্রয়োগের উদাহরণ দেখা যায়। তারপর ব্রিটিশ যুগের দীর্ঘ রাজনৈতিক লড়াই, পাকিস্তান আমলের গণতান্ত্রিক আন্দোলন, বাংলাদেশ আমলেও এই হরতাল-অবরোধকে জনগণের প্রতিবাদ-বিক্ষোভ সংগঠিত করার কাজে ব্যবহার করা হয়েছে।[৭১]

স্বাধীনতাপূর্ব বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে হরতাল, অবরোধ ও ধর্মঘটের প্রভাব যেমন রয়েছে তেমনি স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে এগুলোর ব্যবহার যথেষ্ট পরিমাণে লক্ষ্যণীয়। ৮০'র দশকে বিশেষ করে জেনারেল এরশাদ সরকারের নয় বছরের স্বৈরাচারী শাসনামলের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের সকল স্তরের জনগন,

[৭১] মেনন, রাশেদ খান, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ২৯।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক দলসমূহ বিভিন্ন সময়ে একের পর এক হরতাল, অবরোধ ও ধর্মঘটের কর্মসূচী পালন করেছে। তবে নব্বই এর পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্রের পুনঃযাত্রা হরতাল, অবরোধ ও ধর্মঘটের দ্বারা বাধাগ্রস্থ হয়েছে বহুবার। খালেদা জিয়ার শাসনামলে (১৯৯১-১৯৯৬) তৎকালীন বিরোধী দল আওয়ামী লীগ যেমন হরতাল, অবরোধ ও ধর্মঘট করেছে তেমনি শেখ হাসিনার শাসনামলেও (১৯৯৬-২০০১) তৎকালীন বিরোধী দল বিএনপিও আন্দোলন, সংগ্রাম ও দাবী আদায়ের মাধ্যম হিসেবে এগুলোকেই ব্যবহার করেছে। পরবর্তীতে পুনরায় খালেদা জিয়ার শাসনামলে (২০০১-২০০৬) বিরোধী দল আওয়ামী লীগও একই কাজ করেছে।

হরতালের কারণে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসাসহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকে ফলে দেশের সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রায় অচল হয়ে পড়ে। জনগনের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যেমন, খাদ্য সামগ্রী, ঔষধপত্র সরবরাহ এমনকি জরুরী রোগীদের চিকিৎসা পর্যন্ত করানো সম্ভব হয়ে উঠে না। হরতালের কারণে প্রত্যক্ষভাবে ব্যবসায়ী সম্প্রদায় খুব বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাদের মেরুদণ্ড একেবারে ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম হয়। তাছাড়া বিদেশের সঙ্গে দেশীয় শিল্পের যে ব্যবসা-বাণিজ্য চলে, তারও একেবারে করুণ দশার সম্মুখীন হতে হয়। রাজনৈতিক কর্মসূচীর নামে যখন তখন হরতাল, ধর্মঘট আহ্বানের ফলে বিদেশীরা বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রতি নেতি বাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করছে। তবে আশার কথা হলো, বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আশার পর এই দেড় বছরে বিরোধী দল এখনও পর্যন্ত কোন বড় ধরণের হরতাল (মে মাসে বগুড়ায় অর্ধদিবস হরতাল পালন এবং পূর্ব ঘোষিত ২৭ জুন'২০১০ এর হরতালের সম্ভাবনা) ছাড়া , ধর্মঘট, অবরোধ সহ বড় কোন ধরনের আন্দোলনের কর্মসূচী পালন করেনি। তবে পাশাপাশি অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে হরতাল, ধর্মঘট, অবরোধ সহ বড় কোন ধরনের আন্দোলনের কর্মসূচীর আতঙ্ককে একেবারে মুছে ফেলা যায় না। কেননা সম্প্রতি বিরোধী দলীয় এক জনসভায় বিএনপি মহাসচিব সরকারকে উদ্দেশ্য করে এ ধরনের এক ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন,"আমরা সরকারকে যথেষ্ঠ সময় দিয়েছি, ১০ মাসে অন্দোলনের পথ বেছে নেইনি। ফ্যাসিবাদ ও অসত্য প্রচারনা থেকে বিরত থাকলে আরও সময় দিতে ও সহযোগিতা করতে অমরা প্রস্তুত। তবে আমাদের আন্দোলনের পথে নামতে বাধ্য করবেন না।"[৭২]

হরতালের কারণে সকল মহল ক্ষতিগ্রস্ত ও হতাশাগ্রস্ত। তারা হরতালকে যে কতটা অপছন্দ এবং ঘৃণা করে এর প্রমাণ মিলেছে বিগত সময় গুলিতে বিরোধী দলের বিভিন্ন হরতাল, ধর্মঘট, অবরোধে প্রত্যক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত দেশের সচেতন নাগরিক, বুদ্ধিজীবী ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের হরতালের বিপক্ষে জনমত গঠনের

[৭২] দৈনিক প্রথম আলো, ২৯ অক্টোবর, ২০০৯, পৃ ঃ ২।

Dhaka University Institutional Repository

লক্ষ্যে সংবাদ সম্মেলন, সভা-সমাবেশ, মিটিং মিছিলসহ যেন কিছু কর্মসূচী পালনের মধ্য দিয়ে। ব্যবসায়ী সম্প্রদায় নেতৃবৃন্দ সরকারি দল ও বিরোধী দল, এমনকি প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন এবং হরতালের ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান ও অনুরোধ জানিয়েছেন বহুবার। যার ফলশ্রুতিতে এর গুরুত্ব উপলব্ধি করে ১৯৯৮ সালের ১৫ নভেম্বর তৎকালীন এবং বর্তমান বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় পত্রপত্রিকার সম্পাদক এবং বার্তাসংস্থার সম্পাদকদের এক সভায় ঘোষণা করেছিলেন, আওয়ামী লীগ আর হরতাল ডাকবে না।[৭৩] তিনি আরও বলেন "আমি বিরোধী দলের প্রতি আহ্বান জানাই আমরা আর হরতাল করব না, আপনারাও আসুন আর হরতাল নয় একযোগে কাজ করি।"[৭৪] তার কথাগুলো সেসময় সারা দেশবাসীর মনে আশার সঞ্চার করেছিল। দেশের আপামর ভুক্তভোগী জনগণ কিছু সময়ের জন্য হলেও স্বস্তির নিঃশ্বাস নিয়েছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলেও সত্যি (২০০১-২০০৬) সালের চারদলীয় জোট সরকারের শাসনামলে জাতীয় সংসদের প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ তাদের দেয়া হরতাল না করার পূর্বের সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারেনি। চারদলীয় জোট সরকারের শাসনামলে (২০০১-২০০৬) বিরোধীদল বহুবার হরতাল, ধর্মঘট কর্মসূচী পালন করেছে। এমনকি চারদলীয় ঐক্যজোটের নেতৃত্বাধীন অষ্টম জাতীয় সংসদের মেয়াদ ২৭ অক্টোবর ২০০৫ তারিখে পূর্ণ হলে নিয়মানুযায়ী বিচারপতি হাসানের নিকট তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা থাকলেও তার কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর ঠেকাতে ১৪ দল রাজপথ দখল করে, ঢাকার পল্টনসহ বিভিন্ন স্থানে ২৩ জন ঘটনা স্থলে নিহত হয়। ২৮ অক্টোবর দেশজুড়ে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে। সারাদেশে উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও সহিংসতায় জনজীবন বিপন্ন হয়ে পড়ে।[৭৫] রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ বিনষ্ট হয় এবং রাজনৈতিক শৃঙ্খলা হয় ক্ষতিগ্রস্ত। বিরোধী দলসমূহ নির্বাচন কমিশনের সংস্কারের দাবির প্রেক্ষিতে ও প্রধান নির্বাচন কমিশনার এম.এ. আজিজের পদত্যাগের দাবীতে ১৪ দলীয় জোট ১২ নভেম্বর ২০০৬ থেকে লাগাতার ৪ দিন অবরোধ পালন করে।[৭৬] ৩ জানুয়ারি ২০০৭ আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ঘোষিত ২২ জানুয়ারির নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দিয়ে ৭ জানুয়ারি ২০০৭ থেকে ৭২ ঘন্টার দেশব্যাপী টানা অবরোধ শুরু করে এবং ১৮ জানুয়ারি থেকে ভোটের দিন অর্থাৎ ২২ জানুয়ারি পর্যন্ত লাগাতার অবরোধ কর্মসূচি ঘোষণা করে।[৭৭]

---

[৭৩] আহম্মদ,ড.এমাজউদ্দীন, বাংলাদেশ রাজনীতির সংস্কৃতি ও সংস্কৃতির রাজনীতি, পৃ ঃ ১৬৭।
[৭৪] দৈনিক ইত্তেফাক, ৬ ডিসেম্বর, ২০০১, পৃ ঃ ৫।
[৭৫] চৌধুরী,শরীফ আহমদ ও সালেহ, মোঃ আবু, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ৩৯৪।
[৭৬] চৌধুরী,শরীফ আহমদ ও সালেহ, মোঃ আবু, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ৩৯৬।
[৭৭] চৌধুরী,শরীফ আহমদ ও সালেহ, মোঃ আবু, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ৩৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

হরতাল আহ্বান করা রাজনৈতিক দলগুলোর গণতান্ত্রিক অধিকার। তবে আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোর মনে রাখা প্রয়োজন যে, হরতাল আহ্বান করা যেমন তাদের রাজনৈতিক অধিকার বা গণতান্ত্রিক অধিকার তেমনি আহূত হরতালে সাড়া দেয়া না-দেয়াটাও জনগণের মৌলিক অধিকার। কোনোক্রমেই জনগণকে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হরতাল পালনে বাধ্য করা যাবে না। এটা শুধু যে অগণতান্ত্রিক তা নয়, শাস্তিযোগ্য অপরাধও বটে। কারণ এতে রাজনীতির নামে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করা হয়।[৭৮] বস্তুত গণতন্ত্রের মূল বক্তব্য এটাই যে,অন্যের সমপরিমাণ অধিকারে হস্তক্ষেপ না করে নিজের অধিকার ভোগ করা । আমাদের রাজনীতিবিদদের মনে রাখা দরকার যে, কারণে অকারণে হরতালের ডাক দিয়ে পিকেটারের মাধ্যমে দোকানপাট, গাড়ি ভাঙচুর আর রাস্তাঘাটে বোমা ফাটিয়ে সন্ত্রাস ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির নামই হরতাল নয়। হরতাল হতে পারে যদি জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন থাকে অন্যথায় নয়। বিগত সময় গুলিতে দেখা গিয়েছে বিরোধী দলগুলো কথায় কথায় ইস্যুবিহীন হরতাল আহ্বান করেছে। তাতে জনগণের সম্মতি ছিল কিনা এটা কখনও চিন্তা করেনি।

আসলে সত্যি হলো এটা যে, এ সকল ইস্যুবিহীন হরতালে জনগণের আশা আকাঙ্খার বিন্দুমাত্র প্রতিফলন ঘটে না। ফলে এতে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থনও থাকে না। বিরোধী দলগুলো যদি হরতালের সময় পিকেটিং ও ব্যাপক বোমাবাজি না করে, তাহলে ক'জন লোক তাদের সমর্থন জানাত? এটা জানা অত্যন্ত জরুরি। হরতাল আহ্বানকারী দলগুলো যে জনগণকে হরতাল সফল করার জন্য অভিনন্দন জানায় তা সাধারণ জনগণের সঙ্গে অভিনব প্রতারণার শামিল। হরতাল থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বিকল্প পথ খুঁজে বের করতে হবে। এই আলোকে আমাদের শিক্ষিত ও সচেতন হতে হবে। আর এটা যদি সম্ভব না হয় তাহলে আমরা কখনই আমাদের কাঙ্খিত রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও সংসদীয় গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিকে ধারণ ও লালন করতে পারবো না।

---

[৭৮] ইউসুফ, আবু, হরতালকারী রাজনৈতিক দলকে আসুন নির্বাচনে বয়কট করি, দৈনিক ইত্তেফাক, ৬ মে, ২০০১, পৃষ্ঠা-৫।

Dhaka University Institutional Repository

৫.১০ বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্র ও সংসদ বর্জন সংস্কৃতি

সংসদ বর্জন বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির একটি নেতিবাচক দিক। নবম জাতীয় সংসদের অধিবেশন শুরু হয়েছে এবং কয়েকটি অধিবেশন হয়েও গিয়েছে। প্রধান বিরোধী দল ঠিকমত সংসদে যাচ্ছে না। আমাদের জাতীয় সংসদে অনেক দিন যাবৎ মান অভিমানের এই পালা চলছে। ১৯৯১-১৯৯৬ সালে বিএনপি সরকারের শাসনামলে আওয়ামী লীগ, ১৯৯৬-২০০১ সালে আওয়ামী লীগ শাসনামলে বিএনপি দীর্ঘদিন সংসদে যায়নি অর্থাৎ সংসদ বর্জন করেছে। ২০০১-২০০৬ সালের জোট সরকারের শাসনামলে দেখা গেছে আওযামী লীগ ও তৎকালীন অন্যান্য বিরোধীদলও ঠিকমত সংসদ অধিবেশনে যোগ দেয়নি। নবম জাতীয় সংসদের রাজনীতিতে একই ধারা অব্যাহত রয়েছে। নবম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন শুরু হয় ২০০৯ সালের ২৫ জানুয়ারি। ২০১০ সালের জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত হয় চতুর্থ অধিবেশন। এ অধিবেশন চলাকালীন সময়ে একটি রিপোর্টে উল্লেখ হয় যে, চলতি সংসদের এ পর্যন্ত ৯৫ কার্যদিবসে বিরোধী দল ২৩ দিন, প্রধানমন্ত্রী ৭৩ দিন ও বিরোধী দলীয় নেতা ৩ দিন উপস্থিত ছিলেন।[৭৯]

প্রথম অধিবেশন থেকেই বি এন পি সংসদ অধিবেশনে ওয়াক আউট শুরু করেছে। সংসদের সামনের সারিতে সম্মানজনক আসন দেয়ার একটি মাত্র দাবিতে সংসদ অধিবেশন বর্জন শুরু করে বি এন পি।[৮০] তারা বলছে সংসদে যাওয়ার পরিবেশ নেই। পরিবেশ তৈরি হলেই তারা সংসদে যাবে এবং অধিবেশনে বসবে। সরকারি দলের এক দায়িত্বশীল নেতা বলেছেন, আপনারা সংসদে আসুন, সব সুবিধা দেয়া হবে। সুশাসনের জন্য নাগরিকের (সুজন) সভাপতি অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদ প্রথম আলোকে বলেন, বিরোধী দল সংসদের প্রাণ। বিরোধী দল ছাড়া সংসদ কার্যকর হতে পারে না। তাই সরকারকে উদ্যোগ নিয়ে বিরোধী দলকে ফিরিয়ে আনতে হবে। তবে এ ব্যাপারে বিরোধী দলেরও দায়িত্ব আছে। বড় কোন ইস্যু ছাড়াই টানা সংসদ বর্জন মানুষ ভালভাবে নেয় না। দেশের স্বার্থের বিষয়টিও বিরোধী দলকে আমলে নিতে হবে।[৮১]

এই হলো বাংলাদেশের বর্তমান সংসদীয় রাজনীতির চিত্র। বিরোধী দলের পক্ষ থেকে সব সময় বলা হয়, বিরোধী দল সরকারি দলের দ্বারা নিপীড়িত-নির্যাতিত। বিরোধী দলের লোকেরা গ্রাম-গঞ্জে টিকতে পারছে না। বিরোধী দল কিভাবে যাবে সংসদে? তাই সংসদে যাওয়ার উপযুক্ত পরিবেশ চাই। বিরোধী দলের এ প্রশ্নের জবাব খুবই স্পষ্ট। বর্তমান বিরোধী দল বলতে চাইছে দেশে গণতন্ত্র নেই। গণতন্ত্রের নিয়মনীতি সব লঙ্ঘিত হচ্ছে। জনগন নিরাপদে চলাচল করতে পারছে না। এখানে অনেকের বক্তব্য হচ্ছে দেশের এই নাজুক পরিস্থিতিতে সংসদের প্রয়োজন অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সংসদ হচ্ছে জাতীয় রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু,

---

[৭৯] দৈনিক আমার দেশ, ২০১০, জানুয়ারি ২৬, পৃ: ১।
[৮০] দৈনিক প্রথম আলো, ২০০৯, অক্টোবর ৭, পৃ:১।
[৮১] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় নীতিনির্ধারণের আদর্শ স্থান, আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের উত্তম জায়গা। কাজেই বিরোধী দলের উচিত সংসদে যোগ দিয়ে এ সুযোগকে ব্যবহার করা। অথচ বিগত ১৯ বছরের বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাস অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক। আমাদের দ্বিতীয় পর্যায়ের সংসদীয় গণতন্ত্রের যাত্রার শুরুটা যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখা যাবে, ১৯৯১ সালে আওয়ামী লীগ বিরোধী দলে ছিল এবং তারা সংসদেও যোগ দিয়েছিল, জমজমাট সংসদ চলছিল, এমন সময় অনুষ্ঠিত হলো মাগুরা উপনির্বাচন। আর এই নির্বাচনে সরকারি দলের প্রার্থী হারান বিরোধীদলের প্রার্থীকে। এই উপনির্বাচনের ফলাফলের জের ধরে শুরু হলো তৎকালীন বিরোধী দলের সংসদ বর্জন ও বয়কট। সংসদীয় রাজনীতির মোড় ঘুরে গেল অন্যদিকে। বিরোধীদলের পক্ষ থেকে দাবিও উঠল, কোনো রাজনৈতিক দলের অধীনে বা নেতৃত্বে নয়, তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন ও তার অধীনে নতুন নির্বাচন চাই। আর এ আন্দোলনের প্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে বছরের পর বছর বিরোধী দল সংসদ বর্জন করে চলছিল। সেই আন্দোলনকে উপেক্ষা করে বিএনপি সরকার ১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে একটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ব্যবস্থা করে। কিন্তু এ নির্বাচনে কোনো বিরোধী দল যোগ দেয়নি। এই নির্বাচন সকল বিরোধী দল বর্জন করে। সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী করে সেই সংসদ ভেঙ্গেও যায়। অতঃপর নতুন নির্বাচন হয় ১৯৯৬ সালের জুন মাসে। সে নির্বাচনে জয়লাভ করে আওয়ামী লীগ। এবার আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংসদ অধিবেশন শুরু হয়। এরপর দেখা গেল, সংসদ অধিবেশনের প্রথম দিনেই বিএনপি নেতৃবৃন্দের সংসদ বর্জন। তারপর যা হওয়ার তাই হতে থাকল। সংসদ বসে কিন্তু বিরোধী দল আসে না। আবার সময়-সুযোগ পেলে দুই নেত্রীই বলেন, সংসদ হচ্ছে দেশের রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু। কিন্তু কেউ সে কেন্দ্রবিন্দুতে যেতে চান না। ক্ষমতায় গেলে সবাই আদর্শবান রাজনীতিক আর ক্ষমতার বাইরে থাকলে একেবারে আহত সিংহ। বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাস পাঠ করলে মনে হবে এ দেশে বড় দুটি দল ক্ষমতার বাইরে একান্তই বিপ্লবী।[৮২]

১৯৯১ সালের পর থেকে আজ ১৯ বছর ধরে আমাদের দেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের এই অবস্থাই চলছে, কেউ পরাজয় মেনে নিতে রাজী নন। আর পরাজিত হলে তিনি জাতীয় সংসদে যেতে রাজি নন। পরাজিত হলেই তারা জনগণের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলে। যে জনগণ তাদের নির্বাচিত করেছে, তাদের কথা আর নির্বাচনের পর মনে থাকে না।। এ কাজটি ১৯৯১ সাল থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত আওয়ামী লীগ, জামায়াতে ইসলামী ও জাতীয় পার্টি করেছে, ঠিক একইভাবে ১৯৯৬ সাল থেকে ২০০১ সালের নির্বাচন পর্যন্ত করেছে বিএনপি'র নেতৃত্বে জামায়াতে ইসলামী ও জাতীয় পার্টির একটি অংশ।[৮৩]

বিগত (২০০১-২০০৬) সালের জোট সরকারের শাসনামলে চলেছে আওয়ামী লীগের সংসদ বর্জনের পালা। 'সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার' এসময় বাংলাদেশ সফরে এসেছিলেন। তিনি জানতেন এই দুই

---

[৮২] সেন, নির্মল, দৈনিক ইত্তেফাক, ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০০২, পৃ : ৫।

[৮৩] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

নেত্রীর যে কেউ পরাজিত হলে তিনি আর সংসদে যাবেন না। তাই পাঁচ দফা সম্মতিপত্র স্বাক্ষর করিয়েছিলেন। সেই পাঁচ দফা সম্মতিপত্রের একটি দফায় বলা হয়েছিল, নির্বাচনে পরাজিত হলেও তারা সংসদ বর্জন করবেন না।" কিন্তু দুর্ভাগ্য তাদের সম্মতিপত্রের অঙ্গীকার অনুযায়ী সংসদ বর্জন রোধ হয়নি বরং সংসদ বর্জনের পাশাপাশি ওয়াকআউটের মাত্রা ক্রমেই বেড়ে চলেছে।

সারণী ঃ ১৩

সংসদে বিরোধী দলের ওয়াকআউট

সংসদ	কার্যদিবস	ওয়াকআউট
প্রথম সংসদ(০৭.০৪.১৯৭৩ থেকে ০৬.১১.১৯৭৫)	১৩৪	৭ বার
পঞ্চম সংসদ(০৫.০৪.১৯৯১ থেকে ২৪.১১.১৯৯৬)	৪০০	৬০ বার
সপ্তম সংসদ(১৪.০৭.১৯৯৬ থেকে ১৩.০৭.২০০১)	৩৮২	৬২ বার
অষ্টম সংসদ(২৮.১০.২০০১ থেকে ২৭.১০.২০০৬)	৩৭৩	৯৫ বার

উৎস: সংসদ সচিবালয় থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে গবেষক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত।

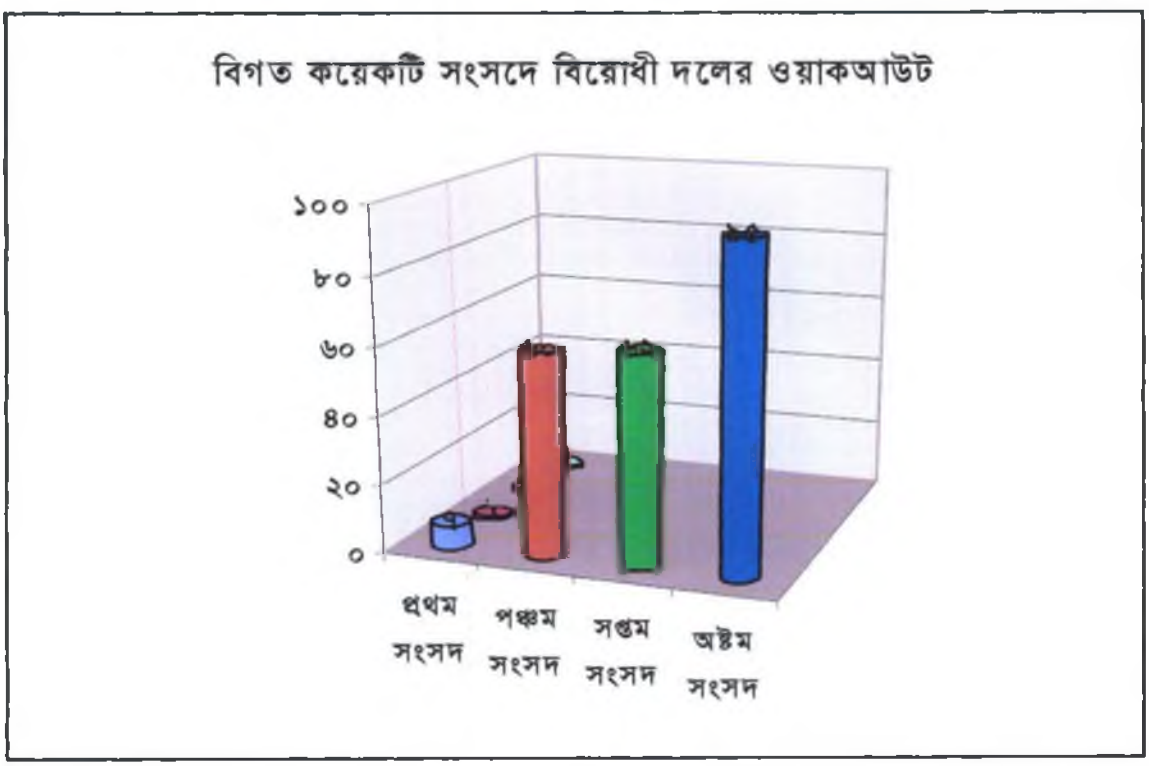

চিত্র : ৪, **সংসদে বিরোধী দলের ওয়াকআউট।**

উৎস: সংসদ সচিবালয় থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে গবেষক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত।

Dhaka University Institutional Repository

২০০৮ সালের নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর আশা করা গিয়েছিল এবার হয়তো দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে পরিবর্তন আসবে। সত্যিকার অর্থে দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সুযোগ হবে। কিন্তু বাস্তবতা একেবারেই ভিন্ন। নবম জাতীয় সংসদের বিরোধীদল প্রথম অধিবেশনে যোগ দিলেও ২টি অধিবেশন বর্জন করেছে।[৮৪] কোন যুক্তিসংগত কারণ ছাড়াই বি এন পি সংসদ বর্জন করে চলেছে। এমনকি ২০০৯-২০১০ অর্থবছরের বাজেট অধিবেশনেও তারা যাওয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি।[৮৫] গত ১০ জুন বর্তমান অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত সংসদে ২০১০-২০১১ অর্থবছরের বাজেট প্রস্তাব পেশ করেন। সে সময় মহাজোটের সাংসদেরা ছাড়াও অতিথি হিসেবে বিদেশী কূটনীতিক, অর্থনীতিবিদ, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। ছিলেন পেশাগত দায়িত্বপালনকারী সাংবাদিকেরাও। কিন্তু বিরোধী দল বিএনপি ও তাদের সহযোগী জামায়াতের সাংসদেরা ছিলেন না।[৮৬] দেশের সাধারণ নাগরিকরা কিন্তু সংসদ বর্জনের এ সংস্কৃতিকে খুব ভাল দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণ করেনি। তবে ২০১০-২০১১ অর্থবছরের বাজেট অধিবেশনে বিরোধী দলের অনুপস্থিতি দেশবাসীকে হতাশ করলেও বিরোধী দলসমূহের কোন বোধোদয় ঘটেছে বলে মনে হয় না। কেননা বিগত সরকারগুলির বিভিন্ন আমলে বিরোধী দল এভাবে বাজেট অধিবেশন বর্জন করেছে বহুবার। ১৯৯১ সাল থেকে এ পর্যন্ত ২০টি বাজেট হয়েছে। এর মধ্যে জাতীয় সংসদে ১৮টি বাজেট পেশ করেছে নির্বাচিত সরকার (২০০৭ ও ২০০৮ সালের বাজেট দিয়েছে তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংবাদ সম্মেলন করে)। এর মধ্যে দুই মেয়াদে বিএনপি দিয়েছে ১০টি। চলতি বছরসহ আওয়ামী লীগ বাজেট দিয়েছে ৭টি। খালেদা জিয়ার প্রথম সরকারের প্রথম বাজেট পেশকালে বিরোধীদল উপস্থিত ছিল দ্বিতীয়টিতে অর্থাৎ ১৯৯২ সালে ছিল না। ১৯৯৩ সালে ছিল কিন্তু পরবর্তী দুটিতে সংসদ পদত্যাগ করে রাজপথে আন্দোলনরত ছিল। ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে আওয়ামী লীগ মোট পাঁচটি বাজেট পেশ করে। এর মধ্যে বিএনপি ১৯৯৮, ২০০০ ও ২০০১ সালে অনুপস্থিত ছিল। ২০০২-২০০৬ মেয়াদে বিএনপি'র নেতৃত্বে জোট সরকার পাঁচটি বাজেট পেশ করে। এর মধ্যে আওয়ামী লীগ উপস্থিত ছিল মাত্র একবার, ২০০৬ সালে।

বাংলাদেশের সংসদীয় ব্যবস্থার এ ভঙ্গুর অবস্থা বিশ্লেষণ করে সাউথ এশিয়ান গ্রুপের বিশেষজ্ঞ জ্যোতি এম পাথানিয়া বলেছেন, আওয়ামী লীগ বা বিএনপি যে-ই হোক, বাংলাদেশে বিরোধী দলের ভূমিকা গঠনমূলক নয়।[৮৭] টিআইবি মন্তব্য করেছিল এভাবে, 'সংসদে কথা বলতে না দেয়া ও বিরোধী দলকে পাশ কাটিয়ে

---

[৮৪] সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, ১৫ ডিসেম্বর, ২০০৯, , পৃঃ ৩।

[৮৫] হাসান, সোহরাব, বিএনপি সংসদে যাবে কি যাবে না, দৈনিক প্রথম আলো, ২৮ ডিসেম্বর, ২০০৯,পৃঃ১৩।

[৮৬] হাসান, সোহরাব, বর্জনে কি অর্জন হয়, দৈনিক প্রথম আলো, ১২ জুন, ২০১০, পৃঃ ১৩।

[৮৭] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

যাওয়ার অভিযোগ তুলে বিরোধী দল সংসদ বর্জন করায় শুধু সংসদীয় রাজনীতির বিকাশধারা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে না, দেশে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা আদৌ টিকে থাকবে কি না সে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য শর্তহীনভাবে বিরোধী দলকে সংসদে যোগদান করতে হবে। সঙ্গত কারণেই তাই প্রশ্ন উঠতে পারে, বিরোধী দলের না হয় 'রাজনৈতিক এজেন্ডা' রয়েছে সংসদ বয়কট করার, কিন্তু সরকারি দলের সংসদ সদস্যরা তাহলে সংসদ অধিবেশনে যোগ দেয়ার ব্যাপারে আগ্রহ হারিয়ে ফেলছেন কেন? এখানে এসে যায় মূল প্রশ্নটি, আর তা হচ্ছে, সংসদীয় রাজনীতির ব্যাপারে তাদের অনাগ্রহ। সংসদ হচ্ছে একটা 'বিতর্কের' জায়গা। এখানে বিতর্ক হবে। যুক্তি তুলে ধরা হবে। পাল্টা যুক্তি আসবে। তারপর আইনটি প্রণয়ন করা হবে। জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সংসদে আলোচনা হবে, সেখানে সিদ্ধান্ত হবে। কিন্তু তা কি হচ্ছে? কোনো জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সেখানে কি সার্বজনীন সিদ্ধান্ত হয়েছে? কোনো একটি 'শক্তি' কি চাচ্ছে সংসদকে অকার্যকর করতে? আমরা তো এ ধরনের সংসদ চাইনি। সংসদ হচ্ছে একটি পবিত্র জায়গা। কিন্তু আমরা সেখানে কি দেখি? সংসদে কালো পতাকা দেখানো হয়। সংসদে রাজপথের মতো স্লোগান দেয়া হয়। কোন্ সংসদ সদস্য কোন্ মহিলার সঙ্গে 'ফষ্টিনষ্টি' করছে, সংসদীয় আলোচনায় স্থান পায় সেবব বিষয়। সংসদে উচ্চস্বরে কথা বলা, গালিগালাজ করা একটা সাধারণ ব্যাপারে পরিণত হয়েছে এখন। স্পিকারকে ঘেরাও করে তাকে সংসদ অধিবেশনে যেতে না দেয়ার প্রচেষ্টা আর যাই হোক গণতন্ত্রসম্মত নয়। সংসদ ও সংসদের বাইরে বিরোধীদলের আচরণ কতটুকু গণতন্ত্রসম্মত- আজ সঙ্গত কারণেই এ প্রশ্ন উঠতে পারে। সরকার আর বিরোধী দলের সমন্বয়েই গড়ে ওঠে সংসদীয় রাজনীতি। সংসদের বিরোধী দল না থাকলে যেমনি সংসদ পূর্ণতা পায় না, ঠিক তেমনি সরকারকে বাদ দিয়ে বিরোধীদল এককভাবে সংসদীয় রাজনীতির বিকাশ ঘটাতে পারে না। এ ক্ষেত্রে অবশ্য বিরোধী দলের ভূমিকা ব্যাপক। সংসদীয় রাজনীতিতে বিরোধী দলকে বলা হয় সরকারের একটা অংশ। সংসদে বিরোধী দলের প্রধানের মর্যাদা একজন মন্ত্রীর সমান। সুতরাং বোঝাই যায়, সংসদীয় রাজনীতিতে বিরোধী দলের ভূমিকা কত ব্যাপক।

বাংলাদেশের গণতন্ত্র রক্ষাকর্তারা অল্পেই অধৈর্য হয়ে যান। পাঁচ বছর পর পর ক্ষমতায় আসেন, কিন্তু বিরোধী দলের আসনে বসতে পছন্দ করেন না। পশ্চিমবঙ্গে ৩৩ বছর ধরে ক্ষমতায় আছে বামফ্রন্ট। বিরোধী কংগ্রেস ও তৃণমূলের আসনসংখ্যা কখনোই এক-তৃতীয়াংশের বেশী ছিল না, এখনো নেই। কিন্তু তাই বলে তারা বছরের পর বছর অধিবেশন বর্জন করে না। অথচ এক্ষেত্রে বাংলাদেশের চিত্র একেবারেই ভিন্ন এবং তা সংসদীয় সংস্কৃতির পরিপন্থী। সংসদ বর্জন ও ওয়াক আউট সংস্কৃতিকে যদি পরিহার না করা যায় তাহলে এ সকল নিম্নমানের রাজনৈতিক সংস্কৃতিই বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্র ও শক্তিশালী কোন রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক কাঠামো বিনির্মাণ করা সম্ভব হবে না।

Dhaka University Institutional Repository

৫.১১ নামকরণ, নাম কর্তন ও ছবির রাজনীতি

কোন দেশের সরকারি প্রতিষ্ঠান বা স্থাপনার নাম করণের সঙ্গে সে দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের একটি গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। এ কারণে এ সকল স্থাপনার নামকরণ মূলত এমনভাবে করা হয় যাতে ঐ নামকরণের মাধ্যমে জাতির সত্যিকার পরিচয় ফুটে ওঠে। পৃথিবীর সব দেশেই বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান ও স্থাপনার নাম জাতীয় নেতাদের নামে রাখার চল আছে।[৮৮] বাংলাদেশেও এ ধরণের রাজনৈতিক সংস্কৃতি বিদ্যমান। তবে উন্নত বিশ্বের রাজনৈতিক সংস্কৃতির সাথে আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতির অনেক পার্থক্য রয়েছে।

ব্যক্তিকেন্দ্রীক ও ব্যক্তিনির্ভর রাজনীতি চর্চা বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক সংস্কৃতির অন্যতম একটি সমস্যা। এটা সংসদীয় গণতন্ত্রের জন্য মারাত্মক হুমকি স্বরূপ। এখানে এক দলের সদস্যরা অন্যদলের সদস্য ও নেতৃত্বের প্রতি অসম্মান ও অনীহা প্রদর্শন করতে অনেক বেশী গৌরব বোধ করে।[৮৯] আজকের বিশ্বের বহু উন্নত দেশেই ভিন্ন মতের ভিন্ন আদর্শের নেতৃত্বের মধ্যে পারস্পারিক সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শনের বহু নজীর রয়েছে। পৃথিবীর অনেক দেশের অফিস-আদালতে তাদের জাতীয় নেতা, রাষ্ট্রপতি এবং জাতির জনকের ছবি টানানোর প্রচলন রয়েছে। অনেক দেশের জাতীয় কারেন্সিতে এ ধরনের ছবি সম্বলিত করার যথেষ্ট উদাহরণ রয়েছে। জার্মানিতে ইউরো চালু হওয়ার আগে তাদের জাতীয় কারেন্সিতে জাতীয় নেতাদের ছবি ছিল। এ জন্য সেখানে কোনো আইন প্রণয়ন করতে হয়নি। এসব দেশে অফিস-আদালতে ছবি টানানোর বা কারেন্সিতে ছবি থাকার বা না থাকার বিষয়টি নিয়ে কেউ কোনো দিন আপত্তি করেনি। পৃথিবীর এসব দেশে জাতীয় নেতৃত্ব নিয়ে নেই কোন বিতর্ক, নেই দলাদলি, নেই রাজনৈতিক কোন্দল। কিন্তু এক্ষেত্রে বাংলাদেশের চিত্রটি একেবারেই ভিন্ন। এখানে জাতীয় নেতা, রাষ্ট্রপতি, জাতির জনকের ছবি টানানোর জন্য আইন পাস করতে হয়। অথচ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জাতীয় নেতাদের সম্মান জানানো হয় ছবি টানানোর মধ্যে দিয়ে। সে সব দেশে এর জন্য কোনো আইন প্রণয়ন করার দরকার হয় না। আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় আসার পর নির্বাহী আদেশ এবং পরবর্তীতে আইন করে জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি অফিস আদালতে টানানোর ব্যবস্থা করেছিল। ২০০১ সালে চারদলীয় জোট ক্ষমতায় আসার পাঁচ মাস পর একটি আইন পাস করেছিল ওই ছবি টানানোর ব্যবস্থা রহিতকরণের। তবে এর পাশাপাশি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ভবিষ্যতে শেখ মুজিব ও জিয়াউর রহমান উভয়ের ছবি প্রদর্শনের পক্ষে মত দিয়ে সংসদে একটি প্রস্তাব রেখেছিলেন। কিন্তু এ প্রস্তাবে আওয়ামী লীগ সন্তুষ্ট না হয়ে এর প্রতিবাদে হরতাল

---

[৮৮] হাসান, সোহরাব, ২০১০, নামকরণ ও নামকর্তনের রাজনীতি, দৈনিক প্রথম আলো, ডিসেম্বর ১৯, পৃ : ১৩।

[৮৯] রহমান, মো: এখলাছুর ও খুশী, ইসমত আরা, ২০১০, বাংলাদেশের সংসদীয় রাজনৈতিক সংস্কৃতির ঐতিহাসিক ও সাম্প্রতিক প্রবণতা ঃ একটি বিশ্লেষণ, বাংলা ভিশন, ভল্যুয়ুম: ১, সংখ্যা: ১, মে' ২০১০, পৃ : ১৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

আহ্বান করেছিল। এই হলো আমাদের দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির বাস্তব চিত্র।[৯০] জাতীয় প্রতিষ্ঠানের নামকরণ জাতীয় নেতাদের নামে হওয়া অর্থ হলো তাদের প্রতি সম্মান দেখানো। পৃথিবীর অনেক দেশেই বড় বড় স্টেডিয়াম, বিমান বন্দরের নামকরণ করা হয় সে দেশের জাতীয় নেতৃত্ব ও ইতিহাসে বরণীয় ব্যক্তিত্বের নামানুসারে। বাংলাদেশের রাজনীতিতেও এ ধরণের সংস্কৃতি বিদ্যমান। কিন্তু সমস্যা হলো বাংলাদেশের সরকারে যখন যে দল ক্ষমতায় থাকে তখন তারা সবকিছুই নিজেদের নামে করে নিতে চায়। পাশাপাশি অন্য দলের নাম কর্তনে মরিয়া হয়ে ওঠে। এ ব্যাপারে মন্ত্রীসভায় কমিটি হয়, কমিটির মিটিং হয় এবং সর্বশেষে নাম পরিবর্তন ও নামকরণের ব্যাপারে নীতিগত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এ সকল কাজ সব সরকারের আমলেই হয়ে থাকে। কিন্তু আশ্চার্যের বিষয় হলো, এ সকল কাজকর্ম ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ সবকিছুই হয়ে থাকে ক্ষমতাসীন নিজ দলীয় মন্ত্রী, সংসদ সদস্য কিংবা সমমনা নেতৃস্থানীয় রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে। অথচ সংসদীয় গণতন্ত্রে বিরোধী দলের ভূমিকা অগ্রগন্য হওয়া সত্ত্বেও এসব ক্ষেত্রে তাদের মতামতের কোন ভূমিকা থাকে না। সরকারি দল অর্থাৎ ক্ষমতাসীন দলের দলের ইচ্ছার বাস্তবায়নই এখানে মুখ্য। এই হলো বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি, সংসদীয় গণতন্ত্রের বাস্তব চিত্র। ২০০১-২০০৬ সালের চারদলীয় জোট সরকারের আমলে কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ও প্রতিষ্ঠানের নাম বদল করা হয়েছিল তাই বর্তমান সরকারও ক্ষমতায় এসে সেগুলো আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এর পেছনে যুক্তি হলো, জোট সরকার গায়ের জোরে নাম বদলে ফেলেছিল। জোট আমলে প্রতিষ্ঠিত স্থাপনা ও প্রতিষ্ঠানের পছন্দসই নাম তারা দিতে পারতো এবং দিয়েছেও। কিন্তু আগের সরকারের গড়া প্রতিষ্ঠানের নাম তারা পাল্টাবে কেন? কোন যুক্তিতে তারা ঢাকার বঙ্গবন্ধু নভোথিয়েটার কিংবা চট্রগ্রামের এম এ হান্নান বিমানবন্দরের নাম পাল্টাল?[৯১] আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়, বিগত (১৯৯৬-২০০১) অওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে নামকরণ করা শতাধিক প্রতিষ্ঠান ও স্থাপনার নাম বিএনপির নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট সরকার পাল্টে দেয়। এসব প্রতিষ্ঠান ও স্থাপনার মধ্যে বঙ্গবন্ধু সেতুর নাম পরিবর্তন করে যমুনা সেতু, চট্রগ্রামের এম এ হান্নান অন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নাম পাল্টে শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামের নাম পাল্টে চট্রগ্রাম বিভাগীয় স্টেডিয়াম, শেখ হাসিনা জাতীয় যুবকেন্দ্রের নাম জাতীয় যুব কেন্দ্র, শহীদ সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালের নামকরণ করা হয় বেগম খালেদা জিয়া মেডিকের কলেজ ও শহীদ সোহরাওয়ার্দী হাসপাতাল, চন্দ্রিমা

---

[৯০], রহমান, ড. তারেক শামসুর, ২০০২, ছবির রাজনীতি আর রাজনীতির ছবি, দৈনিক ইত্তেফাক, ৫ এপ্রিল, পৃ ঃ ৫।

[৯১], হাসান, সোহরাব, প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

উদ্যানকে করা হয় জিয়া উদ্যান।[৯২] আওয়ামী লীগ আমলেও দেশের বিভিন্ন স্থাপনার পূর্বনাম পরিবর্তন করে নতুন নামকরণ করা হয়েছিল। ঢাকা স্টেডিয়ামের নাম পরিবর্তন করে বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়াম যমুনা সেতুর পরিবর্তে বঙ্গবন্ধু সেতু, পিজি হাসপাতালের নাম পরিবর্তন করে বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, ধানমন্ডি মহিলা কমপ্লেক্সের নাম সুলতানা কামাল কমপ্লেক্স, শেখ রাসেল সড়ক, শেখ মনি সড়কের মতো বিভিন্ন পরিবর্তন শুরু হয়।[৯৩]

বাংলাদেশের রাজনীতিতে এই নামকরণ ও নামকর্তনের অসুস্থ প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল পাকিস্থান আমল থেকে। বৃটিশ আমলে স্থাপিত অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান, স্থাপনা ও সড়কের নাম বদলে দিয়েছিল পাকিস্তানি শাসকেরা। স্বাধীনতার পর আমরা পাকিস্তান আমলের প্রায় সব নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছি। বাংলাদেশে বর্তমানে দুটি বৃহৎ রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র মধ্যেই মূলত এই নামকরণ ও নামকর্তনের অসুস্থ প্রতিযোগিতা চলছে। এই অপসংস্কৃতির কবল থেকে বেরিয়ে আসতে না পারলে দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির ইতিবাচক পরিবর্তন ও সংসদীয় গণতন্ত্রের বাস্তবায়ন কোনদিনও সম্ভব হবে না।

পৃথিবীর বহু দেশ বহু দেশে বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রচলন রয়েছে। কিন্তু তাদের মধ্যে এ ধরণের হীন ও অসুস্থ রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা নেই। ভারতে কংগ্রেস ও বিজেপির মধ্যে আদর্শ ও নীতির মধ্যে পার্থক্য আছে অনেক। অটল বিহারি বাজপেয়িসহ বিজেপির অনেক নেতাই ছিলেন ইন্দিরা গান্ধীর জরুরি অবস্থার কঠোর সমালোচক। কিন্তু ক্ষমতায় এসে তাঁরা ইন্দিরা গান্ধী বিমানবন্দর বা জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম মুছে ফেলেননি। কংগ্রেস রাজনীতির আরেক সমালোচক সিপিএমের প্রধান নেতা জ্যোতি বসু কলকাতার যে বাড়িতে থাকেন তার নাম ইন্দিরা ভবন।[৯৪] অথচ বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির চিত্রটি একবারেই ভিন্ন। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে গঠিত এবারের মহাজোট সরকার সম্প্রতি 'জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের' নাম পরিবর্তন করে 'ঢাকা হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর' করেছে। এটা না করলে কি হতো? বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে নামকরণের এই অসুস্থ প্রতিযোগিতা ছিলনা। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু নিজের নামে বড় কোন প্রতিষ্ঠান করেছেন এমন কোন নজির নেই। বরং তিনি পূর্বসূরি শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হকের নামে রাজধানীর উত্তরাংশের নাম রেখেছিলেন, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নামে ঢাকার সবচেয়ে বড় উদ্যান, এবং তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার নামে

---

[৯২] প্রাগুক্ত।

[৯৩] প্রাগুক্ত।

[৯৪] মোরশেদ, আবুল কালাম মনজুর, দৈনিক জনকণ্ঠ ২৯ মার্চ, ২০০২, পৃ ঃ ৭।

Dhaka University Institutional Repository

সবচেয়ে বড় সড়কের নাম রেখেছিলেন। জিয়াউর রহমানও নামের কাঙ্গাল ছিলেন বলে জানা নেই। বর্তমানে কিছু স্বার্থবাদী ও কায়েমি রাজনৈতিক নেতারা নিজেদের স্বার্থবাদিতাকে ঢেকে রাখার জন্য বঙ্গবন্ধু ও জিয়াউর রহমানের নাম ব্যবহার করে চলেছেন।

সরকারী দলের বা বিরোধী দলের, জীবিত কিংবা মৃত যাই হোক না কেন সকল জাতীয় নেতৃত্বের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। জাতীয় নেতারা সম্মানের পাত্র। তারা সাধারনত দল, মত ও রাজনীতির উর্ধ্বে থাকবেন। তারা সম্মানিত হবেন জীবদ্দশায় এবং মৃত্যুর পরও জাতি তাদের শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে। এটাই সুস্থ্য রাজনীতি। এদেশে মওলানা ভাসানী, শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, জিয়াউর রহমান আজীবন সাধারন জনগণ ও দেশের জন্য কাজ করে গেছেন। ক্ষমতায় যাওয়ার বা নেতা হওয়ার রাজনীতি তারা কোনো দিন করেননি। জনগণই ভালবেসে তাদেরকে ক্ষমতা দিয়েছে, নেতা বানিয়েছে। আমরা এখন যে সংসদীয় গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিকে ধারণ করছি তার জন্য সোহরাওয়ার্দীর অনন্য অবদান রয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের মজবুত ভীত গঠনে মওলানা ভাসানীর অবদানকে জাতি কখনও ভুলতে পারবে না। এ দেশের প্রতিটি গণতান্ত্রিক ও স্বাধীনতা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যে নেতৃত্ব ও অবদান বাঙ্গালী জাতি তা কিভাবে অস্বীকার করবে! অস্বীকার করা যাবে কি জিয়াউর রহমানের অবদান? মুক্তিযুদ্ধের সশস্ত্র সংগ্রামে জীবন বাজি রেখে তিনি দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছেন। পরবর্তীতে দেশের রাষ্ট্রপতি হয়েছেন। দেশের উন্নতির জন্য নিরলস কাজ করেছেন।

জাতির প্রতি, রাষ্ট্রের প্রতি যিনি যে অবদান রেখেছেন তাকে তার স্বীকৃতি দিতে হবে। এ অবদানের মধ্যে কোন প্রতিযোগিতা ও তুলনা করা ঠিক হবে না। ভাসানীর অবদানের সঙ্গে যেমন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের অবদানের তুলনা করা যাবে না, ঠিক তেমনি বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে জিয়াউর রহমানের তুলনা চলে না। সবাই যার যার স্থানে ছিলেন স্বাতন্ত্র্য এবং নিজ নিজ অবস্থানে থেকে তারা জাতিকে নেতৃত্ব দিয়ে গেছেন। তাদের মধ্যে ছিল না কোন অহংকার, ছিল না কোন বৈরিতা, শঠতা ও প্রবঞ্চনা। তবে আমাদের মধ্যে কেন এ বৈরিতা, হীনমন্যতা, দলাদলি ও সাংঘর্ষিক প্রবণতা? কেন তাদের প্রতি আমাদের এ অসম্মান? কেন তাদের স্মরণে নির্মিত স্থাপনার নাম পরিবর্তন ও নাম কর্তনের এ অসুস্থ্য প্রতিযোগিতা? আমাদের অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে জাতীয় নেতৃত্বের প্রতি অসম্মানের এ সাংস্কৃতিক ধারা যদি অব্যাহত থাকে তাহলে অনাগত ভবিষ্যত প্রজন্মও তো আমাদেরকে এভাবেই মূল্যায়ণ করবে। আর পাশাপাশি অমাদেরকে এটাও ভাবতে হবে যে, এ ধরনের হীন মানসিকতা নিয়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে আমরা কতটা উন্নত করতে পারবো?

Dhaka University Institutional Repository

৫.১২ বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও রাজনীতিকদের দলবদলের রাজনীতি

বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে রাজনীতিকদের দলবদলের রাজনীতি। বাংলাদেশের রাজনীতিক দলবদল সব সময়ই ছিল এবং থাকবে। এ দলের নেতাদের সে দলে যাওয়া, সে দলের নেতাদের এ দলে আসা সাধারণ ঘটনা। দেশের সামগ্রিক রাজনীতিক এখন এটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। মতাদর্শের কারণে দলবদল দোষের বলে গণ্য হতে পারে না। যে কোনো নেতার কোনো সময় মনে হতে পারে তার দলের আদর্শের চেয়ে অন্য দলের আদর্শ উত্তম। সে ক্ষেত্রে তিনি দলবদল করে পছন্দের দলে যোগদান করতে পারেন। এটা অনেকটা রাজনৈতিক সততার পরিচয় বহন করে। দলের আদর্শের প্রতি কোন কারণে বীতশ্রদ্ধা এলে কিংবা ওই মতাদর্শ অনুসরণ অসম্ভব হয়ে পড়লে দল ত্যাগ করাই শ্রেয়। তা দলের জন্যও ভালো, ওই নেতার জন্যও ভালো। পক্ষান্তরে এ অবস্থায় দলে থাকা আত্মপ্রবঞ্চনার শামিল এবং সংশ্লিষ্ট দলের জন্য ক্ষতিকর। রাজনৈতিকদের কারো রাজনৈতিক অসততা কাম্য হতে পারে না।

আদর্শের কারণে দলবদল আমাদের দেশে কদাচিৎ ঘটতে দেখা যায়। অধিকাংশ দলবদলের ঘটনা ঘটে ব্যক্তিস্বার্থের কারণে। ব্যক্তির চেয়ে দল বড়, দলের চেয়ে দেশ বড় এটা এখন কথায় কথায় পর্যবসিত হয়েছে। ব্যক্তির স্বার্থশিকারী প্রবণতা এতটাই প্রবল হয়ে উঠেছে যে, দল তো দল, দেশের স্বার্থও মূল্য পায় না। পদ-পদবি, অর্থ ও ক্ষমতাপ্রত্যাশীদের ভিড় রাজনৈতিক দলগুলোতে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তারা আদর্শের ধার ধারেন না। লাভ-সুবিধা যেখানে বেশী সেখানেই তারা সুযোগমতো ভিড়ে যান। এ কারণেই প্রায় প্রতিটি রাজনৈতিক দলেই আদর্শের বিষয়টি গৌণ হয়ে পড়েছে।[৯৫]

সাধারণত রাজনীতি ও রাজনৈতিক দলগুলোর লক্ষ্য হলো জনগণ ও দেশের কল্যাণ, উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি। এই লক্ষ্য অর্জনে প্রতিটি দলের আর্দশ, পথ ও প্রতিক্রিয়া আলাদা। আলাদা বলেই তারা পরস্পরের থেকে পৃথক। আদর্শের প্রতি অবিচল আনুগত্য থাকলে কোনো দলের নেতার পক্ষেই অন্য কোনো দলে যোগদান করা সম্ভব নয়। কিন্তু আদর্শের বন্ধন যেহেতু যথেষ্ট মজবুত নয়, সুতরাং দলবদল স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজনীতিবিদদের এরূপ আদর্শ বিমুখতা কেবল অনভিপ্রেত নয়, দেশের জন্য উদ্বেগজনকও বটে। রাজনৈতিক দলগুলো আদর্শের রাজনীতি নয়, ক্ষমতার রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছে। ক্ষমতায় যাওয়াই তাদের একমাত্র লক্ষ্যে পরিণত হয়েছে।

---

[৯৫] মান্নান, মুনশী আবদুল, দলবদল ঃ আদর্শহীন রাজনীতির নিরুদ্দেশ যাত্রা, দৈনিক ইনকিলাব, ১ সেপ্টেম্বর ২০০১, পৃষ্ঠা ১১।

Dhaka University Institutional Repository

যে কোনো মূল্যে ক্ষমতায় যেতে হবে, এই প্রবণতা দৃঢ়মূল হওয়ার কারণে ব্যক্তির যথেচ্ছাচার বৃদ্ধি পেয়েছে। দলের নেতা-নেত্রীরা সুযোগসন্ধানী ও ক্ষমতাপ্রিয় হয়ে উঠেছেন। দলবদলের এটাই অন্তর্নিহিত কারণ।[৯৬]

রাজনীতিকদের দলবদলের একটা বড় মৌসুম হলো জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচনপূর্বে কয়েক মাস। এ সময় মৌসুমী রাজনীতিকরা হিসাব নিকাশে বসেন। দলে থাকলে লাভ না অন্য দলে যোগ দিলে লাভ, এটা এই হিসাব নিকাশের প্রধান মাপকাঠি। সংসদ সদস্য হতে হবে। দল ক্ষমতায় গেলে মন্ত্রী হতে হবে এ আকাঙ্খা নিয়ে দলের মধ্যে তারা একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হন। ভোটের হাওয়া কোন দিকে সেটাও তারা বিশেষ গুরুত্বে আনেন। দল থেকে আনুকল্য না পেলে কিংবা দলীয় প্রতিদ্বন্দ্বির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সুবিধা করতে না পারলে দল ছাড়ার বিষয়টি তারা বিবেচনায় আনেন এবং আশ্বাস পেলে অন্য দলে নাম লেখান। ক্ষমতায় যাওয়ার সম্ভাবনা আছে এমন দলে যেতে তাদের অধিক আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। দলে থাকতে এদের অনেকের মুখে আদর্শের বুলি উচ্চস্বরে উচ্চারিত হতে দেখা যায়, আবার দলবদলের প্রতিযোগিতায় এরাই থাকেন সবার আগে।[৯৭]

১৯৯১, ১৯৯৬, ২০০১ ও ২০০৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনক উপলক্ষ করে রীতিমতো দলবদলের প্রতিযোগিতা চলেছে। দলীয় আদর্শবদলকারী রাজনীতিকরা প্রধানত বড় দুই দল বিএনপি ও আওয়ামী লীগের প্রতি অতীব আগ্রহী ছিলেন। বিএনপির অনেক নেতা আওয়ামী লীগে এবং আওয়ামী লীগের অনেক নেতা বিএনপিতে যোগ দিয়েছেন। এদের মধ্যে কেউ কেউ মনোনয়ন পেয়েছেন, কেউ কেউ পাননি। এই দু'দলে যারা জায়গা পাননি তারা তৃতীয় দল হিসেবে জাপা (এরশাদ) বা অন্য কোনো দলে যোগ দিয়ে মনোনয়ন পেয়েছেন। আবার জাপা (এরশাদ), জাপা (মঞ্জু) থেকেও কয়েকজন বিএনপি ও আওয়ামী লীগে আশ্রয় পেয়েছেন এবং মনোনয়নও লাভ করেছেন।[৯৮] নড়াইলের ধীরেন্দ্র নাথ সাহা সারাজীবন আওয়ামী লীগ করেছেন। ২০০১ সালের অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নমিনেশন না পেয়ে মাত্র ৭ ঘন্টার নোটিশে বিএনপিতে যোগদান করেছিলেন এবং নমিনেশনও পেয়েছিলেন। ৫০ বছর ধরে ধীরেন্দ্র বাবু যে রাজনৈতিক

---

[৯৬] প্রাগুক্ত।
[৯৭] প্রাগুক্ত।
[৯৮] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বাস লালন করেছিলেন, ৭ ঘন্টার নোটিশেই কি সেটা বদলে গেল? তার "জয় বাংলা" কি "বাংলাদেশ জিন্দাবাদ" হয়েছে? "বাঙালী জাতীয়তাবাদ" কি "বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ" হয়েছে? অপরদিকে জাতীয় পার্টির জনাব ফজলে রাব্বি, জনাব জাফর ইমাম আওয়ামী লীগে যোগদান নমিনেশন পেয়েছিলেন। এভাবে এক দিন আগেও যিনি "বঙ্গবন্ধুর" সৈনিক ছিলেন, একদিন পরে তিনি হয়ে গেলেন জিয়ার সৈনিক। আবার যিনি ছিলেন 'পল্লীবন্ধুর' একান্ত অনুগত অনুসারী, তিনি এখন বঙ্গবন্ধুর বা জিয়ার সৈনিক।

সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক বাস্তবতা এই যে, মৌসুমী রাজনৈতিক দলবদলকারীদের গ্রহণে বিএনপি, জাপা, আওয়ামী লীগ কারোরই অনীহা নেই। এসব দল প্রতিদ্বন্দ্বী অন্য দল থেকে নেতা ভাগিয়ে আনার কূটকৌশল ও তৎপরতা চালিয়ে থাকে। তাদের সাদরে গ্রহণ করে নানাভাবে পুরস্কৃতও করে। এতে দলের অভ্যন্তরে ক্ষোভ, অসন্তোষ তৈরি হয়। ত্যাগী ও একনিষ্ঠ নেতারা প্রায়ই প্রাপ্য অবস্থান ও মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হন। দেখা দেয় দলীয় কোন্দল, দলের ভাঙ্গন ইত্যাদি। অথচ দল এসবের তোয়াক্কা করে না। এটা রাজনৈতিক দলগুলোর নীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। দলীয় আদর্শ বলে আর কোন কিছুরই গুরুত্ব দেয়ার প্রয়োজন বোধ করছে না এসব রাজনৈতিক দল ও রাজনৈতিক নেতৃত্ববর্গ। ক্ষমতায় যেতে হবে এটাই মূল কথা। তাই সেটা যে কোনো উপায়ে হোক না কেন। ক্ষমতাই রাজনৈতিক দলগুলোর ধ্যান ও লক্ষ্য। এতে কারও তেমন একটা মাথা ব্যথাও নেই। এর অন্যতম কারণ রাজনৈতিক দলে আদর্শের চর্চা না হওয়া। আর তাই তো সারা জীবন বিএনপি'র ত্যাগী নেতা হিসেবে পরিচিতি পেয়ে বিএনপি সরকারের রাষ্ট্রপতি হয়ে শেষ পর্যন্ত বদরুদ্দোজা চোধুরীর মত রাজনীতিবিদরাও দল ত্যাগের নিদর্শন রেখেছেন বাংলাদেশের রাজনীতিতে। বিকল্প ধারা বাংলাদেশ নামে আলাদা রাজনৈতিক দলও গঠন করেছেন। এখানেই শেষ নয় বিকল্প ধারার প্রার্থী হিসেবে ২০০৮ সালের নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দিতা করেছেন, বিএনপি'র বিরুদ্ধে বক্তব্যও দিয়েছেন।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, আমাদের দেশে রাজনীতি এখন সর্বাধিক লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত সংসদ সদস্য হতে পারা এ ব্যবসায়ের সবচেয়ে বড় পুঁজি। এজন্যই এত দলবদল। এজন্যই শিল্পপতি ব্যবসায়ী সাবেক আমলা কর্মকর্তাদের এত ভিড়। এজন্যই এতবিদ্রোহ ও স্বতন্ত্র প্রার্থী। এজন্যই মনোনয়নের মূল্য এত বেশী। রাজনীতি এখন রাজনীতি নয়, ব্যবসা মাত্র। এ কথা যখন বলা হয় তখন বুঝতে অসুবিধা হয় না রাজনীতি তার মৌল চরিত্র হারিয়ে ফেলেছে বা ফেলছে।

Dhaka University Institutional Repository

রাজনীতিকে রক্ষা নয়, তাকে দ্রুত অধঃপতনের শেষ সীমায় পৌঁছে দেয়ার আয়োজন যেন জোরদারভাবে চলছে।[৯৯] সবচেয়ে মজার বিষয় হলো দল ত্যাগের ঘটনা এখন আর শুধুমাত্র জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পূর্বে নির্বাচনের প্রার্থীরা করে থাকেন না। সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন, উপজেলা নির্বাচন এমনকি ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনেও প্রার্থীদের মধ্যে দল পরিবর্তনের ঘটনা ঘটছে প্রতিনিয়ত। সম্প্রতি চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচনে আওয়ামী লীগ থেকে বিএনপিতে আসা মন্জুর আলম বিপুল ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়ে মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন। তাছাড়া দল বদলকারী অনেক নেতা কাউন্সিলর কিংবা উপজেলা নির্বাচনে প্রার্থী ছিলেন এবং জয়ী হয়েছেন এমন নজির বহু রয়েছে। দলবদলের রাজনীতি, ব্যবসার রাজনীতি, ক্ষমতা ও অর্থলাভের রাজনীতি, আদর্শহীন রাজনীতি কোন সময়ের জন্যই জাতি ও সাধারণ মানুষের জন্য কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। এতে এক পর্যায়ে সাধারণ মানুষের রাজনীতির প্রতি অনাস্থা অনাগ্রহ তৈরি হতে পারে, যার পরিণতি জাতির জন্য মারাত্মক ও ভয়াবহ রূপ নিতে পারে। কেননা এসকল আদর্শবঞ্চিত নেতৃত্বের কারণে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির আশানুরূপ উন্নতি অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

---

[৯৯] প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

৫.১৩ রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন ও বাংলাদেশের রাজনীতি

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে রাজনীতির ক্ষেত্রটি ক্রমশ বিতর্কিত, জটিল ও অশ্রদ্ধাপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এ জন্য আরো কিছু অবাঞ্ছিত-অনাকাঙ্খিত কারণের সাথে প্রবল ও উৎকটভাবে যুক্ত হয়েছে রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন। বিগত নির্বাচিত চারটি সংসদীয় সরকারের সময়ে রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের ঘৃণ্য প্রবণতাটি ক্রমশ শক্তিমান হয়েছে। কলুষিত হয়েছে দেশের রাজনীতি, রাজনৈতিক ব্যবস্থা, সরকার ব্যবস্থা, রাজনৈতিক সংস্কৃতি সবকিছুই। অপরাধী বা দুর্বৃত্ত ব্যক্তিরা যখন রাজনীতিতে নেতৃত্ব পায়, রাজনীতির ক্ষমতা ও প্রাধান্য ব্যবহার করে তারা ব্যক্তিগত-গোষ্ঠীগত স্বার্থ উদ্ধার করে, যা অনিবার্যভাবেই দেশ-জাতি-জনগণের জন্য বিভিন্ন প্রকারের ক্ষতি ও বিপর্যয় ডেকে আনে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে রাজনীতির দুর্বৃত্তায়নে উল্লিখিত দুই প্রধান রূপকেই কার্যকর দেখা যায়। এ দেশের রাজনীতিতে দীর্ঘ সময় থেকে বা নিয়মিত প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী নেতা-কর্মীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ, যদিও অধিকাংশ নয়, কমবেশি অপরাধমূলক কার্যক্রমে যুক্ত হচ্ছিল। বাংলাদেশি শীর্ষ বা নাম জানা রাজনীতিকদের একটি অংশ পরিচিত শিল্পপতি-ব্যবসায়ী হিসেবে। নেতৃত্বের পরবর্তী স্তরগুলোতেও ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথে সম্পৃক্ত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ব্যক্তিবর্গ রয়েছেন বাংলাদেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোতে। পেশাদার ব্যবসায়ী এসব ব্যক্তি দলগুলোর নিয়মিত নেতা-কর্মী হওয়ায় এ দলগুলোর কোনটি রাষ্ট্র ক্ষমতায় বা সিটি কর্পোরেশনের মতো অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের ক্ষমতায় আসীন হলে তাদের কেউ কেউ বেআইনী প্রক্রিয়ায় অর্থ-বিত্ত অর্জনের দৃষ্টিগ্রাহ্য চেষ্টা করেছেন। নিয়মিত রাজনীতিক এসব ব্যবসায়ীর অপরাধ বা দুর্নীতি প্রবণতা বাংলাদেশে খাঁটি অর্থে নিকট অতীতের কিছু সময়েই কেবল সীমা লংঘন করেছে বলে মনে করা হয়। কিন্তু রাজনীতির দুর্বৃত্তায়নের অন্য রূপটি বাংলাদেশে অপরাধ ও দুর্নীতির এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করে চলছিল বহুআগে থেকে। বাংলাদেশে রাজনৈতিক নেতৃত্বের বিভিন্ন স্তরে হঠাৎ করে ব্যবসায়ী-পুঁজিপতিদের আসীন করার প্রবণতা বিগত চারটি সরকারের মেয়াদেই উল্লেখযোগ্য পরিমাণে দেখা গেছে। অরাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ বিশেষত 'বাণিজ্যপ্রবণ ব্যক্তিদের' অনেককে বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো রাজনৈতিক পদ-পদবি প্রদান করেছে। দলগুলো নিজেদের দীর্ঘদিনের নেতাকর্মীদের বাদ দিয়ে বা বঞ্চিত করে ব্যবসায়ীদের মাঝে 'নেতৃত্ব বিতরণ' করার ফলে দুর্বৃত্তায়নের ধারণাটি নাগরিক সমাজে তীব্র

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। জাতীয় সংসদসহ বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নির্বাচনে মনোনয়ন প্রদানের সময় মোটা অংকের অর্থের বিনিময়ে 'অরাজনৈতিক ব্যবসায়ী-বিত্তবানদের' মনোনয়ন প্রদানের ঘটনা ঘটেছে বেশ কিছু। সপ্তম ও অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এরকম মনোনয়ন প্রদানের ঘটনা নাগরিক সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এ বিষয়টি এক পর্যায়ে 'মনোনয়ন বাণিজ্য' বলে নিন্দিত হতে থাকে। স্থগিত হয়ে যাওয়া নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়ায় প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি বড় দলের পাশাপাশি নবগঠিত ২/৩টি দলের বিরুদ্ধেও এই মনোনয়ন বাণিজ্যের অভিযোগ এসেছে। এটি রাজনীতি ও রাজনীতিকদের বিরুদ্ধে জনমনে ক্ষোভ ও ক্রোধ সৃষ্টি করে।

রাজনীতির দুর্বৃত্তায়নের আরেক নমুনা দলের গুরুত্বপূর্ণ দলীয় পদ বহুলালোচিত চাঁদাবাজি কার্যক্রমে সহায়ক হয়ে থেকে। কিছু ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন দলের নেতারা প্রধান বিরোধী দলের নেতাদের সাথে সমঝোতার ভিত্তিতে চাঁদাবাজি করেছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। কেউ কেউ আবার সরকারি ও বিরোধী দলের গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন থেকে ক্ষমতার অপব্যবহার করে একের পর এক দুর্নীতি করেছেন। অষ্টম সংসদ পরবর্তী জরুরি অবস্থা জারির পর দেখা যায়, সপ্তম ও অষ্টম সংসদের অধিকাংশ মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী, সাংসদ ও পার্টি নেতৃবৃন্দ দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার, সরকারী ত্রাণ সামগ্রী আত্মসাত, আইন অমান্য করে বন্য প্রাণী সংরক্ষণ, বিদেশে অর্থ পাচার, সরকারী খাস জমি দখলের অভিযোগে গ্রেফতার হন। এ থেকে প্রতীয়মাণ হয় যে, সংসদ সদস্যগণ সংসদে অনুপস্থিত থেকে ও ক্ষমতার অপব্যবহার করে ব্যক্তিগত সম্পত্তি অর্জন ও বিভিন্ন প্রকার দূর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েন। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে, সাংসদগণ জনপ্রতিনিধি হিসেবে পরিচয় দিয়ে সংসদকে সকল কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দু বললেও কার্যতঃ সংসদকে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্যবহার করেছেন নিজেদের ব্যক্তিগত ও দলীয় স্বার্থে। বৈধ করে নিয়েছেন নিজেদের সকল অবৈধ ও নীতি বিবর্জিত অগণতান্ত্রিক কার্যপ্রক্রিয়া। তবে এই সকল রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন রোধে বিগত সরকারগুলি তেমন কোন বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। যে কারণে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় দুর্নীতি মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। বাংলাদেশে দুর্নীতির মাত্রা বিগত কয়েক বছর ধরে এমন চরমে পৌছেছিল যে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টি আই) কর্তৃক প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশ পরপর কয়েকবার সারা বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল। পরবর্তীতে সরকার অবশ্য এ বিষয়ের প্রতি বিশেষ নজর দিয়েছে, গঠন করেছে স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন। কিন্তু এখন প্রশ্ন দেখা দিয়েছে,

Dhaka University Institutional Repository

দুর্নীতি দমন কমিশন দুর্নীতিরোধে সঠিক ভূমিকা পালন করছে কিনা। আওয়ামী লীগ ২০০৯ সালে ক্ষমতা গ্রহণের একবছর পর দুর্নীতি দমন কমিশন সম্পর্কে সরকারের নেয়া পদক্ষেপগুলির বিষয়ে দৈনিক প্রথম আলোর উদ্যোগে এক জনমত জরিপ করা হয়। জরিপে অংশ নেয়া ৪ শতাংশ উত্তর দাতা মনে করেছেন বর্তমান সরকার দায়িত্ব নেয়ার পর দুদক কিছুটা দুর্বল হয়েছে। উত্তর দাতাদের ৩২ শতাংশ মনে করেন দুদক আগের চেয়ে শক্তিশালী হয়েছে। ২৩ শতাংশ মনে করেন অবস্থা অগের মতই আছে। বাকি ৫ শতাংশ বলেছেন এ বিষয়ে তারা কিছুই জানেন না।[১০০]

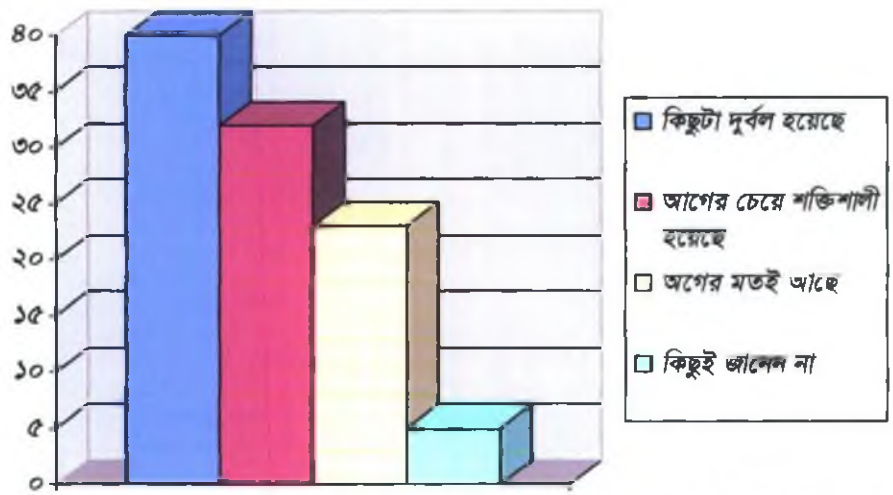

চিত্র : ৫, দুর্নীতি দমন কমিশন সম্পর্কে সরকারের নেয়া পদক্ষেপগুলি বিষয়ে জনমত জরিপ।
উৎস : দৈনিক প্রথম আলোয় (০৬.০২.১০) প্রকাশিত জনমত জরিপের ফলাফলের ভিত্তিতে গবেষক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত।

এভাবে দুর্নীতি মাত্রা যদি দিন দিন বাড়তে থাকে এবং এর বিরুদ্ধে যদি সরকার কোন বাস্তবমুখী জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণ না করে তাহলে সত্যিকার পেশাদার, দক্ষ ও দেশপ্রেমিক রাজনীতিবিদদের অভাবে স্বার্থান্বেষী, চাঁদাবাজ, দুর্নীতিবাজ নেতৃত্ব বাংলাদেশে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ও সুষ্ঠু রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক চর্চাকে ব্যহত করবে।

[১০০] সূত্র : দৈনিক প্রথম আলো, ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১০।

Dhaka University Institutional Repository

৫.১৪ বাংলাদেশের রাজনীতিতে ধর্মের প্রভাব

রাজনীতি হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার মধ্য দিয়ে মানুষ তার রাজনৈতিক আদর্শ অনুসারে নিজের সমাজকে বিন্যস্ত করে।[১০১] আর রাজনীতিতে ধর্ম একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি। এটি কেবল ব্যক্তিগত বিশ্বাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। ধর্ম জনমতেরও উৎস বটে। সমাজ জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রেও ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আর মানুষের ধর্ম বিশ্বাস তার রাজনৈতিক চেতনাকে নানাভাবে নিয়ন্ত্রণ করে।[১০২] বাংলাদেশের রাজনীতিতে ধর্ম বড় ধরনের প্রভাব ফেলছে।[১০৩] বাংলাদেশের মানুষ অভ্যন্ত সহজ-সরল। শতকরা ৯০ ভাগ মুসলমান অধ্যুষিত এই জনপদের ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রেখে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান যাদের বৈশিষ্ট্য ও কামনা। বাংলাদেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক পরিমন্ডলে ধর্মকে রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা সম্ভব নয়। ব্রিটিশ আমল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত এই ভূখণ্ডের রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, রাজনীতিতে ধর্ম বরাবরই একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে। অবশ্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ধর্ম ব্যবহৃত হয়েছে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বার্থগত আসনকে মজবুত করার হাতিয়ার হিসেবে।

তবে বাংলাদেশের রাজনীতিতে যে শুধু ধর্মের প্রভাব রয়েছে তাইই নয়। পৃথিবীর বহু দেশের রাজনীতিতে ধর্মের প্রভাব আছে। যেমন- আলজেরিয়ায় ইসলামিক স্যালভেশন ফ্রন্ট, তুরস্কে জাস্টিস এন্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টি, পাকিস্তানে জামায়াতে ইসলামী, ফিলিস্তিনে হামাস, সুদানে দি উম্মাহ পার্টি, মালয়েশিয়ায় দি প্যান মালয়েশিয়া ইসলামিক পার্টি, ইন্দোনেশিয়ায় দি মুসলিম স্কলার্স পার্টি, জর্ডানে মুসলিম ব্রাদার হুড, শ্রীলঙ্কায় জামায়াতে ইসলামী শ্রীলঙ্কা নিজ নিজ দেশের রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার ও প্রভাব রেখে চলেছে। আমাদের প্রতিবেশী ধর্মনিরপেক্ষ দেশ ভারতে ধর্মভিত্তিক দল বিজেপি গত পার্লামেন্টে ক্ষমতায় ছিল, বর্তমানে গুজরাটে ক্ষমতাসীন। এছাড়াও সেখানে রয়েছে জামায়াতে ইসলামী হিন্দু, নিখিল ভারত মুসলিম লীগ, শিব সেনা, রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘ ইত্যাদি নামে ধর্মীয় সংগঠন।

পাকিস্তান আমলেও রাজনীতিতে ধর্মের প্রভাব লক্ষ্যণীয়। ১৯৪৭ সালে ধর্মভিত্তিক দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছিল। ১৯৫৪ সালে শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হকের পাকিস্তান কৃষক শ্রমিক পার্টি, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও ভাসানীর আওয়ামী মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলাম পার্টি, গণতন্ত্রী দল

---

[১০১] Markl, Peter, 1972, Political continuity and Change, Harper and Row Publishers.

[১০২] মোহাম্মদ, ড. হাসান, ২০০৩, বাংলাদেশ : ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতি, গ্রন্থমেলা, ঢাকা।

[১০৩] হোসেন, ড. সৈয়দ আনোয়ার, ১৯৯৯, বাংলাদেশে ধর্মের রাজনীতি, মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, (মাওলানা আব্দুল আওয়াল সম্পাদিত), শিখা প্রকাশনী, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

ও খেলাফতে রব্বানী পার্টির সমন্বয়ে গঠিত যুক্তফ্রন্ট ২১ দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে নির্বাচনে অবতীর্ণ হয়। যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল : কোরআন ও সুন্নাহর মৌলিক নীতির খেলাফ কোনো আইন প্রণয়ন করা হইবে না এবং ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে নাগরিকগণের জীবনধারণের ব্যবস্থা করা হইবে।[১০৪] এ থেকে দেখা যায় যুক্তফ্রন্ট নেতৃত্ব তাদের নির্বাচনী রাজনীতিতে ধর্মকে ব্যবহার করেছিলেন অত্যন্ত সচেতনভাবেই। পাকিস্তান আমলে শেখ মুজিবুর রহমানও রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার করেছেন। ১৯৭০ সালে আওয়ামী লীগের ব্যানারে নির্বাচিত কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যরা সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বিশ লাখ লোকের সমাবেশে শপথ পাঠ করেছিলেন। তারা শপথ নিয়েছিলেন ছয় দফার ব্যাপারে তারা ওয়াদা খেলাপ করবেন না। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তাদের শপথনামা পাঠ করিয়েছিলেন। এই শপথনামার পুরোটাই ছিল ধর্মীয় মূল্যবোধ ও আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত। আল্লার নামে এই হলফনামার শুরু হইয়াছিল। আরবী 'বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম'- এর হুবহু বাংলা তরজমা করে লেখা হয়েছিল পরম করুণাময় আল্লাহ্তালার নামে হলফ করিয়া আমি অঙ্গীকার করিতেছি যে আমাদের শাসনতান্ত্রিক সংবিধান রচনা করিব.....। এমনকি স্বাধীনতা যুদ্ধের গোড়ার দিকে ধর্মের প্রতি, আল্লাহর প্রতি আনুগত্য ও বিশ্বাসের বিষয়টিই স্বাধীনতার মূল্যবোধ ও চেতনা বলে স্বীকৃত হয়। ধর্মীয় চেতনাকে উজ্জীবিত করেই যে দেশের সাধারণ মানুষকে মুক্তিযুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছিল তার উৎকৃষ্ট নজির মেলে ১৯৭১ সালের ১৪ এপ্রিল প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে জনগণের প্রতি যে নির্দেশাবলী প্রদান করা হয় তার মধ্যে। নির্দেশাবলীর শীর্ষেই লেখা হয় "আল্লাহু আকবর"। তারপর স্বাধীনতার প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করে বলা হয়, এ সংগ্রাম আমাদের বাঁচার সংগ্রাম। সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর বিশ্বাস রেখে ন্যায়ের সংগ্রামে অটল থাকুন। স্মরণ করুন: আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিন, "অতীতের চাইতে ভবিষ্যৎ নিশ্চয়ই সুখকর।" বিশ্বাস রাখুন "আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় নিকটবর্তী"।[১০৫]

উপরোক্ত নির্দেশাবলী ছিল সাধারণ জনগণের উদ্দেশ্যে। এটি ছিল প্রবাসী সরকারের পক্ষ থেকে প্রথম নির্দেশনামা। এটি শুরু হয়েছে "আল্লাহু আকবর" দিয়ে। শেষ হয়েছে পবিত্র কুরআনের দু'টি আয়াত দিয়ে। আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বংলাদেশকে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা দেন। একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের প্রধান হয়েও ১৯৭৪ সালে শেখ মুজিব লাহোরে অনুষ্ঠিত ইসলামী সম্মেলন সংস্থার বৈঠকে যোগদান করেন। ১৯৭৫ সালে আওয়ামী লীগ সরকার কর্তৃক

---

[১০৪] আসাদ, আবুল, ২০০৫, একশ' বছরের রাজনীতি, বিসিবিএস, ঢাকা।

[১০৫] উৎস: বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র, ১৯৮২, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, তৃতীয় খন্ড।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী কাউন্ডেশন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। আওয়ামী লীগের অনুসারী ধর্মীয় নেতাদের সংগঠন 'আওয়ামী উলামা পরিষদ' কে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ থাকার সময়েও কার্যক্রম চালাতে দেওয়া হয়। তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারের একজন মন্ত্রী এক ভাষণে বলেন যে, বাংলাদেশ ইসলামী আদর্শ ও শিক্ষার প্রতি আস্থাশীল এবং তার দল ইসলামী আদর্শ, শান্তি, বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে।[১০৬]

বাংলাদেশের রাষ্ট্রক্ষমতায় জিয়াউর রহমান রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার এবং ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোকে এ দেশে পুনরায় রাজনীতি করার সুযোগ দানের মাধ্যমে তিনি রাজনীতিতে নতুন ধারা ও বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছিলেন। ১৯৭৯ সালে পঞ্চম সংশোধনী সংবিধানের প্রারম্ভে বিসমিল্লাহ্-আর-রহমান-আর-রহিম' শব্দগুচ্ছ সন্নিবেশিত করে সংবিধানকে ইসলামী রং দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। দেশসমূহের সাথে ইসলামী ঐক্য গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়।[১০৭]

হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদ রাষ্ট্রপতি থাকাকালীন এক অনুষ্ঠানে বলেছিলেন, ধর্ম হিসেবে ইসলাম থাকবে সকলের শীর্ষে। বাংলাদেশ মুসলমানদের দেশ। এবারের সংগ্রাম দেশকে ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করার সংগ্রাম। ১৯৮৩ সালের ১৮ জানুয়ারী ঢাকায় মাদ্রাসা শিক্ষকদের এক সম্মেলনে তিনি বলেছিলেন, ইসলামের আদর্শ ও রীতিনীতি রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিফলিত করতে হবে। ইসলামের যারা শত্রু, আমাদের সংগ্রাম চলবে তাদের বিরুদ্ধে, আমরা বাংলাদেশকে করবো একটি ইসলামী রাষ্ট্র। ২১ ফেব্রুয়ারী শহীদ মিনার প্রাঙ্গণ ও তার সিঁড়ির উপর নানা ধরণের আল্পনা আঁকাকে তিনি ইসলামী সংস্কৃতি ও রীতিনীতির বিরুদ্ধ বলে ঘোষণা করেন এবং শহীদ দিবসের অনুষ্ঠানে পবিত্র কোরআন শরীফ পাঠ করার আদেশ জারি করেন।

রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহারের দিক থেকে খালেদা জিয়া তার পূর্বসূরীদের পথই অনুসরণ করেন। তিনি তার বক্তৃতা বিবৃতির মাধ্যমে জনগণের ধর্মীয় অনুভূতিকে নিজের অনুকূলে আনার চেষ্টা করেন। পয়লা অক্টোবর ১৯৯৪ ঢাকার মানিক মিয়া এভিনিউতে বিএনপির উদ্যোগে এক মহাসমাবেশে বক্তৃতাকালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বিরোধী দলকে আক্রমণ করে বলেন যে বিরোধী দল বিসমিল্লাহ খেয়ে ফেলতে চায়। তিনি জামায়েতে ইসলামীর সমালোচনা করে বলেন, ইসলামের কথা বলে আরেকটি দল। তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করুন, যারা বলে আমরা ক্ষমতায় গেলে সংবিধান থেকে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম উঠিয়ে দেবো, চার মূলনীতি প্রতিষ্ঠা করবো, ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠা করবো, তাদের সঙ্গে ঐক্য করে বিসমিল্লাহির

---

[১০৬] মোহাম্মদ, ড. হাসান, প্রাগুক্ত।

[১০৭] হক, আবুল ফজল, প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

রাহমানির রাহীম প্রতিষ্ঠা করবো, তাদের সঙ্গে ঐক্য করে বিসমিল্লাহির রাহীম রক্ষা করতে পারবেন? ধর্মনিরপেক্ষতাকে বাদ দিতে পারবেন? আজ তারা এক হয়ে ইসলাম ও বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পর্যন্ত খেয়ে ফেলতে চায়।[১০৮] ১৯৯৬ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও বিএনপির নির্বাচনী প্রচারনার অন্যতম উপাদান ছিল ধর্ম। তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম ভোটারদের ধর্মীয় অনুভূতিকে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে প্রচার করে যে, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে ইসলাম বিপন্ন হবে, সংবিধান হতে ইসলাম উঠিয়ে দেবে, মসজিদে আজানের পরিবর্তে উলুধ্বনি দেবে ইত্যাদি।[১০৯]

১৯৯৬ সালের সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আমরা দেখতে পাই ধর্মনিরপেক্ষ নীতি ও আদর্শে বিশ্বাসী রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন। কিন্তু এ বিজয়ের পেছনে ধর্মনিরপেক্ষতা নয়, বরং ধর্মকেই পুঁজি বা ঢাল হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল। ১৯৯৬ সালের ১২ জুনের নির্বাচনের মাস খানেক পূর্বে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনা ওমরাহ পালনে সৌদি আরব যান এবং সেখান থেকে ফিরে মাথায় কালো স্কার্ফ, শাড়ির বদলে ইসলামী পোশাক হিসেবে বোরকার আদলে সালোয়ার কামিজ, হাতে তসবিহ পড়ে প্রতিটি নির্বাচনী জনসভা এবং প্রচারণায় অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া আওয়ামী লীগের প্রতিটি নির্বাচনী পোস্টারে তসবিহ হাতে শেখ হাসিনার দু'হাত তুলে মোনাজাতের ছবিটি ব্যবহার করা হয়। এখানেই শেষ নয়, যে দলটি সারাজীবন ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি ও আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করলো, জিয়াউর রহমান কর্তৃক সংবিধানে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম লেখার বিরোধীতা করলো, এরশাদ কর্তৃক রাষ্ট্র ধর্ম হিসেবে ইসলামকে স্বীকৃতি দেয়ার সমালোচনায় মুখর ছিলো, সেই আওয়ামী লীগ তাদের নির্বাচনী পোস্টার, ব্যানার , প্রচারপত্র তথা অন্যান্য ডকুমেন্টে আল্লাহ সর্বশক্তিমান লেখার ব্যবহার শুরু করে।[১১০] আর রাজনীতিতে ইসলামী মূল্যবোধকে এভাবে ব্যবহার করেই মূলত আওয়ামী লীগ এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ধর্মীয় অনুভূতিকে নাড়া দিতে সক্ষম হয় এবং নির্বাচনী বৈতরণী পাড়ি দিয়ে সরকার গঠন করে।

বাংলাদেশে কিছু ইসলামি রাজনৈতিক দল রয়েছে, যারা ইসলামকে রাজনীতির লক্ষ্যবস্তু হিসেবে গ্রহণ করেছে। এরা মনে প্রাণে ইসলামকে রাষ্ট্রব্যবস্থার আদর্শ হিসেবে দেখতে চায়। বাংলাদেশ জামায়েত ইসলামি, ইসলামি শাসনতন্ত্র আন্দোলন, ইসলামি ঐক্য আন্দোলন ইত্যাদি রাজনৈতিক দলগুলো মূলত ধর্মীয় আদর্শকে সামনে রেখে তাদের যাবতীয় রাজনৈতিক কার্যাবলী সম্পাদন করে। এক্ষেত্রে রাজনীতিতে যতটা না সমস্যা

---

[১০৮] হাননান, ড. মোহাম্মদ, ২০০০, বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস, ১৯৯০-১৯৯৯, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

[১০৯] শাকিল, এম জহিরুল হক, ২০০৯, বাংলাদেশে ধর্ম ভিত্তিক রাজনীতি, বাংলাদেশ রাজনীতির চার দশক, ড.তারেক শামসুর রেহমান (সম্পাদিত), শোভা প্রকাশ, ঢাকা, পৃ : ১৮৫।

[১১০] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

হয় তার চেয়ে বেশী সমস্যা দেখা যায় তখন যখন রাজনৈতিক দলগুলো শুধুমাত্র রাজনৈতিক স্বার্থে ধর্মকে ব্যবহার করে। জামায়াতের রাজনীতি সম্পর্কে বদরুদ্দীন ওমর বলেন, জামায়াতে ইসলামীকে সাম্প্রদায়িক দল না বলে মৌলবাদী দল বলা যায়। জামায়াতে ইসলামীকে মৌলবাদী দল বলার কারণ সম্প্রদায়ের পরিবর্তে এরা মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ কোরআনের আদর্শকে ভিত্তি করেই নিজেদের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং কর্মতৎপরতা নির্ধারণ করে থাকে। যে কোনো ধর্মীয় মৌলবাদ ও মৌলবাদ দলের ক্ষেত্রেই তা হয়। ইহুদী, খ্রিষ্টান, শিখ ইত্যাদি মৌলবাদ এবং মৌলবাদ সংগঠন তাদের নিজ নিজ ধর্মগ্রন্থ তালমুদ, বাইবেল গ্রন্থসহ ইত্যাদিকে কেন্দ্র করেই গঠিত হয়। এ অর্থে হিন্দু মৌলবাদ বলে কিছু নেই। কারণ হিন্দুদের এর রকম কোনো ধর্মগ্রন্থ নেই।[১১১] যাই হোক স্বাধীনতা পরবর্তী বিশেষ করে '৯০ এর পরবর্তী বাংলাদেশের রাজনীতিতে ধর্মকে নিছক রাজনীতির হাতিয়ার হিসেবে ব্যাবহারের প্রবণতা দিন দিন যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে এ থেকে এখনি বের হয়ে আসতে না পারলে অমাদের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে আরো কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে।

[১১১] উমর, বদরুদ্দীন,২০০২, ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারের বিচিত্র রূপ, দৈনিক ইত্তেফাক, ২০ ফেব্রুয়ারি, পৃ ঃ ৫।

Dhaka University Institutional Repository

৫.১৫ বাংলাদেশের রাজনীতিতে দলীয় কোন্দল

বাংলাদেশে সুষ্ঠু রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিকাশ ও সংসদীয় গণতন্ত্রের অন্যতম একটি প্রতিবন্ধক হলো রাজনীতিতে বিদ্যমান দলীয় কোন্দল। বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলো যেখানে অতি দ্রুত গতিতে নিজেদের উন্নয়নের সার্বিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সেখানে জনসংখ্যার চাপে ভারাক্রান্ত ক্ষুদ্র আমাদের এ দেশটির রয়েছে অধিক পরিমাণে রাজনৈতিক দল। অধিকাংশ রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে বিদ্যমান উপদলীয় কোন্দলের অস্তিত্ব। এখানে রাজনীতিতে দলভাঙ্গার খেলা আজও চলছে এবং প্রায় প্রতিদিনের খবরের কাগজেই দলভাঙ্গার দু'একটি সংবাদ চোখে পড়ে। যদিও পৃথিবীর অনেক উন্নয়নশীল দেশে রাজনীতি এখনও স্থিতিশীল অবস্থায় পৌঁছেনি তবুও বাংলাদেশের রাজনীতিতে দলীয় কোন্দল আর ভাঙ্গাগড়ার যে খেলাটি চলছে তা অন্য কোন দেশে অনুরূপভাবে সচরাচর পরিলক্ষিত হয় না।[১১২]

বাংলাদেশের রাজনীতিতে অভ্যন্তরীণ দলীয় মতানৈক্য এবং কোন্দলের প্রকৃতি এতটা ভয়াবহ যে এর ফলে দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে বারবার। বাংলাদেশের রাজনীতিতে বিদ্যমান বিভিন্ন শ্রেণীর স্বার্থ ও ক্ষমতাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে অভ্যন্তরীণ ও উপদলীয় কোন্দলের সৃষ্টি হয়। আর এই রাজনৈতিক দলীয় কোন্দল আমাদের দেশে নতুন নয়। পাকিস্তান স্বাধীন হবার পূর্বে মুসলিম লীগের রাজনীতিতে এ ধরণের দলীয় কোন্দল বিদ্যমান ছিল। পাকিস্তান স্বাধীনতাপূর্ব মুসলিম লীগে তিনটি উপদল(ক) নাজিমুদ্দীন উপদল যা পাকিস্তানের সামন্ত প্রভু এবং জোতদারদের স্বার্থ রক্ষা করে চলত। (খ) ফজলুল হক উপদল যা গ্রামের সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষকদের সমর্থনপুষ্ট ছিল এবং কৃষকদের সার্বিক মুক্তির কথা বলত। এবং (গ) সোহরাওয়ার্দী উপদল যা মূলতঃ শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষাকারী শিক্ষিত শ্রেণীর সংগঠন বলে পরিচিত ছিল। পাকিস্তান সৃষ্টির পর এ উপদলীয় কোন্দলের অংশ হিসেবে নাজিমুদ্দীন উপদলকে কেন্দ্রের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন এবং অপর দু'টি উপদলকে নেতৃত্বের আসন থেকে অপসারিত করার কারণেই পরবর্তীকালে মুসলিম লীগের বিপরীতে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয়। শ্রেণীস্বার্থ ও ক্ষমতা রক্ষাকে কেন্দ্র করে বিদ্যমান নানা অভ্যন্তরীণ ও উপদলীয় কোন্দল মুসলিম লীগের মধ্যে ভাঙ্গনের সৃষ্টি করেছিল।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে রাজনৈতিক দলের মধ্যে নেতৃত্ব ছাড়াও আরও বিভিন্ন কারণেও রাজনৈতিক কোন্দলের সৃষ্টি হয়। এর জন্য নেতৃত্বের ব্যর্থতাই প্রধানত দায়ী। নেতা যখন দলের মধ্যকার সার্বিক সমস্যা সমাধানে অযোগ্যতার পরিচয় দেন অথবা মতবিরোধ নিরসনে ব্যর্থ হন বা সবার সাথে সমান আচরণ করার গুণাবলীতে ব্যর্থ হন তখনই রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। ফলশ্রুতিতে রাজনৈতিক দলের কোন একটি অংশ মূল সংগঠন থেকে বের হয়ে এসে অপর কোন নেতার নেতৃত্বে নতুন দল

---

[১১২] ভূঁইয়া, ড. আব্দুল ওদুদ, প্রাগুক্ত, পৃ :৪৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

গঠন করে। বাংলাদেশের প্রায় দলের মধ্যেই এটা একটি সাধারণ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাছাড়া বর্তমানে অর্থনৈতিক প্রভাবের কারণেও রাজনৈতিক নেতৃত্বের মধ্যে কোন্দল দেখা দেয়। পদ বা নেতৃত্বের লোভে অভ্যন্তরীণ দলীয় মতানৈক্য এবং কোন্দলের সৃষ্টি হয়। বেশিরভাগ নেতা বা কর্মী যদি পদের জন্য লালায়িত হন এবং বিভিন্ন সময় দায়িত্ব লাভের ব্যাপারে নিজেদের সর্বাপেক্ষা যোগ্যতাসম্পন্ন মনে করে তাহলে নেতৃত্বের প্রশ্নে দলের মধ্যে কোন্দল সৃষ্টি হয়। আমাদের দেশের অধিকাংশ দলগুলোই ব্যক্তিকেন্দ্রিক নেতৃত্ব দ্বারা পরিচালিত হয় এবং নিজেদের পছন্দকৃত প্যানেলকে জয়যুক্ত করার জন্য তারা উপদলীয় কোন্দলে লিপ্ত হয়।

ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও ব্যক্তিনির্ভর রাজনৈতিক সংস্কৃতি বাংলাদেশের দলীয় কোন্দলের গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসেবে বিবেচিত। রাজনৈতিক প্রক্রিয়া বাংলাদেশে এখনও স্থিতিশীল পর্যায়ে না পৌঁছার কারণে নতুন নতুন দল গঠিত হচ্ছে। এসব দলে মূলতঃ একজন নেতাই থাকেন এবং তারই আহ্বানে অন্যেরা এসে যোগ দেয় যার ফলে দল হয় মূলতঃ ব্যক্তিকেন্দ্রিক। বাংলাদেশে কয়েকটি আদর্শগত দল ছাড়া বাকি দলগুলোর ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য। মূল নেতার নেতৃত্বের প্রতি আস্থা হারিয়ে উপদলগুলো গড়ে উঠে এবং স্বার্থের সংঘাতে লিপ্ত হয়। আদর্শগত সংঘাতের শিকার হয়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে উপদলীয় কোন্দল দেখা দেয় এবং এক পর্যায়ে দল ভেঙ্গে যায়। বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর প্রায় সব ক'টিই আজ এ সমস্যায় জর্জরিত। এখানকার দক্ষিণপন্থী, মধ্যপন্থী, বামপন্থী উদারপন্থী সব দলেই আদর্শগত কোন্দল বিদ্যমান। দলীয় কোন্দলের কারণে প্রতিদিন কোথাও না কোথাও ঘটছে মারামারি, খুনোখুনি অথবা সন্ত্রাসী কর্মকান্ড। দলীয় কোন্দলের কারণে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে মনোনয়ন ও নির্বাচনের জয় পরাজয়ের হিসাব। সম্প্রতি চট্টগ্রামের সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে সরকার দলীয় প্রার্থী মহিউদ্দিনের পরাজয়ের অন্যতম কারণ স্থানীয় আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দল।[১১৩] একই মঞ্চে প্রতিটি রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরে, বিশেষ করে বিএনপি এবং আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে নেতাকর্মীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত সংঘর্ষ মারাত্মক রূপ নিয়েছে। দলীয় নীতি আদর্শের প্রতি অনুগত সকলের মধ্যে যে সহিষ্ণুতা, সহনশীলতা ও ত্যাগী মনোভাব জাগ্রত করে, সেই আনুগত্য না থাকায় নেতাদের মধ্যে হিংসা, দ্বেষ এবং একে অপরকে টপকে যাওয়ার প্রবণতা মারাত্মকভাবে বিস্তার লাভ করেছে। এর পরে দিনের পর দিন দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে অস্থিরতা ও অসহযোগিতামূলক মনোভাব উত্তোরোত্তোর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও সংসদীয় গণতন্ত্র দিনে দিনে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

---

[১১৩] দৈনিক প্রথম আলো, ২০ জুন ২০১০,পৃ ঃ ১।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

৬.১ রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও সংসদীয় গণতান্ত্রিক উন্নয়নে সিভিল সোসাইটির ভাবনা

ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সিভিল সোসাইটির ভূমিকার ইতিহাস প্রায় দু'শ চল্লিশ বছরের। উপনিবেশিক শাসন উন্মেষের প্রথম থেকেই ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনীতিতে সিভিল সোসাইটির ভূমিকা প্রত্যক্ষ করা গেলেও মূলত বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে পাকিস্তানী আমলে বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলন ও একাত্তরের বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সাথে এ অঞ্চলের প্রাতিষ্ঠানিক সিভিল সোসাইটির জড়িত থাকার বিষয়টি অনেকটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। তবে বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলন বা ঊনসত্তুরের গণঅভ্যুত্থান ইত্যাদি যদিও প্রধানত রাজনৈতিক আন্দোলন হিসেবে পরিগণিত তথাপি এর সাথে সিভিল সোসাইটির ভূমিকাকে খাটো করে দেখার উপায় নেই। হায়দার আকবর রনো তার এক সাম্প্রতিক প্রবন্ধে বাংলাদেশের রাজনীতিতে সিভিল সোসাইটির অগ্রণী শ্রেণী বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন, রাজনৈতিক দলের বাইরে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা ছিল পাকিস্তান আমলেও। .. কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পর্কিত নয় অথচ সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় বৌদ্ধিক অবদান রেখেছেন এমন বড় ও মাঝারি মাপের অনেক ব্যক্তিত্বের কথা আমরা আমাদের দেশের ইতিহাস থেকেই উল্লেখ করতে পারি। ... ষাটের দশকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শ্রদ্ধেয় শিক্ষক জাতীয়তাবাদী অথবা সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখেছিলেন, যা এই সব আন্দোলনের যৌক্তিক ভিত্তি তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।[১] এরশাদের স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের অবসানের ক্ষেত্রে সিভিল সমাজের ভূমিকা ও প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ১৯৯০ এর গণঅভ্যুত্থানের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ততার মাধ্যমে সিভিল সোসাইটি বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে পরবর্তীতে বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলন ও সংগ্রামের মাধ্যমে তা অব্যাহত রাখে। বিশেষত, ১৯৯৬ ও ২০০১ এর তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন ও সরকার পরিবর্তনে তাদের ভূমিকা এবং ২০০৬ সালে লাগাতার চরম রাজনৈতিক সংকট ও সংঘাত নিরসনে তাদের উদ্যোগ একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হিসাবে সিভিল সোসাইটিকে সুসংহত করেছে।

সাম্প্রতিক বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংকট তথা ১/১১ এর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন ও রাজনীতির গুণগত মান উন্নয়ন, প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি নিরসন, সৎ ও যোগ্য রাজনীতিবিদদের নির্বাচন, রাজনৈতিক হানাহানি বন্ধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠাসহ বিভিন্ন ইস্যুতে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান গ্রহণ করেছে এবং এ ব্যাপারে কার্যকরী চাপ সৃষ্টিকারীগোষ্ঠী হিসেবে সরকারের সঙ্গে দর কষাকষিতে অবতীর্ণ হয়েছে ।

---

[১] রনো, হায়দার আকবর, সিভিল সোসাইটি ও আজকের বাংলাদেশ, সাপ্তাহিক ২০০০, বর্ষ ১০, সংখ্যা ৪৬, ২৮ মার্চ ২০০৮, পৃ : ২০।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও গণতান্ত্রিক উন্নয়নের প্রেক্ষিতে সিভিল সোসাইটির সদস্যদের নিয়ে দৈনিক প্রথম আলোর উদ্যোগে বিগত ৪ নভেম্বর ২০০৯ তারিখে এক গোলটেবিল আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনায় বক্তাগণ এদেশের সংসদীয় গণতন্ত্র, নির্বাচন ব্যবস্থা, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ইত্যাদিসহ বাংলাদেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির সমস্যা এবং তা থেকে উত্তরণের ভবিষ্যত দিকনির্দেশনা সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করেন। অত্র গবেষণার বিষয়ের সাথে প্রাসঙ্গিকতা থাকায় উক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণকারী বিশিষ্ট নাগরিকদের বক্তব্যসমূহ[২] নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

ড.দিলারা চৌধুরী, অধ্যাপক, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

২০০৮ সালের নির্বাচনের আগে প্রধান দুই রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপির কাছ থেকে আমরা শুনেছিলাম তারা গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করবে, সংসদকে কার্যকর করবে। এ কথা আমাদের আশা জাগিয়েছিল। কিন্তু আজকে প্রায় আট মাস কেটে গেছে। বাংলাদেশে যে রাজনৈতিক সংস্কৃতি আমরা ১৯৯১ সাল থেকে দেখেছি, গণতন্ত্র সেখান থেকে পুনরায় চালু হলো। তখন থেকে শুরু করে আমরা গত ১৫ বছর দেখেছি, আমাদের বিরোধী দলগুলো প্রায়ই সংসদে উপস্থিত থাকে না। সংসদ কখনোই কার্যকর হতে পারে না, যদি বিরোধী দল সংসদে উপস্থিত না থাকে। বিরোধী দল উপস্থিত না থাকলে এক দলের সংসদ কখনোই কার্যকর হতে পারবে না। সরকারি দল যত চেষ্টাই করুক না কেন তারা সংসদ কার্যকর করতে পারবে না। টিআইবি কিছু কাজ করেছে। আরও কিছু ছোটখাটো কাজ হয়েছে। কিভাবে সংসদ কাজ করছে সেটা তারা দেখছে। দেখা গেছে, সরকারি দলের মধ্যে একটা ইচ্ছা আছে। এটা কত দিন পর্যন্ত থাকবে, সেটাই এখন প্রশ্ন। সুতরাং এদিক থেকে দেখলে আমরা দেখতে পাই, বিরোধী দল ও সরকারি দলের মধ্যে সমঝোতার অভাব। এটা আমরা ১৫ বছর ধরে বলে এসেছি, বিরোধী দল ও সরকারি দলের মধ্যে সম্পর্ক সমঝোতার ভিত্তিতে কার্যকর করতে হবে। সরকারি দলের দায়বদ্ধতা আছে তা কার্যকর করার। ২০০৮ সালের নির্বাচন নিয়ে আপামর জনগন সবাই বলেছে, এটা একটি সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন হয়েছে। বিরোধী দলের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, এই নির্বাচনে সূক্ষ্ম কারচুপি হয়েছে। সেটা আমাদের দেশের রাজনৈতিক দল সব সময় বলে থাকে। যারা পরাজিত তারা আমাদের দেশে সব সময় এই কথা বলে থাকে। আমাদের মনে রাখতে হবে, শুধু নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী করলে নির্বাচন সুষ্ঠু ও অবাধ করা সম্ভব হয় না। এর সঙ্গে আরও কিছু বিষয় যুক্ত। প্রথম যে জিনিসটি দরকার, সেটি হলো এর সঙ্গে আনুষঙ্গিক যে প্রতিষ্ঠান আছে, সেগুলোকেও শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে হবে। প্রথমত. সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ বিচারব্যবস্থা, দ্বিতীয়ত. দরকার একটি সুষ্ঠু প্রশাসন। যে

---

[২] সূত্র : দৈনিক প্রথম আলো, ৪ নভেম্বর ২০০৯।

Dhaka University Institutional Repository

সরকার ক্ষমতায় তারা নিজেদের পক্ষে কাজ করে। উন্নত দেশগুলোয় দেখা যায়, যখন নির্বাচন হয় তখন তারা কোনো দলের পক্ষে কাজ করে না। আমাদের দেশে এখনো এই বিষয়টা শুরু হয়নি।

ড. এমাজউদ্দীন আহমদ, সাবেক উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

২৯ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত নির্বাচনের আগে সাধারণ মানুষ আশা করেছিল, বিশেষ করে ক্ষমতাসীনদের দিনবদলের অঙ্গীকারের পর তাঁরা পরস্পরের কথা প্রতিপক্ষরূপে গ্রহণ করবেন, শত্রুরূপে নয়। যে দলই ক্ষমতাসীন হোক, বিরোধী দলকে সংসদীয় ব্যবস্থায় যেভাবে গ্রহণ করার কথা, বাংলাদেশে তার শুভ সূচনা হবে। দেশে রাজনীতি হয়ে উঠবে সমস্যা সমাধানমূলক, সৃজনশীল ও জনকল্যাণমুখী। জাতীয় সংসদ কার্যকর হবে, হয়ে উঠবে রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু। নির্বাহী কর্তৃত্ব প্রয়োগে সমষ্টিগত প্রজ্ঞার প্রকাশ ঘটবে। দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। বিচার বিভাগ হয়ে উঠবে ন্যায়নিষ্ঠ, নিরপেক্ষ ও ন্যায়বিচারের শেষ ভরসাস্থল। বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির প্রসার ঘটবে। সরকার ও বিরোধী দল পাশাপাশি পথ চলে পুরো সমাজে নতুন দিনের সূচনা করবে। কিন্তু হলো কই? হয়নি বলেই তো অসুস্থ রাজনীতির সব লক্ষণ আজ বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিমন্ডলে পরিস্ফুট, পরিস্ফুট গণতান্ত্রিক অপসংস্কৃতির সব নিদর্শন। নির্বাচিত দল ক্ষমতাসীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়েছে চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, বাস-টার্মিনাল, হাট-ঘাট, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান দখল ও দলীয় সন্ত্রাস। গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিতে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয়নি। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, বাজারের হাল-হকিকত, বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ড- সব মিলিয়ে মনে হয় পরিস্থিতির যেন আরও অবনতি ঘটেছে। জাতীয় সংসদ আগের মতোই অকার্যকর। ব্যাপক উদার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তে প্রতিপক্ষকে সন্দেহের চোখে দেখে সর্বপ্রকারে তাকে শায়েস্তা করা, ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য প্রতিপক্ষের প্রতি গভীর ঈর্ষা, সমষ্টিগত প্রজ্ঞার পরিবর্তে ব্যক্তিগত ইচ্ছার প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ, ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে সমষ্টিগত পর্যায়ে টেনে আনার যে সংস্কৃতি এ দেশে চালু ছিল, তা অক্ষুণ্ন রয়েছে। সংসদীয় ব্যবস্থায় বিরোধী দল দায়িত্বশীল সরকারের এক মৌল উপাদান। যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ সরকারী সিদ্ধান্তে বিরোধী দলের উপস্থিতি অপরিহার্য। রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ ব্রিটিশ মডেলের আদলটা গ্রহণ করেছে বটে, কিন্তু তার মর্মবাণীর ধারে কাছে নেই। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর সরকার প্রতিপক্ষকে কোনোভাবে সংশ্লিষ্ট না করেই যে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। তাদের কোনোভাবে সংশ্লিষ্ট না করে সমগ্র শাসনব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে পারেন। যে কোনো বিদেশী শক্তির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হতে পারেন। এমনকি বিরোধী দলের নেতার সঙ্গে একটি কথাও না বলে অথবা একবারও তাঁর সঙ্গে দেখা না করে পাঁচ বছরের সময়কাল পূর্ণ করতে পারেন। ব্রিটিশ সরকার ব্যবস্থায় এটি অকল্পনীয়। দিন বদলের অঙ্গীকারের পরও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলের নেতা বসবাস করছেন দুই বিচ্ছিন্ন দ্বীপে এবং এই দুটি দ্বীপের দূরত্ব কয়েক হাজার যোজন। তাঁদের মধ্যে কোন যোগাযোগ নেই,

Dhaka University Institutional Repository

যদিও দুজনের কাছে রয়েছে লাল টেলিফোন। নেই যোগাযোগের সদিচ্ছাও। দুজন দুজনকে প্রতিপক্ষ না ভেবে দেখছেন পরম শত্রুরূপে। ফলে যা হওয়ার তাই হচ্ছে। সমাজব্যাপী অব্যাহত রয়েছে হিংসা-প্রতিহিংসার এক বিষাক্ত আবহাওয়া। পুরোদমে চলছে শাসন প্রশাসনে দলীয়করণের এক নোংরা মচ্ছব। চলছে সন্ত্রাসী কার্যকলাপের এক ভীতিকর পরিবেশ। দুর্নীতির মাত্রা লাভ করেছে নতুন উচ্চতা। সমাজ হচ্ছে আরও বিভক্ত। বিভক্ত হচ্ছে সমাজে বিদ্যমান প্রতিটি সামাজিক শক্তি। গতি হারাচ্ছে কল্যাণকর সব পদক্ষেপ। চলেছি সবাই আমরা এক অনিশ্চয়তার দিকে। এ অবস্থা চলতে পারে না। এ অবস্থা পরিবর্তিত হতেই হবে। পরিবর্তিত হতে হবে সরকারকে। পরিবর্তিত হতে হবে বিরোধী দলকেও। পরিবর্তিত হতে হবে রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে। পরিবর্তন আসতে হবে রাজনৈতিক ব্যবস্থা পরিচালনাকারী রাজনীতিকদের আচরণে, ভাবনা-চিন্তায়, কথাবার্তায়। চাইলেই কিন্তু পরিবর্তন আসবে না। জোর করেও তা সম্ভব হবে না। পরিবর্তন আসতে হবে ভেতর থেকে, রাজনীতিবিদদের প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞাতার তীর ঘেষে, স্বত:স্ফূর্তভাবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছিলেন আমরা ক্ষমতায় নাও যদি যাই, তাহলেও জাতীয় সংসদকে কার্যকর করব। বিরোধী দল থেকে একজন ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত করার অঙ্গীকারও তাঁর ছিল। বিরোধী দলেরনেতা বেগম খালেদা জিয়াও সুস্পষ্টভাবে বলেছিলেন বিরোধী দল থেকে একজন ডেপুটি স্পিকার নির্বাচনের কথা। জাতীয় সংসদে নির্বাচিত সদস্যরা দেশের প্রতিনিধি। দেশের স্বার্থের প্রতিনিধি। দেশের ভাবমূর্তীর সংরক্ষক তারাই। বিরোধী দলকে জাতীয় সংসদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করার জন্য তাদের দায় নির্ধারিত হতে হবে। বিরোধী দল থেকে একজন ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হলে এবং সংসদীয় কমিটিগুলোতে বিরোধী দলের সদস্যদের সংখ্যানুপাতে সদস্যপদ এবং কমিটির সভাপতির পদ নির্ধারিত হতে তাদেরও দায় সৃষ্টি হতে পারে। জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের অনুপস্থিতি অগ্রহণযোগ্য। কার ওপর আপনারা গোস্‌সা করছেন? সরকার বা সারকারি দল কি আপনাদের নির্বাচিত করেছে? যারা নির্বাচিত করেছে, তাদের কথা ভাবুন। জাতীয় সংসদে উপস্থিত হতে তাদের কথা বলুন।

মাহফুজ আনাম, সম্পাদক, ডেইলি স্টার

বছরের পর বছর লাগাতার সংসদ বর্জন ও একের পর এক হরতাল ডাকার ফলে গণতন্ত্র ও কার্যকর সংসদ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বড় ধরনের ক্ষতি হয়েছে- এ কথা অস্বীকার করার কোনো উপায় আছে। বিরোধী দলের মধ্যে লেনদেনের ক্ষেত্রে সংঘর্ষকেই সব সময় পছন্দনীয় পথ হিসেবে বেছে নেওয়া হয়নি কি? আবার যেন এমনটা না ঘটে সবাই মিলে সে ব্যবস্থা করাই কি উচিত নয়? গত ১৮ বছরে যে রাজনৈতিক চর্চা আমরা করেছি, সে পথে বাংলাদেশ সামনে এগুতে পারবে না। নির্বাচনে বিজয়ীর সর্বময় কর্তৃত্বের রাজনৈতিক সংস্কৃতি বিজিতদের মধ্যে শুধু ব্যাপক অসন্তুষ্টি তৈরী করবে, নির্বাচিত সরকারকে তারা অস্থিতিশীল করার সামান্যতম

Dhaka University Institutional Repository

সুযোগের অপেক্ষায় থাকবে। আমরা বহুবার এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতে দেখেছি। নির্বাচনে বিজয় সাংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে বিরোধী দল ও নাগরিক সমাজকে অগ্রাহ্য করে যেভাবে খুশি সেভাবে দেশ চালানোর অধিকার দেয়, এমন মানসিকতা শুধু রাজনৈতিক অচলাবস্থার দিকে ঠেলে দেয়, এমন মানসিকতার জন্য আমাদের ভুগতে হয়েছে অনেক। এসব বদলানোর সময় এসেছে। আসুন, সবাই মিলে দেশে এক রাজনৈতিক সংস্কৃতি এগিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়াতে শরিক হই।

মতিউর রহমান, সম্পাদক, দৈনিক প্রথম আলো

স্বাধীনতার ৩৮ বছর চলে গেল। স্বাধীনতার সাড়ে তিন বছর পর থেকেই সামরিক শাসন। সে শাসন নানা চেহারায় চলে ১৫ বছর। এর পর ১৯৯১ থেকে পর পর চারটি বড় নির্বাচন পেয়েছি। অনেক না পাওয়ার ভিড়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনেক অগ্রগতি হয়েছে। কিছু কিছু চেষ্টাও দেখা যায়। কিন্তু ওই যে সবকিছু সরকারি দলের। বিরোধী দল সুযোগ পায় না, সংসদে যায় না, সহযোগিতা করে না। এখন তো আবার সংসদ বর্জন চলছে। এসবের আর পরিবর্তন হলো না। রাজনৈতিক দলগুলোর ইশতেহারের অনেক কিছু বাস্তবায়িত হয় না। এর পরও কিছু কিছু কাজ সরকার চেষ্টা করছে। সংসদ কার্যকর করতে হবে। বিরোধী দলকে উপস্থিত থাকতে হবে। দিনশেষে এ দায়িত্ব সরকারের-বিরোধীদলকে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া, পরিবেশ সৃষ্টি করা। দায়িত্ব সরকারের, দায়িত্ব রাজনৈতিক দলগুলোর, নাগরিক সমাজের এবং গণমাধ্যমগুলোরও। আমরা আমাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করার চেষ্টা করে যাব।

সুলতানা কামাল, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা

আমি শেষ কথাটা যেটা বলতে চাই, যারা দেশ পরিচালনা করছে, সাংসদ হিসেবে তাঁদের কি ভূমিকা, মন্ত্রণালয়ে মন্ত্রী হিসেবে আমি যখন বসি তখন কি ভূমিকা, সংসদের সঙ্গে মন্ত্রণালয়ের কি সম্পর্ক , জবাবদিহিতার এবং আদান-প্রদান সম্পন্ন করার যে বিষয় আছে, সেগুলো নিয়ে তারা পরিস্কার নয়। রাজনৈতিক দল, মন্ত্রী ও সাংসদদের মধ্যে যে তফাৎ আছে, এটা তারা বোঝে না। সেই জন্য সন্ত্রাস চলে আসে, দলীয়করণ চলে আসে, পরিবারতন্ত্র চলে আসে। নেতৃত্ব ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে যে তফাৎ আছে, এই বিষয়গুলো তারা দেখার চেষ্টা করে না। ফলে তারা স্থানীয় প্রশাসনকে শক্তিশালী করতে চায় না। এত অস্বচ্ছতার মধ্য দিয়ে গণতন্ত্র কাজ করতে পারে না। সেই অস্বচ্ছতা দূর করার জন্য নিজেকে অনেক বেশি শাণিত করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

লে. জে. (অব) মাহবুবুর রহমান, সদস্য, বিএনপি স্থায়ী কমিটি

আমি সংসদীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। বিএনপি সংসদে যাক, আমিও চাই। সবকিছু সংসদেই আলোচনা হওয়া উচিত। বিএনপিও যেতে চায় বলে আমি জানি। কথা হলো, যদি ব্যাপারটা হয় আসন নিয়ে, তবে আমি সেটা সমর্থন করি না। আমি সংসদে আসন না পেলে পেছনে দাড়িয়ে থাকতাম, মাইক না পেলে চিৎকার করে কথা বলতাম। তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ে কথা উঠেছে। আমিও মনে করি গণতান্ত্রিক পরিবেশে এটা একটা অপমান। কিন্তু সবকিছু ক্ষমতাবানদের হাতের মুঠোয় থাকার কারণে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রয়োজন। এমন তত্ত্বাবধায়ক আসবে, যারা নির্বাচনের একটা উন্মুক্ত মাঠ তৈরী করতে পারে। রাজনীতি থেকে অসুস্থ রাজনীতি, দুর্নীতি-সন্ত্রাসমুক্ত করতে হবে। যেভাবে সংসদ চলছে, যেভাবে বিএনপির জন্য পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে, সেখানে সংসদে যাওয়া নিয়ে ভাবতে হবে।

ড.আসিফ নজরুল, অধ্যাপক, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাংলাদেশকে খারাপ কি দিল তা আমি বুঝিনি। সর্বশেষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার তার আমলে সামরিক গোয়েন্দা বাহিনী ও উচ্চাভিলাষী সামরিক মহল তাদের খারাপ নিয়ত ও খারাপ কাজের কারণে সমালোচিত ছিল। এখন পর্যন্ত যেসব সফল নির্বাচন হয়েছে, সবগুলোই তত্ত্বাবধায়কের আমলে। তথ্য অধিকার আইন, মানবাধিকার আইন, নির্বাচন কমিশন আইনসহ যত ভালো ভালো আইন সংস্কার- সবই কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলেই হয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলেই ল অ্যান্ড অর্ডার ব্যবস্থা সবচেয়ে ভালো থাকে। সবচেয়ে ভালো মানুষগুলো এ সময় দেশের দায়িত্ব পালন করেন। তবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কিছু ফাঁকফোকর আছে। সেগুলো সংশোধন করা যেতে পারে।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, সম্মানীয় ফেলো, সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ

বিরোধী দল যা-ই হোক, এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি বদলাতে হবে সরকারি দলকে। তাদেরই দায়িত্ব নিতে হবে। সত্যিই যদি দিন বদলের কথা বাস্তবায়ন করতে হয়, তবে একলা চলো নীতি দিয়ে হবে না। সহায়ক শক্তিগুলোকে কাছে টেনে নিতে হবে। যারা স্বাভাবিক মিত্র তারা এখন অনেকটাই নির্জীব, নিস্তেজ। তাদের জাগিয়ে তোলা দায়িত্ব সরকারকেই নিতে হবে। যতই দুই দলীয় শাসন চলুক না কেন, তৃতীয় দল কিন্তু গড়ে উঠেছে। যার প্রতি নির্বাচনে গণতান্ত্রিক অধিকার কলিয়ে, দলীয় আনুগত্য না দেখিয়ে, পাঁচ বছরের জন্য শাসন করার সুযোগ দেয়। এসব সুইং ভোটের অধিকাংশ তরুণ যুবক শ্রেণী। তাদের মনোভাব বুঝে যদি দলে না রাখা যায়, তবে কোনো দলই সফল হবে না। বাংলাদেশে চার দশকের অভিজ্ঞতায় দুই ধরনের মানুষ তৈরি হয়েছে। একদল বলে, এ দেশের কিছুই হয়নি। কিছুই হবে না। আরেক দল বলে , অনেক কিছুই হয়েছে

Dhaka University Institutional Repository

এবং সবকিছুই হয়েছে যখন ওনাদের দল শাসন করেছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার নির্বাচন কমিশন পরিবর্তন করেছে, রাজনৈতিক সরকারের জন্য আইন করেছে, দুর্নীতি দমন কমিশনকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করেছে, নিয়ন্ত্রণ সংস্কার কমিশন তৈরি করেছে। মানবাধিকার কমিশন, তথ্য অধিকার কমিশন, জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন হয়েছে। এসব আত্মস্থ করে পরিবর্তনের দিকে এগোতে হবে।

এম হাফিজউদ্দিন খান, সাবেক মহাহিসাব নিরীক্ষক, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা

সংসদকে কার্যকর করে নির্বাহী বিভাগকে সংসদের কাছে প্রকৃতই দায়ী ও জবাবদিহিমূলক করতে হলে সংসদের স্পিকারকে নিরপেক্ষ করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন স্পিকারকে তাঁর পদ থেকে অপসারণের বর্তমান পদ্ধতির পরিবর্তন, যাতে তিনি সরকারি দলের দয়ার ওপর নির্ভরশীল না থাকেন। তদুপরি যিনি স্পিকার নির্বাচিত হবেন, তিনি শপথ নেওয়ার আগে অবশ্যই তাঁর রাজনৈতিক দল থেকে পদত্যাগ করবেন। সংসদকে কার্যকর করতে আরও প্রয়োজন অনুচ্ছেদ ৭০ এর সংশোধন, যাতে করে যেকোনো সাংসদ নির্ভয়ে সংসদে তার বক্তব্য পেশ করতে পারেন এবং প্রয়োজনবোধে তার দলের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে পারেন। তবে শুধু বাজেট পাসের সময় এবং সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবের সময় সাংসদেরা অবশ্যই দলীয় সিদ্ধান্ত মেনে চলবেন।

হাসান ফেরদৌস, গ্রাফিক্স ও কলাম লেখক

আমাদের সব আন্দোলনের লক্ষ্য, পশ্চিমা ধাঁচের প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক সরকার গঠন। জনগণের ক্ষমতায়ন নয়, মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা নয়, শুধু নিয়মমাফিক নির্বাচন করা এবং নির্বাচন শেষে একদল লোকের হাতে ক্ষমতার চাবি তুলে দেওয়া। নির্বাচন দিয়ে ক্ষমতার হাত বদল হয় বটে, কিন্তু দিন বদলায় না। রাষ্ট্রের ভেতর অতি ক্ষুদ্র একটি অংশ সামরিক প্রশাসন ও বেসামরিক আমলাতন্ত্রের আঁতাতে এবং বহুজাতিক সংস্থার সমর্থনে এত ক্ষমতাধর হয়ে ওঠে যে, তারা সব সরকারি সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা রাখে, আইনকে নিজের স্বার্থে ইচ্ছেমতো ব্যবহার করতে পারে বা নিজের স্বার্থ রক্ষা হয় এমন যেকোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা রাখে।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

৭.১ উপসংহার

দু'শ বছরেরও বেশী সময় ব্রিটিশ ও পাকিস্তানি শাসন ও শোষণের অবসান ঘটিয়ে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করে ১৯৭১ সালে। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের জনগণের বহুদিনের কাঙ্খিত শাসন ব্যবস্থা ছিল সংসদীয় গণতন্ত্র। সংসদীয় গণতন্ত্রের আকাঙ্খায় তাই এদেশের মানুষ গণআন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে বারবার। এ গণআন্দোলন পরিচালিত হয়েছে কখনও কখনও দেশীয় স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে আবার কখনও কখনও বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে। তাই বলা যায় বাঙালীর স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস অনেক দীর্ঘ, অনেক পুরাতন। উনিশ শতকের শেষ ভাগ হতে বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত সর্ব ভারতীয় পর্যায়ে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন এক অর্থে ছিল বাঙালীর গণতান্ত্রিক আন্দোলন। এ সকল আন্দোলনের ফল স্বরূপ ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে বর্ণিত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ও প্রাদেশিক সরকার ব্যবস্থায় এ দেশের জনগণ ও নেতৃবর্গ কিছুটা প্রতিনিধিত্বশীল সরকার ব্যবস্থার ধারণা লাভ করে উপনিবেশিক কায়দায়। এরপর ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবে গণতান্ত্রিক পাকিস্তানের স্বপ্ন দেখানো হলেও তৎকালীন পাকিস্তানী নেতৃত্ব স্বাধীন পাকিস্তানের গনতন্ত্র কায়েমে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়ে ছিল। তবে ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব পূর্ব বাংলার জনগণকে গণতন্ত্রের প্রতি অনেক বেশী আশান্বিত করে তুলে ছিল। পাশাপাশি লাহোর প্রস্তাবের ফলেই পূর্ব বাংলায় জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা ও জাতীয়তাবাদী চেতনার শক্ত ভীত রচিত হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত-পাকিস্তান বিভক্তির পর হতে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে যে সব আন্দোলন দানা বাঁধে তার প্রত্যেকটি আন্দোলনের মূল শক্তি ছিল এদেশের স্বাধীনতাকামী জনগণের গণতান্ত্রিক চেতনা। সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়ে তৎকালীন আওয়ামী লীগ পাকিস্তানি রাজনীতিতে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৫৪ সালের ২১ দফা ইশতেহার, ১৯৬৬ সালের ছয় দফা কর্মসূচী ও ১৯৭০ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে এই অঙ্গীকারের প্রতিফলন ঘটে। কেননা ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের ২১ দফার ৭টি দফাই ছিল পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক ক্ষমতা ও সংসদীয় গণতন্ত্র বাস্তবায়ন সম্পর্কিত। ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক উত্থাপিত ছয় দফা দাবির প্রথম দফাই ছিল এদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের রূপরেখা সম্পর্কে লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রচলন, জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিধিদের দ্বারা গঠিত জবাবদিহিমূলক একটি মন্ত্রীপরিষদ। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানেও এ ধরনের দাবির সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। ১৯৭০ সালের আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে সংসদীয় গণতান্ত্রিক অঙ্গীকারের প্রতিফলনও ঘটেছে। এই নির্বাচনে শুধু আওয়ামী লীগের বিপুল বিজয়ই হয়নি, এর মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের গণতান্ত্রিক আকাঙ্খার বহি:প্রকাশ ঘটেছিল। এরপর ১৯৭১ সালের রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব প্রদান করে আওয়ামী লীগ বিজয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

অত:পর আওয়ামী লীগ এদেশে প্রথম বারের মত সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার প্রবর্তন করে। কিন্তু কয়েক বছর যেতে না যেতেই এদেশের জনগণের দীর্ঘ দিনের কাঙ্খিত সংসদীয় গণতন্ত্র কর্তৃত্ববাদীদের রোষানলে পড়ে। ফলে ১৯৭৫ সালে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় সরকারের স্থলে রাষ্ট্রপতি সরকার ব্যবস্থা গৃহীত হয়।

১৯৭৫ পরবর্তী বাংলাদেশের রাজনীতিতে ক্যু, হত্যা ও সামরিক ও আধা সামরিক শাসন জনগনকে পুনরায় গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধ করে তোলে। মূলতঃ সমাজ ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও রাজনৈতিক ব্যবস্তায় গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান সমূহের অনুপস্থিতি স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের প্রথম স্তর বিপর্যস্ত হয়। ১৯৯১ সালের অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক পন্থায় ক্ষমতার হস্তান্তর সাধিত হলে পঞ্চম জাতীয় সংসদে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর থেকে বাংলাদেশ সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা ১৯ বছর অতিক্রম করেছে।

অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনি প্রক্রিয়াকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতির প্রবর্তন, স্বতন্ত্র জাতীয় সংসদ সচিবালয় প্রতিষ্ঠা, সংসদীয় কমিটি সমূহের গণতান্ত্রিক সংস্কারের মাধ্যমে সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানের প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়েছে। তবে গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ও সুষ্ঠু রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক কাঠামো বিনির্মাণে বিভিন্ন আমলে নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকার সমূহ জাতীয় সংসদকে কতটুকু কার্যকর করতে সক্ষম হয়েছে তা বিবেচ্য বিষয়।

পঞ্চম, সপ্তম, অষ্টম ও নবম জাতীয় সংসদের সংসদীয় কার্যক্রম বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বিগত পঞ্চম, সপ্তম, ও অষ্টম সংসদের তিনটি মেয়াদে সরকার ও বিরোধীদলের স্বত:স্ফূর্ত অংশ গ্রহণের মাধ্যমে জাতীয় সংসদ কার্যকর হতে পারেনি। প্রধান বিরোধীদল তিনটি মেয়াদের ১১টি অধিবেশন সম্পূর্ন ভাবে বর্জন করে। আবার বিরোধীদলীয় সদস্যগণ উপস্থিত কার্যদিবসে জাতীয় সংসদে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অজুহাতে একক কিংবা সম্মিলিতভাবে ওয়াক আউট করেছেন। বর্তমান নবম সংসদেও এ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত পাঁচটি অধিবেশনের (জুন'২০১০ পর্যন্ত) মধ্যে বিরোধীদল দুইটি অধিবেশন সম্পূর্ণভাবে বর্জন করেছে। বাকিগুলিতে কয়েকবার ওয়াক আউটও করেছে। ওয়াক আউট যদিও সংসদীয় রীতির পরিপন্থী নয় তথাপি মাত্রাতিরিক্ত ওয়াক আউট সংসদীয় সংস্কৃতির জন্য কখনও ইতিবাচক হতে পারে না। গবেষণার পঞ্চম অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনাপূর্বক গবেষণার প্রথম অনুমান "বাংলাদেশে জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী সকল রাজনৈতিক দলগুলোর সংসদ অধিবেশন সমূহে স্বত:স্ফুর্ত অংশগ্রহণ না করা ও দলগুলোর মধ্যে পারস্পারিক সহযোগিতা ও সহনশীল আচরণ না থাকা সংসদীয় শাসন ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের অন্যতম প্রতিবন্ধক" প্রমাণিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমানে হরতাল, ধর্মঘট, সন্ত্রাসসহ নানা প্রকার সহিংস ঘটনা আমাদের জাতীয় জীবনের একটি নিত্য - নৈমিত্তিক ও অনিবার্য ব্যাপার হয়ে দাড়িয়েছে । এদেশের ক্ষমতাসীন দল অর্থ জনবিচ্ছিন্ন দল। ক্ষমতার যাবার আগে যত কিছুই বলুক নির্বাচনের পর রাজনৈতিক দলের চেহারা চরিত্র অন্যরকম হয়ে যায় । জনগণকে তাদের মনে থাকে না জনস্বার্থ তাদের কাছে তখন গৌণ হয়ে পড়ে। ব্যক্তিস্বার্থ বাস্তবায়নে তারা অধিক তৎপর হয়ে উঠে। আত্মকেন্দ্রিক , স্বজনপ্রীতি , দূর্নীতি ইত্যাদির মোহে ক্ষমতাসীন সরকার তখন আর জনগনের সরকার থাকে না। গণতন্ত্র হয়ে পড়ে কোণঠাসা। তখন গণতন্ত্রকে পুনরুদ্ধারের কথা বলে বিরোধী দলগুলো একজোট হয়ে জোটবদ্ধ আন্দোলনে নামে । আন্দোলনের নামে হরতাল, ধর্মঘট, সন্ত্রাসসহ নানা প্রকার সহিংস ঘটনা ঘটিয়ে রাজনীতিতে বিপর্যস্ত পরিবেশের সৃস্টি করে। গত কয়েক দশক ধরে চলছে হরতাল, ধর্মঘট, আর সন্ত্রাসের রাজনীতি। ধর্মঘট, হরতালের কারণে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসাসহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকে ফলে দেশের সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রায় অচল হয়ে পড়ে। জনগনের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যেমন, খাদ্য সামগ্রী, ঔষধপত্র সরবরাহ এমনকি জরুরী রোগীদের চিকিৎসা পর্যন্ত করানো সম্ভব হয়ে উঠে না। হরতালের কারণে প্রত্যক্ষভাবে ব্যবসায়ী সম্প্রদায় খুব বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর কোন পরিবর্তন নেই, নেই কোন উন্নতি । রাজনৈতিক কর্মসূচীর নামে যখন তখন হরতাল, ধর্মঘট আহ্বানের ফলে বিদেশীরাও বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করছে। আর এ অবস্থায় কোন দেশেই সুস্থ রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিকাশ ঘটতে পারে না। গবেষণার পঞ্চম অধ্যায়ের নবম অনুচ্ছেদে " হরতাল, ধর্মঘট, অবরোধ, সহিংসতা ও বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি" শিরোনামে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনাপূর্বক গবেষণার দ্বিতীয় অনুমান "হরতাল, অবরোধের মত সহিংস কর্মসূচী সুষ্ঠু রাজনৈতিক সংস্কৃতির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃস্টি করে" প্রমাণিত হয়।

বাংলাদেশ সংবিধান অনুযায়ী সংসদ সদস্যরা একটানা ৯০ কার্যদিবস সংসদে অনুপস্থিত থাকলে তাদের সদস্য পদ বাতিল হয়ে যায়। অথচ বিগত তিনটি সংসদ মেয়াদের অভিজ্ঞতা হতে দেখা যায়, সদস্যপদ টিকিয়ে রাখার জন্য কোন কোন সংসদ সদস্য বছর দেড়েক পর নব্বই কার্যদিবসের পূর্বে সংসদ অধিবেশনে অল্প সময়ের জন্য যোগদান করে হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করে চলে গিয়েছেন। সপ্তম সংসদে সালাহ উদ্দিন কাদের চৌধুরী মাত্র ৩ কার্যদিবস এবং অষ্টম সংসদে আলতাফ হোসেন গোলন্দাজ মাত্র ১৭ কার্যদিবস সংসদে উপস্থিত থেকে সদস্যপদ বহাল রাখেন। আবার বিভিন্ন ইস্যুতে ওয়াক আউট পূর্বক সংসদ বর্জন সংস্কৃতি চর্চায় বড় দু'দল একে অপরকে অনুসরণ করেছে। একজন সদস্যের এরকম সক্রিয়তাকে উপস্থিতি হিসেবে গণ্য করা হবে কিনা এ বিষয়টি সংবিধান ও কার্যপ্রণালীতে সুস্পষ্ট ভাবে উল্লেখ না থাকার কারণে হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর না করেও সদস্যগণ বেতন তুলে নেয়ার সুযোগ পাচ্ছেন। এজন্য জাতীয় সংসদে নৈতিক মূল্যবোধ,

Dhaka University Institutional Repository

গণতান্ত্রিক চিন্তা চেতনা, দায়িত্বশীলতা ও স্বচ্ছতা গুনসম্পন্ন রাজনীতিবিদদের আশানুরূপ অংশগ্রহণের অভাবই দায়ী। জাতীয় সংসদের উক্ত চারটি নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায় প্রত্যেকটি নির্বাচনেই ব্যবসায়ীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং হ্রাস পেয়েছে আন্যান্য পেশাধারীদের হার। জাতীয় সংসদে বিভিন্ন পেশা বা শ্রেণীর অসম ভারসাম্য থাকার কারণে জাতীয় সংসদ কখনই প্রকৃত রাজনৈতিক কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দু হতে পারেনি। উন্নত গণতান্ত্রিক দেশ সমূহে পার্লামেন্টে বিভিন্ন শ্রেণী ও বিভিন্ন পেশার মধ্যে সমতা খুজে পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ অষ্ট্রেলিয়ার ৩৬তম ফেডারেল পার্লামেন্টের কথা বলা যায়। কেননা এই পার্লামেন্টে ব্যবসায়ী ১৯.৪৫% , আইনজীবী ১৭.২৫ %, আমলা ৬.৬৩%, বিশেষজ্ঞ ২১.২৩%, স্থানীয় সরকার কর্মকর্তা ২০.৩৫% এবং বাকীরা অন্যান্য পেশার ছিলেন। অর্থ্যাৎ পার্লামেন্টের কোন শ্রেণীর সংখ্যা একক গরিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কিন্তু আমাদের দেশে বিগত তিনটি ও বর্তমানের নবম পার্লামেন্টের অর্ধেকের বেশী সংখ্যক সদস্য হলেন ব্যবসায়ী। এছাড়া অবসর প্রাপ্ত সামরিক ও বেসামরিক আমলাদের রাজনীতিতে মাত্রাতিরিক্ত অংশগ্রহণের ফলশ্রুতিতে রাজনীতিতে প্রকৃত রাজনীতিবিদদের অংশগ্রহণের হার দিন দিন হ্রাস পেয়েছে। ফলে এ সকল ব্যবসায়ী ও আমলা শ্রেণীর সদস্যদের দ্বারা সত্যিকার অর্থে বাংলাদেশের সংসদীয় গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতির অগ্রগতি সাধিত হচ্ছে না। গবেষণার পঞ্চম অধ্যায়ের ষষ্ঠ অনুচ্ছেদে " বাংলাদেশের রাজনীতিতে ব্যবসায়ী, সামরিক ও বেসামরিক আমলাদের প্রভাব" শিরোনামে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনাপূর্বক গবেষণার তৃতীয় অনুমান " পেশাদার রাজনীতিবিদদের অভাব এবং ব্যবসায়ী, সামরিক-বেসামরিক আমলাদের রাজনীতিতে অতিমাত্রায় অংশগ্রহণ বাংলাদেশের সংসদীয় শাসন ব্যবস্থাকে ব্যহত করছে" প্রমাণিত হয়।

গবেষণার পঞ্চম অধ্যায়ের অষ্টম, ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ অনুচ্ছেদে বিস্তারিত আলোচনাপূর্বক গবেষণার চতুর্থ ও সর্বশেষ অনুমান সীমাহীন দলীয় কোন্দল, প্রতিহিংসা পরায়ণতা, রাজনৈতিক স্বার্থে ধর্মকে ব্যবহারের মত যাবতীয় নেতিবাচক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতি বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্র ও সামগ্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে একটি শক্তিশালী কাঠামোয় রূপ দিতে বাঁধাগ্রস্ত করছে" প্রমাণিত হয়।

এছাড়া ষষ্ঠ অধ্যায়ে সংযোজিত "রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও সংসদীয় গণতান্ত্রিক উন্নয়নে সিভিল সোসাইটির ভাবনা" শিরোনামে সংসদীয় গণতন্ত্র, নির্বাচন ব্যবস্থা, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ইত্যাদিসহ বাংলাদেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা, রাজনৈতিক সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য ও বিদ্যমান নানাবিধ সমস্যা সম্পর্কিত দেশের বিশিষ্ট নাগরিকদের ধারণা ও পরামর্শমূলক বক্তব্যসমূহ অত্র গবেষণায় গৃহীত অনুকল্পসমূহের প্রমাণে সহায়ক হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

মূলত সংসদীয় গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য প্রয়োজন ক্ষমতাসীন ও বিরোধীদল গুলোর মধ্যে সুসম্পর্ক, সহযোগিতা ও সহনশীলতার মনোভাব। সংসদনেত্রী ও বিরোধী দলীয় নেত্রীর মধ্যকার সম্পর্ক বর্ণনা করতে গিয়ে ১৯৯১ সালে এক সাপ্তাহিকীতে বলা হয়, দু'জন দু'জনকে (খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনা) বৈরী মনে করেন। সংসদ অধিবেশনে এক নেত্রী থাকলে আর এক নেত্রী থাকেন না। এক নেত্রী বক্তব্য দিলে আর এক নেত্রী মুখ ঘুরিয়ে রাখেন। সংসদে দু'জন সামনাসামনি বসেন, কিন্তু কোন দিন চোখেচোখ হতে দেখা যায় না। দু'জন তাকিয়ে থাকেন দু'দিকে (দৈনিক খবরের কাগজ, ১৮ জুলাই ১৯৯১)। তখন থেকে বর্তমানে (২০১০) উনিশ বছর অতিবাহিত হয়েছে, দু'নেত্রীর আসন পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু তাঁদের সম্পর্কের তেমন পরিবর্তন ঘটেনি। দু' নেত্রীই সংসদে উপস্থিতির ক্ষেত্রে একে অপরকে অনুসরণ করেছেন। দু' জনই বিরোধীনেত্রী হিসেবে কখনও সংসদে উপস্থিত থাকতে স্বাচ্ছন্দ বোধ করেননি। বিরোধীদলীয় নেতা যখন সংসদে ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেতা তা অনেক ক্ষেত্রে ঠিক মত শোনেন না।। অপরদিকে সংসদনেতার ভাষণ শুরু হওয়ার আগেই বিরোধীদলীয় নেতা সংসদ কক্ষ ত্যাগ করেন। অর্থ্যাৎ দু' নেতা বিগত ১৯ বছরে সংসদে উপস্থিত থেকে একে অপরের বক্তব্য শ্রবণ ও জবাবদিহিতার সংসদীয় সংস্কৃতি অর্জন করতে পারেননি। অথচ সংসদীয় গণতন্ত্রে একে অপরের বক্তব্য শুনবেন এবং যুক্তি খন্ডন করবেন এটাই প্রথা। কিন্তু প্রধান দু' দল গণতান্ত্রিক এ রাজনৈতিক সহনশীলতা অর্জন করতে পারেননি। গণতন্ত্রের স্বার্থে দু' দলের নেত্রীর মধ্যকার এ অনাস্থা ও অবিশ্বাসের প্রাচীর ভাঙ্গা প্রয়োজন। তেমনি রাজনৈতিক দলগুলোকে সংসদ কার্যক্রমে সংসদীয় আচরণের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত। সংসদের প্রথম বৈঠক হতে সংসদ বর্জন, কারণে অকারণে দফায় দফায় ওয়াক আউট, সংসদে হৈচৈ, ফাইল পেটানো, অন্যকে কথা বলতে বাধা দেওয়া , ফ্লোর না পেয়ে অন্যের মাইক ব্যবহার করা, স্পীকারকে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল দেওয়া, কালো পতাকা প্রদর্শন, রোষ্টাম তছনছ করা, বিক্ষোভ প্রদর্শন, স্পীকারের অফিস ঘেরাও সমালোচনার ক্ষেত্রে একে অপরকে ব্যক্তিগত আক্রমণ, ইত্যাদি বিষয় সংসদের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত করে। এছাড়া সদস্যগণ পয়েন্ট অব অর্ডার দাঁড়িয়ে কার্যপ্রণালী বিধির বর্ণনা, আপত্তিকর শব্দ উচ্চারণ, অধিকার ক্ষুন্ন বা কথা বলার সুযোগ না পাওয়া, এক্সপাঞ্চ ইস্যু ইত্যাদি বিষয়ে অনির্ধারিত বিতর্কে লিপ্ত হন। অনির্ধারিত বিষয়ে কথা বলতে নেতা বা নেত্রীর সমালোচনা করেণ, আবার কখনও কখনও অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা করেন বা প্রসঙ্গ ছেড়ে অন্য প্রসঙ্গে চলে যান যা কার্য প্রণালী বিধির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এসবই পরিহার গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির জন্য অপরিহার্য।

বস্তুতঃ সংসদীয় গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান ও জাতীয় সংসদকে কার্যকর করার মূল চালিকা শক্তি হচ্ছে রাজনৈতিক দল। এ লক্ষ্যে রাজনৈতিক দল গুলোর নিবন্ধন পদ্ধতি চালু, রাজনৈতিক দলের মধ্যে অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রের চর্চা, নতুন নেতৃত্বে সমাজে সকল শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতকরণ এ বিষয়গুলোকে গুরুত্ব প্রদান

Dhaka University Institutional Repository

করা উচিত। এদেশের সরকারি ও বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহের সময়োচিত ও সুচিন্তিত পদক্ষেপ গণতন্ত্র বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। সরকারি দলকে মনে রাখতে হবে, শুধু তাদের নিয়েই নয়, বরং তাদের ও বিরোধী দল উভয়কে নিয়েই রাষ্ট্রযন্ত্র ও সরকার। বাংলাদেশে প্রায়ই দেখা যায় নির্বাচনোত্তর সরকারি দল বিরোধী দলের উপর অন্যায়ভাবে অহেতুক দমননীতি প্রয়োগ করে থাকে, যা গণতন্ত্রের সাথে সামঞ্জস্যহীন। এতে যেমন সরকারি দলের ভাবমূর্তি নষ্ট হয় তেমনি গণতন্ত্রের বিকাশ ব্যাহত হয়। গণতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থায় বিশেষত সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিরোধী দলকে বিকল্প সরকার বলা যায়। এ দলের প্রধান কাজ সরকারি দলের কাজকর্মের গঠনমূলক সমালোচনা করে সরকার যন্ত্রকে স্থিতিশীল রাখা। বিরোধী দল সরকারি দলের গঠনমূলক সমালোচনা না করলে এবং সরকারি দলের ভুল-ত্রুটি জনসম্মুখে তুলে না ধরলে সরকারি দল নিজস্ব দলীয় স্বার্থ নিয়েই ব্যস্ত থাকে এবং অনেকটা স্বৈরতান্ত্রিক হয়ে উঠে। এমতাবস্থায় জনগণের সর্বজনীন কল্যাণ ব্যাহত হয় এবং গণতন্ত্রের বিকাশ সম্ভব হয় না। তাই দায়িত্বশীল বিরোধী দলের নিজস্ব দলীয় স্বার্থে, সবস্তরের জনগণের স্বার্থে এবং গণতন্ত্রের বিকাশের স্বার্থে সরকারি দলের কাজকর্মের গঠনমূলক সমালোচনা করতে হবে। বিরোধী দল বলেই বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা করা দায়িত্বশীল বিরোধী দলের পরিচয় বহন করে না। সরকারি দলের যেসব কাজকর্মে সার্বজনীন কল্যাণ নিহিত থাকে, বিরোধী দলকে সরকারের সেসব কাজকর্মের প্রতি সমর্থন জানাতে হবে। ফলে সরকারি দল বিরোধী দলের দাবি বাস্তবায়ন করতেও উৎসাহিত হবে এবং এতে গণতন্ত্রের বিকাশ ত্বরান্বিত হবে। বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে কার্যকর করার জন্য সরকারি ও বিরোধী উভয় দলের নিম্নোক্ত বিষয়ে মনোযোগী হতে হবে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা অতিমাত্রায় ক্ষমতাকেন্দ্রিক হওয়ায় এখানে পরমতসহিষ্ণুতা ও যুক্তিসঙ্গত সমঝোতার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। কিন্তু গণতন্ত্র চর্চার সফলতার এবং বিকাশের অন্যতম প্রধান শর্ত হচ্ছে পরমতসহিষ্ণুতা এবং সমঝোতা। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান কেবল তখনই কাজ করতে পারে, যখন রাজনৈতিক নেতারা পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা এবং যুক্তিসঙ্গত সমঝোতায় রাজি থাকেন। তাই বাংলাদেশের সরকারি এবং বিরোধী দলসমূহকে আরো অধিকমাত্রায় পারস্পরিক মতামতের প্রতি সহিষ্ণু ও শ্রদ্ধাবান হতে হবে এবং প্রতিপক্ষের গঠনমূলক পরামর্শ, কাজ ও চিন্তা চেতনাকে আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করার মানসিকতা অর্জন করতে হবে। সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সংসদে বসেই সরকারি এবং বিরোধী দলের সকল বিরোধ-বিতর্কের অবসান ঘটাতে হবে। অর্থাৎ সকল কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দু হবে জাতীয় সংসদ। সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে বিরোধী দলের কোন যৌক্তিক দাবি অগ্রাহ্য করলে চলবে না। বরং বিরোধী দলকে সম্পৃক্ত করতে হবে সকল জাতীয় কর্মকান্ডে। সংসদকে অধিকতর কার্যকর করতে হবে। এক কথায় একটি সুস্থ সংসদীয় সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে।

একটি বিষয় মনে রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বাংলাদেশে রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে যে শুধু নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন ঘটে বা ঘটেছে তাই নয়, '৯০ এর পরবর্তী বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা নানা ধরণের

Dhaka University Institutional Repository

সমস্যার সম্মুখীন হলেও গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রার পথে আমাদের অর্জন একেবারেই কম নয়। বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্র ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির পথে যেমন অসংখ্য সমস্যা রয়েছে, তেমনি রয়েছে বিপুল সম্ভাবনাও। বিগত উনিশ বছরে সতিকার অর্থে আশানুরূপ জাতীয় সংসদ কেন্দ্রীক রাজনীতি প্রতিষ্ঠিত না হলেও অর্জিত হয়েছে গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতা, ক্ষমতার নিয়মতান্ত্রিক পরিবর্তন, জাতীয় সংসদের তথা সরকারের পূর্ণাঙ্গ মেয়াদকালীন ক্ষমতা চর্চা, আইন প্রণয়নে জাতীয় সংসদের প্রাধান্য সহ কমিটি ব্যবস্থার প্রচলন ও নিয়মতান্ত্রিক নির্বাচন অনুষ্ঠান। শিক্ষার প্রসারতার হার, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, সন্ত্রাস, দুর্নীতি প্রতিরোধ, বিচার ব্যবস্থার পৃথকীকরণ, নগরায়নসহ নানাবিধ সামাজিক অগ্রগতিতে বাংলাদেশ যথেষ্ট সফলতার দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা করেছে। এগুলোর উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠবে বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্র ও সুষ্ঠু রাজনৈতিক সংস্কৃতির ভবিষ্যত পরিকাঠামো।

তবে পাশাপাশি এটাও মনে রাখতে হবে যে, একুশ শতকের এ প্রতিযোগিতা সম্পূর্ণভাবে মেধার, পেশীর নয়। এই প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হতে হলে প্রয়োজন সৃজনশীল মস্তিকের, প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী গঠনমূলক কাজের, নিষ্ঠুর প্রতিহিংসার নয়, নয় হিংসাত্মক কার্যকলাপের। কিন্তু এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের রাজনীতি ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের কোন প্রস্তুতি নেই, নেই কোন অগ্রবর্তী চিন্তা ভাবনা। বাংলাদেশের রাজনীতির এই তৈরি কাঠামোতে প্রাণের স্পন্দন জাগাতে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন প্রতিপক্ষকে শত্রু জ্ঞান না করে সব সময় শত্রু নিধনে রত না থেকে, সকলকে বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করা। এ ব্যাপারে প্রতিযোগিতা থাকবে কিন্তু থাকবে না বৈরিতা। থাকবে প্রতিপক্ষ, থাকবে না শুধু প্রতিপক্ষকে শত্রুরূপে চিহ্নিত করে সব সময় তাদেরকে পরাজিত করে জাতীয় ক্ষমতার অপব্যবহারের প্রয়াস। কোন কোন বিষয়ে থাকবে ভিন্ন মত কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সমস্যার ব্যাপারে থাকবে ঐকমত্য। কেননা এটাই সংসদীয় সংস্কৃতি ও সত্যিকার গণতান্ত্রিক কাঠামোর ভিত্তি।

Dhaka University Institutional Repository

৭.২ গ্রন্থপঞ্জী

Ahemd, Moudud, Bangladesh: Era of Sheikh Mujibur Rahman. Dhaka, University press Ltd, 1983

---------- Bangladesh : Constitutional Quest for Autonomy, Dhaka, UPL, 1991.

---------- Democracy and the Challenge of Development, Dhaka, UPL, 1995

Chowdhury, Jamshed SA., Bangladesh: Failure of a Parliamentary Government 1973-75. Dhaka, Pathak Shamabesh Book, 2004

Hakim, Muhammad, A., Bangladesh Politics: The Shahabuddin Interregnum, Dhaka University Press Ltd, 1993.

The Changing Forms of Government in Bangladesh : The Transition of Parliamentary system in 19991 in perspective. Dhaka, BIPS, 2001.

Hakim, S.A., Begum Khaleda Zia: A Political Biography. New Delhi : Vakas Publishing House Pvt. Ltd., 1992

Harun, Shamsul Huda, Parliamentary Behaviour in a Multi-National State 1947-56 Bangladesh Experience. Dhaka Asiatic Society of Bangladesh, 1984.

Hasanuzzaman, *Al Masud (ed) Bangaldesh: Crisis of Political Development, Dhaka, Department of Govt. and Politics*, Jahangirnagar University, 1988.

----------*Role of Opposition in Bangladesh Politics*, Dhaka : UPL, 1998.

A Military Regime, Dhaka, UPL, 1988.

Dhaka University Institutional Repository

Jahan, Rounaq, *Pakistan Failure in National Integratin*. New York : Columbia University press : 1972.

----------Bangladesh politics : Problems and Issues. Dhaka : University press Ltd, 1987.

Karim, Waresul, Election under A Caretaker Government : An Empirical Analysis of the October 2001 Parliamentary Election in Bangladesh. Dhaka, UPL, 2004.

Khan, Salimullah, ed., Politics and Stability in Bangladesh: Problems and Prospects, Dhaka, Department of Government and politics Jhanagirnagar University, 1985.

Khan, S.I., Islam, S.A., and Haque, M.I., Political Culture, Political parties and The Democratic Transition in Bangladesh. Dhaka: Academic Publishers, 1996.

Maniruzaman, Talukder, The Bangladesh Revolution and its Aftermath, Dhaka, UPL., 1988.

----------Military Wighdrawal from politics : A Comparative study, Dhaka, UPA., 1988.

Mannan, Md. Abdul, Election and Democracy in Bangladesh. Dhaka, Academic press and publishers Library, 2005.

Pye, Lucian W. and Verba, Sydney, Political Culture and Political Development, Princeton, Princeton University Press Ltd., 1965.

Dhaka University Institutional Repository

আওয়াল, মাওলানা আব্দুল (সম্পাদিত) মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, শিখা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৯।

আরেফিন, এ এস এম সামছুল (সম্পাদিত) বাংলাদেশের নির্বাচন ১৯৭০-২০০১, বাংলাদেশ রিসার্চ এ্যান্ড পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০৩।

আহমদ, মওদুদ, সংসদে যা বলেছি, ঢাকা, ইউপি এল, ২০০৬।

আহমদ, এমাজউদ্দীন, সম্পাদিত, বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র : প্রাসঙ্গিক চিন্তা-ভাবনা, ঢাকা, করিম বুক করপোরেশন, ১৯৯২।

---------- বাংলাদেশ সংসদীয় গণতন্ত্রের সংকট, ঢাকা, চৌকস প্রকাশনী, ১৯৯১।

---------- বাংলাদেশ ঃ রাজনীতির গতি প্রকৃতি ও অন্যান্য প্রবন্ধ, ঢাকা, বুক সোসাইটি, ১৯৮২।

---------- গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪।

---------- বাংলাদেশ সমাজ সংস্কৃতি ও রাজনীতি, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯২।

---------- রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ঢাকা বুক সোসাইটি, ১৯৯৮।

আহমদ, সালাহউদ্দিন, বাংলাদেশে গণতন্ত্রের সংকট ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স-২০০২।

আহাদ, অলি, জাতীয় রাজনীতি ঃ ১৯৪৫ থেকে ৭৫, ঢাকা বাংলাদেশ কো-অপারেটিশ বুক সোসাইটি প্রেস, ১৯৮৫।

আসাদ, আবুল, ২০০৫, একশ' বছরের রাজনীতি, বিসিবিএস, ঢাকা।

আহমদ, আবুল মনসুর, আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, ঢাকা, খোশরোজ কেতাব মহল, ১৯৯৯।

আলম, খুরশিদ, সমাজ, গবেষণা পদ্ধতি, ঢাকা মিনার্ভ পাবলিকেন্স, ২০০০।

ইসলাম, সিরাজুল, বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১, ঢাকা, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩।

উমর, বদরুদ্দীন, সামরিক শাসনও বাংলাদেশের রাজনীতি, ঢাকা, খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানী, ১৯৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

উল্লাহ, আহমদ, সম্পাদিত, পঞ্চম জাতীয় সংসদ প্রামান্য গ্রন্থ, ঢাকা সুচয়ন প্রকাশনী, ১৯৯২।

খন্দকার, এ্যাড তৈমূর আলম, দেশের বর্তমান হালচাল, আত্মপ্রকাশ, বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০০৪।

খান, মিজানুর রহমান, সংবিধান ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিতর্ক, ঢাকা সিটি প্রকাশনী ১৯৯৫।

চৌধুরী, গোলাম আকবর, বাংলাদেশের রাজনীতি ও আওয়ামীলীগের ভূমিকা, ঢাকা, ১৯৯৭।

জাহাঙ্গীর, মুহাম্মদ সম্পাদিত, গণতন্ত্র, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৫।

তালুকদার, আব্দুল ওয়াহেদ, গণতন্ত্রের অন্বেষায় বাংলাদেশ, ঢাকা, পান্ডুলিপি ১৯৯৩।

নাথ, বিপুল রঞ্জন, বৈদেশিক শাসন-ব্যবস্থা, বুক সোসাইটি, বাংলাবাজার, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ: সেপ্টেম্বর ১৯৮৯,

ফিরোজ, জালাল, পার্লামেন্ট কীভাবে কাজ করেঃ বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা, ঢাকা, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ২০০৩।

----------পার্লামেন্টারী শব্দকোষ, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮।

ভূঁইয়া ,ড. মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াদুদ, 'বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন' রয়েল লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৮৯,

----------বাংলাদেশ দলীয় ব্যবস্থা ঃ একটি রাজনৈতিক বিশ্লেষণ, ঢাকবা, মিতা প্রকাশনী ১৯৯৫।

মতিন, আবুল, খালেদা জিয়ার শাসনকাল একটি পর্যালোচনা, ঢাকা র‍্যাডিকেল এশিয়অ পাবলিকেশান্স, ১৯৯৭।

মহাপাত্র, অনাদি কুমার, আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান, কলিকাতা, রয়্যাল হাফটন, ১৯৯৬।

মালেক, ডা. এস.এ, **বাংলাদেশ রাষ্ট্র সমাজ রাজনীতি**, হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০০৬।

মিয়া, এম এ ওয়াজেদ, বাংলাদেশের রাজনীতি ও সরকারের চালচিত্র, ঢাকা ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯৫।

----------বাংলাদেশের বিভিন্ন সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৬।

মোহাম্মদ, ড. হাসান, বাংলাদেশ : ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতি, গ্রন্থমেলা, ঢাকা, ২০০৩।

রহমান, বিচারপতি লতিফুর, তত্ত্বাবধায়ক সরকার সরকারে দিনগুলি ও আমার কথা, ঢাকা, আয়েশা রহমান, ২০০২।

Dhaka University Institutional Repository

রশিদ, হারুন, বাংলাদেশের রাজনীতি : সরকার শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০০০, ঢাকা, নিউ এজ প্রকাশনী, ২০০১।

রেহমান, তারেক শামসুর (সম্পাদিত) সেনাবাহিনীর ভূমিকা ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ, ঢাকা, এম আব্দুল্লাহ এন্ড সন্স, ১৯৯৪।

----------(সম্পাদিত) বাংলাদেশ ঃ রাজনীতির ২৫ বছর, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৮।

----------(সম্পাদিত) বাংলাদেশ, রাষ্ট্র ও রাজনীতি, ঢাকা, উত্তরণ, ২০০০।

----------নয়া বিশ্ব ব্যবস্থা ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি, ঢাকা মাওলা ব্রাদার্স, ২০০২।

---------- (সম্পাদিত), বাংলাদেশ রাজনীতির চার দশক, শোভা প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৯।

সিদ্দিকী, রেজোয়ান, *কথামালার রাজনীতি* ১৯৭২-৭৯, ঢাকা, নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৮৪।

হক, ড. আবুল ফজল, *বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি*, টাউন স্টোর্স রংপুর, ২০০৩

হক, আজিজুল, *বাংলাদেশঃ সমাজ রাজনীতি ও গণতন্ত্র*, ঢাকা কম্পিউটার্স, ১৯৯২।

হাননান, ড. মোহাম্মদ, ২০০০, *বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস, ১৯৯০-১৯৯৯*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

Ahmed Nizamuddin, *The 2nd BNP Governemnt : A Mid-Term Appraisal"*

Parliamentary Politics in Bangladesh" The Journal of Commonwealth and Comparative politics, Vol. XXXII, No. 3, November 1994.

Alam, Md. Samsul, *Political of Hartals : Bangladesh in 1980s"*, Asian Studies, No, 12, June 1993.

Alam, Md. Samsul and Mana, *Md. Abdul The June 1996 Parliamentary Election :*

A Quest for Stabilitary and Democracy, Asian Studies, No, 16, *June 1996.*

----------*The Eight Jatiya Sangsad Elections : An Analytical Review,* Asian Studies, No, 21, June 2002.

Ashraf, Md. Ali, *Ethical standards of parliamentarians,* Dhaka, Bangladesh

Institute of Parliamentary Studies BIPS, October, 2001.

Dhaka University Institutional Repository

Bhuyan, M. Sayefullah *"Political culture in Bangladesh"*, Dhaka University Journal, p.67, 1991.

Chowdhury, Dilara, *Democracy in Bangladesh : Problems and prospects*, Asian studies No-12, 1993.

----------*Functioning of the fifth parliament in Bangladesh (1991-October1994)* Research Report, Jahangirnagar University, Dhaka, 1994.

Chowdhury, *Nazim Kamran, Jatiya Sangsad Election, Past and Future*, The Daily Star, Dhaka, 13 April, 01.

Hakim, M.A, *"Parlimentary Election in Bangladesh Under Neutral Caretaker Government " A Lesson for Massive Riggine Prone Countries?* Asian Thought and Society, Vol-25, No-73, 2001, pp, 17-65.

Hasanuzzman, Al Masud, *Parliamentary Committee system in Bangladesh,"* Regional Studies, Vol-13, No-1, winter 1994-95.

----------*Role in Bangladesh: Case of Seventh Parliament," Parliament,"* Asian studies, vol, 19, June, 2000.

----------*Legislative Role of Opposition in Bangladesh Second Jatiya Sangsad* Asian Studied, No-15, June, 1996.

Husain, Mainul, *Working of Parliamentary Democracy in Bangladesh",* Asian Studied, No-14, June, 1995.

Islam, M Nazrul, *Parliamentary Democracy in Bangladesh,* Asian Studies, No-14, June 1995.

Majumder shantanu and Chowdhury, Zahid, Ul Arefin, *Working of the Parliament of Bangladesh,* Bangladesh political science review vol-1, June, 2001.

Dhaka University Institutional Repository

Mohammad Sohrab Hossain, *Walkouts in the Jatiya Sagsad of Bangladesh: An Anaalysis,* Bangladesh political science review, vol-5, Number-1, December-2007.

উজ্জামান, হাসান, *বাংলাদেশে উপদলীয় কোন্দল ও দল ভাঙ্গার রাজনীতি,* দি জার্নাল অব পলিটিক্যাল সায়েন্স, ভলিয়্যুম-২ নম্বর-১, নভেম্বর ১৯৮৫.

রহমান, মো: এখলাছুর ও খুশী, ইসমত আরা, *বাংলাদেশের সংসদীয় রাজনৈতিক সংস্কৃতির ঐতিহাসিক ও সাম্প্রতিক প্রবণতা ঃ একটি বিশ্লেষণ,* বাংলা ভিশন, ভলিয়্যুম-১ সংখ্যা-১, মে ২০১০ ।

অভিসন্দর্ভ

শহিদুল্লাহ, মোহাম্মদ,"বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ:কাঠামো ও কর্মকান্ড"(এম.ফিল অভিসন্দর্ভ) সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০১।

চৌধুরী, শরীফ আহমদ, বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র (১৯৯১-২০০৬): জাতীয় সংসদের কার্যকারিতা (এম. ফিল অভিসন্দর্ভ) সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, এপ্রিল, ২০০৭।

আলম, মো: ছামছুল, ২০০৩, বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির একটি বিশ্লেষণ (পি.এইচ.ডি অভিসন্দর্ভ),ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০।

পত্র পত্রিকা ও সাময়িকী

The Sunday times, London, 30 March, 1969.

The News week, 7 April, 1969.

The Pakistan Observer, 4 January, 1971.

The Daily Independent, 31 December, 2009.

দৈনিক ইত্তেফাক, ৯ জানুয়ারি ১৯৬৯
দৈনিক ইত্তেফাক, ৩০ জানুয়ারি ১৯৬৯ ।
দৈনিক পাকিস্তান, ৪ জানুয়ারি ১৯৭১।
দৈনিক ইত্তেফাক, ৯ জুলাই ১৯৯৬।
দৈনিক ইত্তেফাক, ১৩ আগস্ট ১৯৯৬ ।
দৈনিক সংবাদ, ২৫ আগস্ট ১৯৯৬।
দৈনিক ইত্তেফাক, ২৮ আগস্ট ১৯৯৬।
দৈনিক ইত্তেফাক, ২০ সেপ্টেম্বর ২০০১।

Dhaka University Institutional Repository

দৈনিক ইত্তেফাক, ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০০১।
দৈনিক ইত্তেফাক, ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০০১।
দৈনিক ইত্তেফাক, ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০০১।
দৈনিক ইত্তেফাক, ২৮ ডিসেম্বর, ২০০১।
দৈনিক ইত্তেফাক, ৭ জানুয়ারি, ২০০২।
দৈনিক ইত্তেফাক, ২০ জানুয়ারি, ২০০২।
দৈনিক ইত্তেফাক, ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০০২।
দৈনিক ইত্তেফাক, ৪ মার্চ ২০০২ ।
দৈনিক ইত্তেফাক, ১৩ মার্চ ২০০২ ।
দৈনিক ইত্তেফাক, ২০ মার্চ ২০০২।
দৈনিক প্রথম আলো, ১৩ মার্চ, ২০০২।
দৈনিক প্রথম আলো, ৪ মে ২০০২।
দৈনিক প্রথম আলো, ৩০ অক্টোবর, ২০০৬।
দৈনিক প্রথম আলো, ১২ জানুয়ারি, ২০০৭।
দৈনিক প্রথম আলো, ৪ অক্টোবর, ২০০৯।
দৈনিক প্রথম আলো, ৪ অক্টোবর, ২০০৯।
দৈনিক প্রথম আলো, ৭ অক্টোবর, ২০০৯।
দৈনিক প্রথম আলো, ২৯ অক্টোবর, ২০০৯।
দৈনিক প্রথম আলো, ২৮ ডিসেম্বর, ২০০৯।
দৈনিক প্রথম আলো, ২০ জুন, ২০১০।
দৈনিক আমার দেশ, ২৬ জানুয়ারি, ২০১০।
সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ২৭ ডিসেম্বর, ১৯৯৬ ।
দৈনিক আজকের কাগজ, ১২ মে ১৯৯৬।
দৈনিক যুগান্তর, ১৯ মার্চ ২০০২।